বিবেকানন্দ-শিষ্য

শরচ্চন্দ্রের

জীবনী ও রচনাবলী

—প্রাপ্তিস্থান—
বিবেকানন্দ সোসাইটি
১৫১, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশক
ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী
১৫/১ সূর্য্যসেন ষ্ট্রিট্
কলিকাতা ৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৯০, ইং জানুয়ারী ১৯৮৪

প্রচ্ছদ
স্বপন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
রাধারমণ বসাক
শ্রীকান্ত প্রেস
৭৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

—প্রকাশকের নিবেদন—

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ মাত্রই "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" প্রণেতা, বিবেকানন্দ শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচিত। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর সঙ্গে বর্ত্তমান কালের পাঠকগণের সম্যক্ পরিচয় নেই। শরচ্চন্দ্র যে কি বিপুল পরিমাণ রচনাসম্ভার রেখে গেছেন তার পরিপূর্ণ সংকলন ও পরিমাপ করা এখন সম্ভব নয়। কালের অবক্ষয়ে তার অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা যতটা সম্ভব তাঁর রচনা উদ্ধার ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে তৃতীয় দশকের মধ্যে শরচ্চন্দ্রের রচনাবলী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তার উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করা, এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই কাজে শরচ্চন্দ্রের দৌহিত্রী শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী ভূমিকা নেন। কাশী 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের' অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামী রঘুবরানন্দজী শ্রীমতী ছায়ার এই পবিত্র সংকল্পকে সাধুবাদ জানিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তিনি শরচ্চন্দ্র রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণাষ্ট-স্তবমালা" পুস্তিকার একটি দুষ্প্রাপ্য জীর্ণ মলিন সংখ্যা সেবাশ্রম লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার ক'রে শ্রীমতী ছায়াকে প্রেরণ করেন। পুরোণো 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে শরচ্চন্দ্র রচিত বহু প্রবন্ধ, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতিও উদ্ধার করে দেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে কষ্টসাধ্য কার্য নির্বাহ করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তিনি আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। শরচ্চন্দ্র তাঁর জীবনের কোন দিনপঞ্জী লিখে রেখে যান নি বলে, ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে জীবনীর পাণ্ডুলিপি প্রণয়নেও শ্রীমতী ছায়াকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। কোন মহৎ প্রচেষ্টাই সম্মিলিত সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। এই পবিত্র কাজে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের পূজনীয় সাধু মহারাজ এবং ভক্ত ও বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সাহায্য নানাভাবে পেয়েছি। তাঁদের নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে এই কঠিন কাজ এত শীঘ্র সম্পূর্ণ করা সম্ভব হ'ত না।

এই গ্রন্থে আমরা শরচ্চন্দ্রের অধুনালুপ্ত রচনাই শুধু সংকলন করেছি। "স্বামি-শিষ্য সংবাদ", "সাধু নাগমহাশয়" ব্যতীত তাঁর রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী" নদীয়ার তপোবন মঠ থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে বলে এই সকল রচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান পায়নি।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা যেমন প্রবল ছিল এখন তা অনেকাংশে স্তিমিত। তাই শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃত ভাষায় রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণাখ্য-স্তবমালার" বঙ্গানুবাদ বা ভাষান্তর প্রত্যেকটি স্তবের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। আমার অগ্রজ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শিবপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই ভাষান্তরের কাজ করেছেন এবং পিতার জীবনালেখ্যও তিনিই রচনা করেছেন। স্বামী নিরাময়ানন্দজী অনুগ্রহ ক'রে জীবনীটি দেখে দিয়েছেন এবং ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী সদাশিবানন্দ রচিত যে পুস্তিকার উল্লেখ আছে, আমাদের সংগৃহীত অধিকাংশ তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রেই তা রচিত হয়েছিল। সুতরাং পাঠকগণের অবগতির জন্য একথা বলা আবশ্যক যে সেই পুস্তিকার তথ্যের সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থের জীবনালেখ্যর সাদৃশ্য থাকার কথা।

পাঠকগণ যাতে শরচ্চন্দ্রের গুরুভক্তি, সাহিত্য-প্রীতি, পাণ্ডিত্য ও কবি প্রতিভার সঠিম মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তাঁর জীবনালোচনা ক'রে সামান্যও লাভবান হন সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হলো।

শ্রীকান্ত প্রেসের মালিক শ্রীরাধারমণ বসাক মহাশয় ব্যাপক বিদ্যুত ছাঁটাইয়ের মধ্যেও ছাপার কাজ যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রুফ দেখায় এবং মুদ্রণে অবশ্যই কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। এটা প্রথম সংস্করণ বলেই পাঠকগণ যেন ক্ষমাসুন্দর চোখে তাকে সহনীয় করে নেন।

ইতি বিনীত

ব্রহ্মপদ চক্রবর্ত্তী

শুভেচ্ছাবাণী



PHONE : 66-3619

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DT. HOWRAH
PIN : 711 202

6.1.83

শ্রী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান গৃহী শিষ্য। তাঁহার "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" পুস্তকখানি স্বামীজির সকল ভক্তের নিকট বিশেষ আদরণীয়।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর কৃতী পুত্র ডাঃ শিবানন্দ চক্রবর্তী তাঁহার পিতৃদেবের স্বামীজির সংগে নিবেদিত জীবনের কাহিনী ও সকল রচনা সংকলন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
[signature]
(স্বামী গম্ভীরানন্দ)

ভূমিকা

ছয় সাত বৎসর পূর্বে বম্বে থাকাকালে, 'স্বামি শিষ্য সংবাদ' প্রণেতা, বিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্রী, শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মণ্ডলীতে সুপরিচিত তাঁর মাতামহ শরচ্চন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমাদের খার রামকৃষ্ণ আশ্রম-গ্রন্থাগারের পুরাতন বাঁধানো "উদ্বোধন" থেকে প্রবন্ধগুলির অনুলিপি করার ব্যবস্থা ক'রে দিই। এই সংকলনের প্রথমেই শরচ্চন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোজন করার কথা হয়। সেটি লিখেছেন শরচ্চন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ডক্টর শিবপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। পিতার জীবনী লেখা পুত্রের পক্ষে খুবই কঠিন। এখানে লেখক ব্যক্তিগত ভাব অতিক্রম ক'রে বিষয়গত ভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন বলেই লেখাটি সার্থক হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে কয়েক বছর আগে বারাসত 'রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের' স্বামী সদাশিবানন্দজী ইতিপূর্বে "শ্রীবিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্র" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে শরচ্চন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর সম্বন্ধে একটি স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়। শরচ্চন্দ্রের বহু পুরাতন রচনা সংগ্রহ করা সময়-সাপেক্ষ বিধায়, ঐ পুস্তিকার সঙ্গে রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখন রচনা সংকলনের কাজ শেষ হওয়ায়, রচনাবলী-গ্রন্থের সঙ্গে নতুন তথ্য সহ শরচ্চন্দ্রের একটি পূর্ণ জীবনী সংযোজন করা হয়েছে। বাল্যকালের অনেক ঘটনা তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীব্রহ্মপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু আয়াস সহকারে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য তথ্যাবলী-সংগ্রহেও সাহায্য করেছেন।

শরচ্চন্দ্র 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'সাধু নাগমহাশয়' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণাষ্ট-স্তবমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বলেই সুবিদিত। প্রথম দু'খানি গ্রন্থ নিয়মিতভাবে উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তাই সে দু'টি আর এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তৃতীয়টির জীর্ণ পুরাতন

একটি সংস্করণ সংগ্রহ করেছেন. কাশী সেবাশ্রমের স্বামী রঘুবরানন্দজী। শরচ্চন্দ্র রচিত দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ কত যে প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত সংস্কৃত স্তবমালা ও পাঁচালী 'উদ্বোধন' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঠিক পরিমাপ করা কঠিন। তবুও যথাসম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে। এখনকার পাঠকবৃন্দের অবগতি ও উপলব্ধির জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থটির প্রকাশ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে তৃতীয় দশকের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শরচ্চন্দ্রের রচনাসম্ভার উদ্ধারকল্পে সংগ্রহকারীরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সেজন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে (১৯৩৩) যখন শরচ্চন্দ্র সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন কলিকাতা 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'তে তিনি কিছুদিন স্বামীজীর সম্বন্ধে ধারাবাহিক-ভাবে আলোচনা করেন। সে আলোচনা বক্তৃতা নয়—সে আলোচনা ভক্তিভাবে আপ্লুত গুরুদেবের অনুধ্যান—চক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু কণ্ঠ সরব। গুরুদেবের কথা যেন নির্ঝরের মত প্রবাহিত হচ্ছে!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ পাঠক, বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে বিশেষ উপকৃত হবেন এবং শরচ্চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, কবি-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সম্যক্ পরিচয় পাবেন। তাঁর সব লেখায়, ভাবে ও ভাষায় তাঁর গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ যেন অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। লেখকের রচনা যথাযথ ভাবে রাখা হয়েছে, ভাষা বা বানানের কোন সম্পাদনা করা হয় নি। আশা করা যায় গ্রন্থখানি এভাবেই পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে।

স্বামী নিরাময়ানন্দ
কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটি

— সূচীপত্র —

বিষয়		পৃষ্ঠা সংখ্যা

শরচ্চন্দ্রের জীবনালেখ্য

সূচনা

যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহধন্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৯৪২ খৃঃ আগষ্ট মাসে দেহরক্ষা করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বৎসর। আজ এতদিন পরে তাঁর জীবনী রচনা করতে গিয়ে নানা দ্বিধা এসে উপস্থিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধ লেখার তাগিদ বহুদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর ভাবধারা অনুসরণ ক'রে যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে শরচ্চন্দ্রের এক জীবনী গ্রন্থের দাবী করা হয়েছে অনেকদিন আগেই। শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে কিছু সন তারিখ সংগ্রহ করা গেলেও তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য, পরিচয়, বিশেষ করে বাল্য জীবনের অনেক ঘটনা কালের হস্তাবলেপে লুপ্ত হয়ে গেছে। শরচ্চন্দ্র অনেক পুঁথি, প্রবন্ধ, স্তবস্তুতি, গান, কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছুই লিখে রেখে যাননি। তাই তাঁর জীবনের প্রামাণিক তথ্যাদি পাওয়া আজ কঠিন ব্যাপার। তবু যেগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলির ভিত্তিতে রচিত এই জীবনী হয় তো স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন ও তৎপরবর্তী বঙ্গসমাজের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে। এই ভরসাতেই এই জীবনালেখ্যের অবতারণা।

শরচ্চন্দ্রের জীবনের কেন্দ্রীয় অনুভূতি তাঁর স্বামীজী-সঙ্গ ও অন্যান্য সাধুসঙ্গের ফল। স্বামীজী শরচ্চন্দ্রের দীক্ষাগুরু। শরচ্চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কীর্তি হ'ল "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" গ্রন্থের প্রণয়ন। এই গ্রন্থে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ। মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের চিন্তাধারার এই দৃশ্যমান আকার এতই প্রামাণিক যে, স্বামীজীর লিখিত পত্র ও প্রবন্ধ. ছাড়া বোধহয় অন্য কোন গ্রন্থে তাঁর মতামত এত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি। গ্রন্থের প্রত্যেকটি অংশ লিখবার পর শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর বেলুড়-মঠস্থ গুরু-ভ্রাতৃগণকে তা পড়ে শুনিয়েছেন এবং সংশোধন করিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা লেখা অনুমোদন

করার পরই শরচ্চন্দ্র তাঁর লেখা প্রকাশকের হাতে অর্পণ করেছেন। শরচ্চন্দ্র বুঝেছিলেন যে, কেবল অধ্যাত্ম-চেতনাই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে, দেশপ্রেম, স্ত্রীশিক্ষা, ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা প্রয়োজন। আর তিনি এও বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতে মানুষ স্বামীজীর মতামতগুলিকে দিগ্‌দর্শন রূপে ব্যবহার করবে। শরচ্চন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" গ্রন্থের অসংখ্য সংস্করণ হয়েছে, আর তা নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দভাবে ভাবিত মানুষেরা আজ পর্যন্ত ঐ গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। শরচ্চন্দ্রের লিখিত অপর মহ'মূল্য গ্রন্থ হ'ল "সাধু নাগমহাশয়"।

সাধুসঙ্গের দ্যুতি শরচ্চন্দ্রের সারা জীবনকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। এই সজ্জনসঙ্গ তাঁর জীবনে 'ক্ষণমিহ' ছিল না—দৈনন্দিন কর্মে, ভাবে ভাবনায়, বাক্যালাপে ও সদাচারে নানা দিক থেকে ঐ আধ্যাত্মিক সঙ্গ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বত্যাগী সন্তানেরা যখন স্বামীজীর প্রেরণায় বেলুড়মঠের সূচনা করেন, তখন মঠের সেই প্রাথমিক অবস্থায় শরচ্চন্দ্র ৺ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদগণের সঙ্গে মিলে মিশে সাধন-ভজন করেছেন, নৃত্যসহকারে স্বরচিত গান গেয়ে মহারাজদের আনন্দ দান করেছেন, পরমাপ্রকৃতি জননী সারদামণির পাদপদ্মে প্রণত হয়েছেন, গৃহীভক্ত দুর্গাচরণ নাগ ও গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের অনুরাগ-ভাজন হয়েছেন, আর সেই নির্মল আনন্দসাগরে ডুব দিয়ে নিজ জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করেছেন। এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য সত্যই দুর্লভ।

জন্ম ও বংশপরিচয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ইংরেজ শাসনের চাপে সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষত-বিক্ষত। সমস্ত জাতি এক শক্তিহীন, অকর্মণ্য জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার

অন্ধকার এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। পূর্ব ভারতের বাংলাদেশের পল্লীগ্রামেও তখন একই চিত্র। কিছু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ জমিদারদের শক্তিপুষ্ট হয়ে গ্রামের কর্ণধার হয়ে বসেছেন। তাঁদের প্রবর্তিত আচার-বিচার রীতিনীতির বেড়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। তখনও শিক্ষার আলোক বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করেনি। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ প্রভুদের তাঁবেদারী করছেন। মানুষের অধ্যাত্মচিন্তার অবকাশ নেই। যদিও হিন্দুর আঙিনায় বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে, সেগুলি কেবল আচার-বিচারে পর্যবসিত। এ ছাড়া উচ্চনীচ ভেদাভেদ, জাতপাতের ব্যাপার তো আছেই। পল্লীগ্রামের মানুষ দারিদ্র্যপিষ্ট হ'য়ে একান্নবর্তী পরিবার গঠন ক'রে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কোন রকমে দিনাতিপাত করছে।

এ হেন পরিবেশে শরচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত এক অখ্যাত কোটাপাড়া গ্রামের অতি দরিদ্র একান্নবর্তী ব্রাহ্মণ-পরিবারে। ১৮৬৮ খৃঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, চান্দ্র মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী (শিবরাত্রি) তিথিতে শরচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকমল ও মাতা বিধুমুখী। রামকমল জ্যেষ্ঠ বলে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের কর্ণধার ও বাড়ীর কর্তা। দরিদ্র হলেও রামকমল ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ। যাজনিক বৃত্তি অবলম্বন ক'রে তাঁকে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হ'ত। তিনি কেবল শিক্ষিতই ছিলেন না—পল্লীগ্রামের অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁরই উৎসাহে তাঁর তৃতীয় সহোদর কালীকমল, গ্রামের স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। দ্বিতীয় সহোদর নীলকমল জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কাজ করতেন। রামকমলের কনিষ্ঠ সহোদর শশিকমল ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত ধামরাই গ্রামে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সকলের অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষ হয়েছিল। রাম-

কমলেরা কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হওয়াতে গ্রামে তাদের বাড়ী কাশ্যপ-বাড়ী বলে অভিহিত হ'ত। পূজা-পার্বণে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সমস্ত গ্রামটিই এ বাড়িতে অংশ গ্রহণ ক'রত। তাই গ্রামের মধ্যে কাশ্যপ-বাড়ি শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ বলে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

মানুষের জীবনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরচ্চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। শরচ্চন্দ্রের মাতা বিধুমুখী উচ্চশিক্ষিতা না হলেও রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, পুরাণাদি পাঠ করতেন। সাধ্যমত পরিশ্রম সহায়ে অল্প সময়ের মধ্যে সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ ক'রে তিনি উক্ত গ্রন্থাদি পাঠে রত থাকতেন। প্রতিবেশী মহিলারা তাদের গৃহকর্ম শেষ ক'রে বিধুমুখীর কাছে এসে ঘিরে ব'সত। তাঁর মতো বিদুষী নারী এবং বিদ্যোৎসাহী মহিলা সেকালে গ্রামাঞ্চলে কমই দেখা যেত। যতদূর জানা যায় বিধুমুখীর পিত্রালয় ছিল ছয়গাঁয়। এই গ্রাম কোটাপাড়ার দক্ষিণপূর্বে চার মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ গ্রামের তারাকান্ত ভট্টাচার্য (পাঠক) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিধুমুখীর সরলতা ও ধর্মভীরুতা পল্লীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উত্তরকালে বিধুমুখী কাশীবাসী হন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

বাল্যকাল

মানুষ জন্মকালে থাকে অসহায় ও পরিবার-নির্ভর। তার মন থাকে অকর্ষিত জমির মতো আর তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থাকে শূন্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পারিবারিক প্রবণতা জন্মকাল থেকেই মানুষের চিত্তে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ বপন করে। বাল্যের এই পুঁজি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়। শরচ্চন্দ্রের জীবনেও যে অধ্যাত্ম-চেতনার বীজ বাল্যকালে উপ্ত হয়েছিল, তা ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দের সযত্ন লালনে মহীরুহের আকার ধারণ করে।

রামকমল চক্রবর্তীর পরিবারে শরচ্চন্দ্রই প্রথম সন্তান। তাই পিতামাতা ও খুল্লতাতদের অত্যন্ত আদরে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল। শরচ্চন্দ্র দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও জননীর প্রভাবে দীনদুঃখীদের দেখলে বিচলিত হতেন। অত্যন্ত আদরের ভাইপোর জন্য কাকারা কর্মস্থল থেকে দেশের বাড়িতে আসার কালে নানা রকমের জামা-কাপড় নিয়ে আসতেন। দু-তিন মাস পরে আবার যখন তারা ফিরে আসতেন, তখন দেখতেন যে বালক শরৎ খালি গায়ে ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানা গেছে যে বালক অন্য গরীব ছেলেমেয়েদের নিজের জামা কাপড় বিলিয়ে দিয়েছে। অতি অল্প বয়সেই শরতের অল্পে তুষ্টি ও ত্যাগের মনোবৃত্তি দেখা যেত। খুব ছোট বেলাতেই তিনি বাবার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাজনিক কর্মের জন্য যাতায়াত করতেন ও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পূজা, অর্চনা, আরাত্রিক দেখতেন। সেই থেকেই হয়তো তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার আরম্ভ। শিথিল ধুতিবন্ধনকে বামহাতে চেপে ধরে, ডানহাতে পূজার নৈবেদ্য ধারণ ক'রে, বালক শরৎ পিতার সঙ্গে চলেছে,—এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত। বাল্যকালে গ্রামে কোথাও পালা-গান ও ভাগবত পাঠ হলেই বালক ছুটে ছুটে সেখানে উপস্থিত হ'ত। শোনা যায় বাল্যকালেই শরৎ দুই একবার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

বিদ্যার্জন

আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে স্বাভাবিক ভাবেই পিতামাতার আনুকূল্যে শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। ছোট কাকা শশিকমল ১৮৭৩ খৃঃ শরচ্চন্দ্রকে ধামরাই গ্রামে শিক্ষালাভের জন্য নিয়ে যান। অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক স্কুলের পরীক্ষাগুলিতে বেশ কৃতিত্ব দেখান। দেবভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। ১৮৮২ খৃঃ ধামরাই গ্রাম থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা সরকারী বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। এরপর শরচ্চন্দ্র ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় যুবক শরতের কবিপ্রতিভার

পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' ১৮৮২-৮৩ খৃঃ রচিত বলে মনে হয়। অধুনা পুস্তকটি লুপ্ত হয়ে গেছে। ঐ কাব্যের বিষয়বস্তু কিছুই আর জানা যায় না। তবে মনে হয়, এই গ্রন্থটি বেশ প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং কলেজে শরচ্চন্দ্র 'শরৎ কবি' আখ্যা লাভ করেন।

১৮৮৩ খৃঃ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এফ্. এ. (ফার্ষ্ট আর্টস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শরচ্চন্দ্র কলকাতায় আসেন! ১৮৮৮ খৃঃ কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। সেকালে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রাম-বাংলায় বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। কোন কোন অঞ্চলে দশ বিশটা গ্রামের মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট পাওয়া দুষ্কর ছিল। শরচ্চন্দ্রই ঐ অঞ্চলে প্রথম বি. এ. পাশ করেছেন; তাই দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক তাঁকে তখন দেখতে এসেছিল।

ইতিমধ্যে পিতা রামকমল তিনটি কন্যা কৈলাসকামিনী, গঙ্গামণি, গিরিজা ও আর একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। তাঁর এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম রমেশচন্দ্র। সংসারে অভাব অনটনের ধাক্কায় শরচ্চন্দ্র কিছুকাল বরিশালের জমিদার-পুত্র প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের আবাসিক গৃহশিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই উপার্জনের অর্ধেক তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের শিক্ষার খরচ বাবদ ব্যয় করতেন। রমেশচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ও ইংরেজী উচ্চশিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর হন।

বিবাহ, কর্মজীবনে প্রবেশ ও সাধুসঙ্গ

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে শরচ্চন্দ্র দারপরিগ্রহ করেন। ঘর-পালানো মনোবৃত্তির জন্যই তাঁকে অল্প বয়সে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ গ্রাম

ষোলঘর অধিবাসী মদনমোহন বাড়রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোক্ষদায়িনীর সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। মোক্ষদায়িনীর বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। মদনমোহন বাবু ফরিদপুর জেলার সুন্দীপ মুন্সেফী আদালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সঙ্গতিপন্ন উকিল ছিলেন।

ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে পড়বার সময় বিক্রমপুরের দেওভোগ গ্রামবাসী সাধু নাগমহাশয়ের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের পরিচয় হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্তদের অন্যতম সাধু নাগমহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ) ডাক্তারি পড়েছিলেন। তাঁর মতো নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত অত্যন্ত বিরল। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে তাঁকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন। সাধু নাগমহাশয়ের সান্নিধ্যে শরচ্চন্দ্রের মনে ধর্মভাব বিকশিত হ'তে থাকে। সাধু নাগমহাশয়ের কাছেই শরচ্চন্দ্র প্রথমে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের কথা শোনেন এবং ঢাকায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রমে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় সংসারের প্রতি তাঁর কিছুটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। যুবক শরতের বৈরাগ্যের কথা শুনে এবং জামাতার মানসিক অবস্থা জেনে উদ্বিগ্ন শ্বশুর মদনমোহন সাধু নাগমহাশয়ের দেওভোগের বাড়িতে গমন করেন। নাগমহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে এবং তাঁর অতি দীনভাবে জীবন যাপন দর্শন ক'রে বাড়রী মহাশয়ের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়। তিনি সানন্দচিত্তে বুঝতে পারেন যে এমন এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে জামাতার কোন ক্ষতিই হতে পারে না। নাগমহাশয় নিজে বিদ্যানুরাগী ছিলেন; তিনি কেন শরচ্চন্দ্রকে বিদ্যালাভে নিরুৎসাহ করবেন? পূতচরিত্র নাগমহাশয়ই শরচ্চন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। পরে শরচ্চন্দ্র "সাধু নাগ-মহাশয়" নামে জীবনীগ্রন্থটি রচনা করেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতার সার্থক সাহায্যে শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র শিক্ষা-দীক্ষায় ও কর্মজীবনে অগ্রজের তুলনায় অনেক বেশী সাফল্য অর্জন

করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রসায়ন শাস্ত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং কিছুকাল বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে শিক্ষাগুরু বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উৎসাহে কলকাতা কলেজ ষ্ট্রীট্ পাড়ায় ফুটপাতে বই বিক্রির ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই সামান্য সূচনা থেকেই পরে কলেজ ষ্ট্রীটের "চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং" নামে বিখ্যাত পুস্তক-বিপণি ও প্রকাশক-সংস্থার সূত্রপাত হয়। ব্যবসাসূত্রে রমেশচন্দ্র প্রভূত অর্থোপার্জন করেন এবং অগ্রজ শরচ্চন্দ্রকে নানাভাবে সাহায্য করেন। রমেশচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন ও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হননি, শরচ্চন্দ্রের পাঁচপুত্র ও দুই কন্যাকে নিজ সন্তানের মতোই মনে করতেন। শরচ্চন্দ্র বড় দুই ছেলের শিক্ষা ব্যবস্থা নিজ খরচেই করেন। দুই কন্যাকেও প্রাথমিক শিক্ষাদানের পর সৎপাত্রে অর্পণ করেন। শেষের তিনপুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রমেশচন্দ্রই করেন।

অকৃতদার রমেশচন্দ্রের জীবনেও অধ্যাত্ম সাধনার আলোকপাত হয়। যৌবনকাল থেকেই অধ্যয়ন ও কর্মের মাঝে তাঁর জীবন প্রণালী অতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি একাহারী ছিলেন। রাত্রে পাথরের থালা গ্লাসে দুধ ও সামান্য ফল মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতেন না। অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও রাশভারী ছিলেন। তিনি নিজগ্রাম কোটাপাড়াতে পারিবারিক ৺কাত্যায়নী বিগ্রহের জন্য পাকা মন্দির নির্মাণ করেন। বাৎসরিক দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন, পূজার সময় গ্রামস্থ দুঃস্থদের বস্ত্রাদি বিতরণের ব্যবস্থা করেন ও নানা জনহিতকর কাজ করেন। শরচ্চন্দ্রের দেহাবসানের পর রমেশচন্দ্র সুবিখ্যাত বৈষ্ণব

শরচ্চন্দ্রের পাঁচপুত্রই গ্রাজুয়েট। তৃতীয় বিষ্ণুপদ ইতিহাসে এম. এ। বহু বৎসর কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা ক'রে অবসর গ্রহণ করেন। চতুর্থ শিবপদ দর্শনশাস্ত্রে এম. এ ডি. লিট. এবং বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক।

সাধক সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে 'রসিকদাস বাবাজী' নামে পরিচিত হ'য়ে বৃন্দাবন মঠে বসবাস করেন এবং মঠাধ্যক্ষ হ'ন। বিত্তবান রমেশচন্দ্র তাঁর সন্ন্যাস-জীবনে যে দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন ও দীনভাবে দিনাতিপাত করেছেন, তা তাঁর ত্যাগের মহিমাই নির্দেশ করে। ১৯৫৪ খৃঃ বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যান। সেখানে প্রথম দিনের স্নানের পর যোগাসনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বি. এ. পাশ করার পর পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজনে যথাসম্ভব শীঘ্র শরৎকে চাকুরীর সন্ধান করতে হয়েছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদপার্থী হ'য়ে সমস্ত লিখিত পরীক্ষাতেই তিনি উত্তীর্ণ হন। কিন্তু শোনা যায় 'ঘোড়ায় চড়া' পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্য তিনি ঐ পদ লাভে বঞ্চিত হন। এরপর তিনি ডাকবিভাগে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের কাজ পান। চাকুরী জীবনে তিনি বিশেষ উন্নতি করতে পারেননি। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের থেকে পোষ্ট-মাষ্টারের পদে উন্নীত হয়েই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। শরচ্চন্দ্র ছিলেন স্পষ্টবক্তা এবং অপরের নিকটে দান ভিক্ষা করা তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। ইংরেজ প্রভুগণের খোসামোদ করা তিনি গর্হিত মনে করতেন। নানা কারণে তিনি ইংরেজের বিরাগভাজন হ'য়ে পড়েন।

তখনকার দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলার ছেলেরা স্বামীজীর ভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত ছিল। স্বামীজী নিজে যদিও প্রত্যক্ষ রাজ-নীতিতে যোগ দেন নি, তবু ঐ মহাপুরুষের প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে তখনকার দিনের রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে উৎসাহ জুগিয়েছে। বাংলার বিপ্লবী যুবকবৃন্দ, নিয়মিতভাবে শরচ্চন্দ্র রচিত "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" পাঠ করতেন ও স্বামীজীর মতবাদ আলোচনা করতেন। পাগড়ী পরা, গেরুয়া আলখাল্লাধারী চারণ কবি মুকুন্দদাস বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে প্রচার করে বেড়িয়েছেন। মুকুন্দদাসের সুললিত কণ্ঠ সাধারণ মানুষের মনে বিপ্লবী ভাব-ধারা জাগাতে সাহায্য করে। চারণ কবি শরৎ-কবির খুব নিকট বন্ধু ছিলেন। মুকুন্দদাস

গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে যখনই শরচ্চন্দ্রের কর্মস্থলে এসেছেন, তখনই বিবেকানন্দ-শিষ্যের সান্নিধ্যে এসেছেন। শরচ্চন্দ্র-গীতাবলী মুকুন্দদাস উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর যাত্রা আসরে গেয়ে বেড়াতেন। স্বভাবতই এই চারণকবি ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে শরচ্চন্দ্রের ওপরেও রাজরোষ বর্ষিত হয়েছে। এমনকি কিছুদিন শরচ্চন্দ্রের পশ্চাতে ইংরেজের গুপ্তচর কার্যরত ছিল। বোধ হয় এই কারণেই তাঁকে পোষ্টমাষ্টারের পদে বার বার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলী করা হয়েছে, আর কিছুদিন পরে পরেই তাঁর উঠতি বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীদের থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। একনিষ্ঠ সততা ও আত্মমর্যাদাবোধ শরচ্চন্দ্রের ব্যাবহারিক কর্মজীবনে সাফল্যের অন্তরায় হয়। একবার বরিশালের জমিদার (পূর্বোল্লিখিত শরচ্চন্দ্রের ছাত্র প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের পিতা) শরচ্চন্দ্রের সততার পরিচয় পেয়ে তাঁকে জমিদারীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করতে চান। ম্যানেজার পদের বেতন ছিল খুবই লোভনীয় এবং ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের বেতনের দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু আর্থিক সংকটে পড়েও শরচ্চন্দ্র সেই চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। পরে পিতার অবর্তমানে ছাত্রের অধীনে শিক্ষক শরচ্চন্দ্রকে কাজ করতে হবে, এই কথা স্মরণ করেই মনে হয় শরচ্চন্দ্র ঐ চাকুরী গ্রহণ করেননি।

স্বামী বিবেকানন্দ-সমীপে শরচ্চন্দ্র

কলকাতার মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউটে পড়বার সময়েই শরচ্চন্দ্রের জীবনে প্রথম সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ১৮৮৯ খৃঃ সাধু নাগমহাশয় তাঁকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিয়ে যান। সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, প্রেমানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও তাঁদের উপদেশাবলী

গ্রহণ করতে থাকেন—মাঝে মাঝে সেখানে প্রসাদও গ্রহণ করতেন। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ খৃঃ মধ্যে শরচ্চন্দ্রের মঠে যাতায়াত ঘন ঘন হ'তে থাকে। এই সময়ে লুকিয়ে দুপুরে মঠে গিয়ে সাধুদের এঁটো বাসন মাজা, রান্না করা, মঠে রাত্রি যাপন প্রভৃতি নিয়মিতভাবে করতেন। শোনা যায় এই সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকে সাময়িক বিশ্রাম দেবার জন্য ঠাকুরের ভোগ তিনি নিজ হস্তে প্রস্তুত করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সাধুদের কাছে নানা কথা শুনে শরচ্চন্দ্র কৃতকৃতার্থ হন। এই সময়েই তিনি সংস্কৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র রচনা করেন।

১৮৯৭ খৃঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী—স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরেছেন। সমগ্র দেশবাসী স্বামীজীর আমেরিকা সফরের সাফল্যে আনন্দে উদ্‌বেলিত। শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ হ'য়ে উঠছে না। তিন চার দিনের মধ্যে সুযোগ মিলে গেল। একদিন দুপুরে বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ ছিল। সংবাদ পেয়ে বহু ভক্ত ও যুবকবৃন্দ ঐ বাড়ীতে সমাগত হয়েছেন। শরচ্চন্দ্র তখন তাঁর দর্জিপাড়ার বাড়িতে থাকেন। খবর পেয়ে তিনিও মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর প্রিয়নাথ বাবুর বাড়িতে বেলা আড়াইটা নাগাদ উপস্থিত হলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ অবিলম্বে তাঁকে স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী দেখলেন ২৮।২৯ বৎসরের এক দীর্ঘকায় যুবক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। পরণে ধুতি, কামিজ ও কাঁধে একটি চাদর। গায়ে রং শ্যামল। কিন্তু চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল। ছেলেটি এসে স্বামীজীকে প্রণাম করলে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর কাছে তার পরিচয় দিলেন। স্বামীজী এর আগে শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃতে লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি পাঠ করছেন এবং শরচ্চন্দ্রের যে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-প্রধান সাধু নাগমহাশয়ের কাছে যাতায়াত রয়েছে, তাও শুনেছিলেন।

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ ক'রে তাঁর ও সাধু নাগমহাশয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। নাগমহাশয়ের অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম ঈশ্বরানুরাগ ও দীনতার উল্লেখ ক'রে কালিদাসের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাদ্ হতাঃ, মধুকর ত্বং খলু কৃতী"। কথাগুলি লিখে নাগমহাশয়কে জানাবার জন্য শরচ্চন্দ্রকে আদেশ ক'রলেন।

শরচ্চন্দ্রের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম। এর আগে তিনি এমন তেজোদীপ্ত মানুষ দেখেন নি। স্বামীজীর সংস্কৃত সম্ভাষণ ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে শরচ্চন্দ্র মনে মনে বিমুগ্ধচিত্তে স্বামীজীকে গুরুপদে বরণ করলেন। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার পূর্বে একবার তাঁর মনে দীক্ষালাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগে। নাগমহাশয়ের কাছে একথা জানিয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁকে অনুরোধ করেন। নাগমহাশয় নিজে কায়স্থ এবং শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মণ—এই অজুহাত দেখিয়ে নাগমহাশয় নিজে পরিত্রাণ পান। তিনি আরও বলেন, "সাক্ষাৎ শিব আপনার গুরু হবেন।" শরচ্চন্দ্র মনে মনে ভাবতে থাকেন, ইনি সিদ্ধপুরুষ, এঁর মুখের বেদবাক্য কখনও বিফল হবে না। স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করবার বেশ কিছুদিন পরে একদিন আলমবাজার মঠে উপস্থিত হ'য়ে শরচ্চন্দ্র দেখেন স্বামীজী শুয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, স্বামীজী আর সেখানে নেই, সাক্ষাৎ শিব শুয়ে আছেন। শরচ্চন্দ্র সন্দেহ নিরসনের জন্য রোমাঞ্চিত কলেবরে পরীক্ষা করে দেখেন, সত্য সত্যই স্বয়ং শঙ্কর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। তখন তাঁর নাগমহাশয়ের আশীর্বাদের কথা মনে প'ড়ল। শরচ্চন্দ্র স্থির করলেন—শঙ্কররূপী স্বামীজীর কাছেই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করবেন।

স্বামীজী কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীরামকৃষ্ণমঠ আলমবাজারে এক পুরানো বাড়িতে ছিল। স্বামীজীর কলকাতার ভক্তবৃন্দ, আলমবাজার মঠের পরিবর্তে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে

স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা করেন। দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীরা কখনও আলমবাজারে কখনও কাশীপুরে সমবেত হ'তেন। শরচ্চন্দ্রও প্রায়ই উভয়স্থানে যেতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি সমাগত। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে উৎসবের বিপুল আয়োজন হয়েছে। স্বামীজী তখন আলমবাজারের মঠে। গুরুভাইরা বিপুল উৎসাহে স্বামীজীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হ'লেন। শরচ্চন্দ্রও তাঁদের অনুসরণ করলেন। স্বামীজীর সঙ্গে দুজন ইংরেজ মহিলাও উৎসবে এসেছেন। শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজীর তখনও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তবু মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে শরচ্চন্দ্র রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সম্পর্কে স্বরচিত একটি সংস্কৃত কবিতা স্বামীজীর হাতে দিলেন। স্বামীজী কবিতাটি পড়তে পড়তে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। তারপর শরচ্চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।" স্বামীজীর এই প্রেরণা ও উৎসাহ শরচ্চন্দ্রের অন্তরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এর পর প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথির দিনে, উৎসব উপলক্ষে, সংস্কৃত ভাষায় সুললিত স্তব স্তুতি রচনা ক'রে তিনি উৎসব প্রাঙ্গণে বিতরণ করতেন। এই রকম বহু স্তব, গান ও বাংলা কবিতার একটি সংকলন পরে "উদ্বোধন" কার্যালয় থেকে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাত্ম-স্তবমালা" নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

শরচ্চন্দ্র যতই স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ হ'তে লাগলেন, স্বামীজী ততই তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে স্বামীজীর সব কাজকর্মের সঙ্গে শরচ্চন্দ্র নিজেকে যথাসাধ্য যুক্ত করতে লাগলেন। পরম প্রীতি ও স্নেহভরে স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে "বাঙাল" বলে ডাকতেন। শরচ্চন্দ্র যখন স্বামীজীর কাছে যান, তখন তিনি গোঁড়া নৈষ্ঠিক, বেদান্তবাদী ব্রাহ্মণ। আচার-বিচার একটু বেশী মাত্রাতেই তাঁর ছিল। স্বামীজীর উদার মনোভাবের সংস্পর্শে এসে তাঁর আচার-সর্বস্বতা ও গোঁড়ামি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছিল।

প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে স্বামীজী যখন কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। স্বামীজী এদের ব্রহ্মচর্যবিষয়ে উপদেশ দিতেন ও সন্ন্যাস গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীজীর নির্দেশে শরচ্চন্দ্র এই সব যুবকদের প্রাক্‌সন্ন্যাস শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করতেন।

১৮৯৭ খৃঃ ১লা মে, ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ শরচ্চন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ একই দিনে স্বামী শুদ্ধানন্দও (ব্রহ্মচারী সুধীর) স্বামীজীর কাছে দীক্ষিত হন। শরচ্চন্দ্রের জীবনে এই স্মরণীয় দিনটির কথা যে ভাবে স্বরচিত গ্রন্থ "স্বামি-শিষ্য-সংবাদে" বলা হয়েছে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেহেতু শরচ্চন্দ্র প্রথমে সাধু নাগমহাশয়ের সান্নিধ্যে আসেন, সেই হেতু, স্বামীজীর নিকট দীক্ষিত হবার জন্য, স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী, শরচ্চন্দ্রকে নাগমহাশয়ের অনুমতি ভিক্ষা করতে হয়।

"১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন "আজ তোকে 'বলি' দিতে হবে—না?"……

……অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করতে লাগলেন: আমি তোকে যখন যে কাজ করতে ব'লব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হ'লে তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ্, নতুবা সহসা গুরু ব'লে গ্রহণ করতে এগোস্‌নি। এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।··

···বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদু পদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে 'বাবা, আয়' বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন 'দোরে খিল দে'। সেইরূপ করা হইলে বলিলেন, 'স্থির হয়ে আমার বামপাশে বোস্'। স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন।······

······অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, 'গুরুদক্ষিণা দে'। শিষ্য বলিল, 'কি দিব?' শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, 'যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়'। শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০/১৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেগুলি সব খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন 'যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল'।"

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে শরচ্চন্দ্র ১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং ২৮শে জুন, ১৯০২ খৃঃ তাঁকে শেষ দর্শন করেন। এই পাঁচ বৎসরাধিক কালের মধ্যে স্বামীজী মঠে এবং কলকাতায় থাকার সময় শরচ্চন্দ্র ঘন ঘন তাঁর

গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করতেন। এই সময়, পূর্ববঙ্গীয় মাছের সুক্তনী, তিনি তাঁর গুরুদেবকে স্বহস্তে রান্না করে খাইয়েছেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করেছেন, পাঠ নিয়েছেন, নানা আলোচনা করেছেন এবং মনে মনে শ্রীগুরুর ভজনা করে চিত্তপ্রসাদ লাভ করেছেন। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে শরচ্চন্দ্র, ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদগণের অকুণ্ঠ প্রীতি ও অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। স্বামীজী কেবল শরচ্চন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শকই ছিলেন না ; শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর অন্তেবাসী হয়ে বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করেছেন এবং বেদান্তদর্শন. সাংখ্য-যোগ ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করেছেন। শরচ্চন্দ্র লিখেছেন, "বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তি-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখন বা প্রমাণ প্রয়োগে ঐ পদের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।" (স্বামি-শিষ্য সংবাদ—পৃঃ ৩৪) এই সব কথাতে বোঝা যায় যে বেদ, উপনিষদ বা বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব মতামত ছিল। সেগুলি তিনি শরচ্চন্দ্রকে বুঝিয়ে দিয়ে, ঐ নূতন মতানুযায়ী এক বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখতে শরচ্চন্দ্রকে আদেশ করেন। উত্তরকালে শরচ্চন্দ্র গুরুর আদেশ শিরোধার্য ক'রে বেদান্তের "বিবেকভাষ্য" নামে এক ভাষ্য রচনা করেন। শরচ্চন্দ্র লিখিত ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু অংশ উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন তা শরচ্চন্দ্রের পুত্রদের কাছে রয়েছে। ঐ গ্রন্থ পরিশোধিত অবস্থায় প্রকাশিত হ'লে বিবেকানন্দর বেদান্তমীমাংসা সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে কখনও 'বাঙাল', কখনও 'ভট্‌চায' (পূজারী ব্রাহ্মণের সন্তান) বলে সম্বোধন করতেন। শরচ্চন্দ্রের সনাতন হিন্দু-ধর্মের প্রতি গোঁড়ামি ও নিষ্ঠার দিকে কটাক্ষ করবার জন্যই যেন স্বামীজী

ভট্‌চায অভিধা প্রয়োগ করতেন। কতবার যে শরচ্চন্দ্রের বাছবিচার, কুলপ্রথা, আচার নিষ্ঠা ভেঙে চুরমার ক'রে স্বামীজী গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ভট্‌চাযকে ডেকে স্বামীজী নিজের প্রসাদী বিস্কুট খাইয়ে হাসতে হাসতে বলেছেন যে, ঐ বিস্কুটে মুরগীর ডিম রয়েছে। শিষ্য শরচ্চন্দ্রও কম যান না; হাসিমুখে তিনিও বলেছেন যে গুরুর প্রসাদ খেয়ে তিনি অমর হয়েছেন। স্বামীজী ধর্মের বহিরঙ্গের মুখোস খুলে দিয়েছেন, আর শরচ্চন্দ্র গভীর নির্ভরতায় গুরুকে আশ্রয় করেছেন।

স্বামীজী যখন বলরাম-মন্দিরে (বাগবাজার) থাকতেন, তখন একদিন ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট্ নোবল্) কে নিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখতে যান। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধায়ককে খবর দেবার জন্য, স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে আগেভাগেই পশুশালায় উপস্থিত হয়েছিলেন। পশুশালা দর্শনের পর তত্ত্বধায়ক মহাশয়ের চায়ের টেবিলে, স্বামীজী শিষ্যকে নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন গ্রহণ করতে বলেন; আবার নিজে গ্লাসের জল পান ক'রে শিষ্যকে পান করতে দেন। রাত্রে বাগবাজারে ফিরে স্বামীজী রহস্য ক'রে উপস্থিত সবাইকে বলেন, "আজ এই ভট্‌চায-বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে! তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে অত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে খেলি?"

শিষ্য—তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম; আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী—তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মানবে না!

শিষ্য—না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—পৃঃ ১২৩, ১২৪)

এই ছবি শিষ্য শরচ্চন্দ্রেব আলেখ্য। শরচ্চন্দ্র নিবেদিত-প্রাণ শিষ্য ছিলেন, আর শ্রীগুরু তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর জাত্যভিমান, আচারের অভিমান এমনি ক'বে উড়িয়ে দিয়েছেন।

মঠে, বিশেষ ক'রে স্বামীজীর সম্ভাষণে শরচ্চন্দ্রের অভিধা ছিল "বাঙাল"। বাঙাল শরচ্চন্দ্র অবশ্যই পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ; কিন্তু এ ডাক ছিল প্রীতি, ভালবাসা ও আদরের ডাক। কখন কখন যে বাঙালের আচরণে সাধুরা বিরক্ত হননি, এমন নয়। স্বামীজীর আদেশে রাত ৪টা থেকে ধ্যানে বসবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে সাধুদের ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব মাঝে মাঝে প'ড়ত শরচ্চন্দ্রের ওপর। শরচ্চন্দ্রও শ্রীগুরুর আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

বেলুড়ের সেই প্রাথমিক অবস্থাতে, মঠ-নির্মাণকালে এই 'বাঙাল' নামের সঙ্গে মহারাজদের যে কি অপার স্নেহ, ভালবাসা ও প্রীতি জড়িত ছিল, তার সীমা ছিল না। শরচ্চন্দ্রের প্রতি স্বামীজীর অপরিসীম স্নেহের আর একটা কারণ ছিল—শরচ্চন্দ্র ছিলেন সমঝদার। স্বামীজীকে তাঁর 'বাঙাল' যেমন বুঝতে পারত, স্বামীজীও তেমনি তাঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতেন। স্নেহ সর্বদাই নিম্নগামী। তাই যখন স্বামীজীর মন অসার সংসারলোক অতিক্রম করে যেত, যখন কোন সুদূরস্থিত গহন আনন্দলোকে তিনি ধ্যানযোগে উধাও হয়ে যেতেন, তখন পাছে আর ধ্যান না ভাঙে এই ত্রাসে গুরুভ্রাতৃগণ ভীত হয়ে শরচ্চন্দ্রকেই বারে বারে স্বামীজীর পাদপীঠে ঠেলে দিতেন। তাঁদের ভরসা ছিল যে স্বামীজীর করুণা ও স্নেহধন্য 'বাঙাল' তাঁকে তাঁর তুরিয়াবস্থা থেকে নিম্নভূমিতে টেনে আনতে সক্ষম হবে। আর হ'তও তাই। "কে বাবা, এসেছিস্ বোস্"। কিছুক্ষণ পরে "যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়—" এই বলে স্বামীজী আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতেন।

১৮৯৮ খৃঃ, ৯ই ডিসেম্বর—নূতন মঠের জমিতে যজ্ঞ করে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। (স্বামী-শিষ্য সংবাদ—পৃঃ ১১০—১১২)

তখনও মঠবাড়ি নির্মিত হয়নি। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে ক'রে আনয়ন করেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে পরে স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে ঐ তাম্রপেটিকা মস্তকে ধারণ ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ করেন, কেননা বহুজনহিতায় সন্ন্যাসীরা যাঁর প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অধিকার নাকি তাঁদের (সন্ন্যাসীদের) নেই। কেবল শ্রীগুরুর আজ্ঞাতেই ঠাকুরের দেহাবশেষের পবিত্র আধারটি স্পর্শ করতে সাহসী হন শরচ্চন্দ্র। ঐ পবিত্র আধার মস্তকে ধারণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য শরচ্চন্দ্রের হয়েছিল। এই ভালবাসাও ক-জনের ভাগ্যে ঘটে? শরচ্চন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল বলেই 'বাঙাল' এইভাবে স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের এতটা স্নেহ ভালবাসা লাভ করেছিলেন।

আর একদিনের কথা—শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মমীমাংসা করতে করতে কিছুটা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—"অতঃপর স্বামীজী বলিলেন, 'তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি? —তবে শো'। শিষ্য স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল, স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চনা করিবার জন্য স্বামীরজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত আগ্রহে স্বামীজী সম্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুরা পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামি-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'তোর পূজো তো হ'ল, কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কিনা

* স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—পৃ: ১০২, পৃ: ৬৪-৬৫

ঠাকুরের, পূজোর বাসনে (পুষ্প পাত্রে) আমার পা রেখে পূজো করলি ? কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, 'ওরে, দেখ্. আজ কি কাণ্ড করেছে !! ঠাকুরের পূজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমায় পূজো করেছে। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা বেশ করেছে ; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন ?' কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।"—এই ছবি ভক্ত শরচ্চন্দ্রের।

আবার একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বললেন যে শিষ্য (শরচ্চন্দ্র) ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা বড় মাছ এনেছে। কিন্তু সেদিন রবিবার। রবিবার মঠে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না। স্বামীজী মাছ দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "আজই ভাল করে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে। ভক্তের আনীত দ্রব্যে শনিবার রবিবার নেই, ভোগ দিগে যা—" এই ঘটনায় শরচ্চন্দ্রের প্রতি স্বামীজীর অপার দয়া ও স্নেহ প্রকাশ পায়।

২২শে জানুয়ারী—সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণের দিন শিষ্য শরচ্চন্দ্র নিজ হস্তে স্বামীজীকে রেঁধে খাওয়াবে। বলরাম বাবুর রন্ধনশালায় শিষ্য রন্ধনকার্যে নিযুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ গতপ্রাণা যোগীন-মা শিষ্যকে দেখিয়ে দিচ্ছেন ও স্বামীজ খবর নিচ্ছেন কতদূর কি হ'ল। ভাত, মুগের দাল, কই-মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তানি রান্না প্রায় শেষ। এমন সময় স্বামীজী নিজেই পাতা পেতে বসে গেলেন ; বললেন, 'যা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়, আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।' শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল না ; কিন্তু স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলকাতার লোকেরা মাছের সুক্তনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে। এটা একান্তই 'বাঙাল' দেশী রান্না। স্বামীজী খেয়ে খুশী হয়ে বললেন, 'এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের 'জুল'টা যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।' পূর্ববঙ্গের রন্ধনশিল্প অদক্ষ রাঁধুনীর হাতে যে রূপ গ্রহণ

করেছিল তার নিন্দা, প্রশংসার মধ্য দিয়ে শিষ্যের প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ ও ভালবাসাই প্রকাশ পেয়েছে।

"কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "ওরে গেরন লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে"। এই বলিয়া একটু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, 'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' এই ভাবিয়া শিষ্য শান্তমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল।"

এই হ'ল গুরুগতপ্রাণ ভক্ত ও শিষ্য শরচ্চন্দ্রের ছবি। এমন অনলস কিঙ্কর না হ'লে সর্বত্যাগী মহাপুরুষের প্রীতিভাজন হওয়া কঠিন। ১৯০১ খৃঃ—যখন স্বামীজী অসুস্থ তখন শিষ্য নির্ভয়ানন্দস্বামীর সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার নিয়েছে। এইভাবে নানা অবস্থাতে স্বামীজীর সেবা করে শরচ্চন্দ্র কৃতকৃতার্থ হয়েছেন।

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ—স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজের সম্পাদনায় 'উদ্বোধন' পত্রের প্রথম প্রকাশ হয়। স্বামীজী শিষ্যকে ঠাট্টা ক'রে বলেন "উদ্বন্ধন" পত্রিকা। "উদ্বোধন" আজও অব্যাহত গতিতে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পত্রিকা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবার পর স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে তার সম্পাদক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন*। কিন্তু এই পত্রিকায় তাঁর নানা প্রকার প্রবন্ধ, স্তবস্তুতি, গান প্রভৃতি প্রকাশিত হলেও শরচ্চন্দ্র ঐ কার্যভার গ্রহণ করতে পারেননি, কর্মব্যপদেশে তাঁকে নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে বলে।

১৮৯৭ খৃঃ—বলরাম বাবুর বাড়িতে প্রথম যখন রামকৃষ্ণমিশন স্থাপিত হয়, তখন গুরুর আদেশ শিরোধার্য ক'রে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্র-পাঠকের পদ গ্রহণ করেন। শাস্ত্র-পাঠকের কার্যভার পেয়েছিলেন বলে স্বামীজী তাঁকে নিজ যত্ন সহকারে ঋগ্‌বেদ পড়াতে আরম্ভ করেন।

* স্বামী শিষ্য-সংবাদ—পৃঃ ১৭৩, ১৭৫

শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মবিচার ও বেদান্তবিচার করতেন; জিজ্ঞাসু শিষ্যের মতো গুরুর কথায় কখন কখন প্রতিবাদ ক'রে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মার্থ উদ্ধার করতে চাইতেন এবং প্রাচী ও প্রতীচী উভয়দেশের স্বরূপ, জাতিবিচার, স্ত্রীশিক্ষা, দেশের দীনদরিদ্রের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার প্রভৃতি নানা সামাজিক বিষয়ে স্বামীজীর মতামত যত্ন সহকারে জেনে নিতেন। কবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ নিবেদিত-প্রাণ গৃহীশিষ্য। তিনি শুষ্ক বেদান্তচর্চা না করে, বরং বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করতে ভালবাসতেন। তাই গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের শুষ্ক শাস্ত্রবিচার সইতে পারতেন না। বেদান্ত শাস্ত্র কি মানুষের দুঃখ দূর করতে সমর্থ? দেশের হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি বন্ধ করার উপায় বেদে আছে কি? সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক স্বামীজী প্রেমিক স্বামীজীতে রূপান্তরিত হয়ে অশ্রু-বিগলিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু কেবল হৃদয়াবেগ নয়। ঐ কর্মবীর মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে 'বহুজনহিতায়' তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞের অংশ ভার নিতে আহ্বান করেছিলেন। শিষ্য তাঁর দুর্বলতাবশতঃ পুরোপুরি ঐ কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারেননি। গুরুবিয়োগের পরে, নিজের রচনা প্রকাশ মাধ্যমে এবং অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরুর আদেশ পালনে ব্রতী হন এবং তাঁর ভাবধারা প্রচার মাধ্যমে জনকল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বেলুড়ে ভাড়াটিয়া মঠবাড়ির কাছেই স্থায়ী ভাবে রামকৃষ্ণ মঠের নিজস্ব গৃহাদি নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি কেনা হয়। তখন ঐ জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদিন পদব্রজে মঠে স্বামীজী মঠের নূতন জমিতে গিয়ে শিষ্যকে ভাবী মঠের নির্মাণ, সংগঠন প্রণালী, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। প্রাচীন ও নবীন ভাবের সংমিশ্রণে, মঠ কিভাবে জ্ঞান, বিদ্যা অন্নদানের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হবে, কিভাবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষ বহুজনহিতায় ঐ

মঠ নিজেকে নিয়োগ করবে, অনাথ-আতুরের সেবা করবে ইত্যাদি শিষ্যকে বুঝিয়ে দেন। ১৮৯৯ খৃঃ—২০শে জুন স্বামীজী হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রা করেন। তাই স্বামীজীর সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল।

এই সময় এক বেদনাবিধুর টেলিগ্রাম পেয়ে সন্তান-সদৃশ শরচ্চন্দ্র সাধু নাগমহাশয়কে দেখতে দেওভোগ যাত্রা করেন। পরদিন রবিবার—রামকৃষ্ণমিশন সভায় 'বেদের ধর্ম' সম্বন্ধে শিষ্যের একটি প্রবন্ধ পড়ার কথা। শরচ্চন্দ্র বিবশ অবস্থায় কি করণীয় চিন্তা করছেন—এমন সময় লাটু মহারাজ (পূজনীয় স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি সব শুনে বললেন "বেদের বক্তৃতা দিতে জীবনে অনেক সময় পাবে, কিন্তু নাগমহাশয়ের শরীর গেলে তোমার ভাগ্যে আর সেই দেব-দুর্লভ মহাপুরুষের দর্শন মিলবে না।" শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত হরমোহন মিত্রের অর্থ-সাহায্যে শরচ্চন্দ্র সেই দিনই দেওভোগ যাত্রা করেন। এরপর দীর্ঘ তেরদিন সন্তানের মতো, নাগমহাশয়ের শেষ শয্যাপার্শ্বে দিনরাত উপস্থিত থেকে, তাঁর সেবা ক'রে. অন্তে মুখে গঙ্গাজল ও শিয়রে বসে গীতা পাঠ ক'রে পুত্রের শেষ কর্তব্য পালন করেন। স্বামী সারদানন্দর উপস্থিতিতে একখানি বেদী রচনা ক'রে নাগমহাশয়ের ভস্মাস্থি স্থাপন করা হয়। নাগমহাশয় ও মাতা-ঠাকুরানী শরচ্চন্দ্রকে আপন সন্তান জ্ঞান করতেন। শেষ সময়ে পুত্রোচিত কাজ ক'রে শরচ্চন্দ্র চরম বেদনার মাঝেও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। পরে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, তিনি নাগমহাশয়ের একখানি জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে—স্বামীজী দেশে ফিরে এলে, আরও কিছুদিন শরচ্চন্দ্র স্বীয় গুরুর অনুগ্রহ লাভ করেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতে পত্র বিনিময় হ'ত। সে সবই গভীর তথ্যপূর্ণ। দেবভাষায় শরচ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্যের জন্য স্বামীজী যখনই ইচ্ছে করতেন, শিষ্যকে ডেকে সংস্কৃতে বাক্যালাপ

করতেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের—৪ঠা জুলাই স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন হন। সহসা গুরুদেবের মহাপ্রয়াণে শরচ্চন্দ্র ব্যথাতুর ও মর্মাহত হয়ে পড়েন। এই নিদারুণ আঘাতের বেদনা তাঁকে প্রায় বিমূঢ় ক'রে ফেলে। কর্তব্যের তাগিদে তিনি সংসার ত্যাগ করতে পারলেন না। কিন্তু সংসারের প্রতি নিরাসক্তি এই সময়ে তাঁকে গভীরভাবে পেয়ে বসে। গুরু-বিরহের যাতনার মর্মস্পর্শী রচনা এই সময় থেকে 'উদ্বোধনে' নিয়মিতভাবে প্রকাশ হ'তে থাকে।

চাকুরীজীবন ও সংসারযাত্রা

কর্মোপলক্ষে শরচ্চন্দ্র হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বরিশাল, পূর্ণিয়া, ডুমকা, গয়া, ঝরিয়া, রাঁচী, পুরুলিয়া, কটক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন। কর্মস্থলে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ, আর ইংরেজ সরকারের চাকুরী ছিল অপ্রধান। তাই অনেক সময় চাকুরীতে অবহেলা হ'য়ে যেত। এই কারণে তাঁর চাকুরীজীবনে অবনমনও ঘটেছিল। কিন্তু প্রভূত অর্থোপার্জন না করতে পারলেও ব্যাবহারিক জীবনে সাফল্য না হলেও এই সদানন্দ পুরুষের নিরাসক্ত জীবনে সাধুসঙ্গ ও বিদ্যোৎসাহ কোন দিনই কিছু কমতি ছিল না। শরচ্চন্দ্র বিবেকবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। সংসার-জীবনে প্রথম তিনি ব্যারাকপুর ডাকঘরে ডেপুটি পোস্টমাস্টার পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বছর কাজ করার পরে তিনি পোস্টমাস্টারের পদে উন্নীত হন। চাকুরীজীবনে এটাই ছিল তাঁর প্রথম বা শেষ উন্নতি। চাকুরীতে থাকাকালে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নিজ কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভাবধারা প্রচার করে বেড়িয়েছেন। অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার কটকে বক্সীবাজার প্রধান পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারের

পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ স্বাধীন মনোভাব বর্জন ক'রে ওপরওয়ালার স্তাবকতা তিনি কখনই করতে পারতেন না। তাঁর চলনে বলনে প্রবন্ধাদি রচনায়, নানা পত্রপত্রিকায় তাদের মুদ্রণে ও প্রচারে তার স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ পেত। ইংরেজের দাসত্ব থেকে দেশবাসীর মুক্তিকামী বাঙালী যুবকদের মধ্যে তখন স্বামীজীর অনুপ্রেরণা কাজ ক'রে চলেছে।' তখন এই সব যুবকেরা ভগবদ্‌গীতার মতোই "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" নিয়মিত পাঠ করত এবং উৎসাহিত হ'ত। আগেই বলা হয়েছে যে, সঙ্গত কারণেই ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচরেরা কিছুকাল শরচ্চন্দ্রের আচরণাদি পর্যবেক্ষণ করে ছিল। বিবেকানন্দ শিষ্য শরচ্চন্দ্র ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। স্বীয় গুরুর বক্তৃতামালার প্রভাব স্মরণ ক'রে গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

শরচ্চন্দ্রের স্ত্রী মোক্ষদায়িনী ছিলেন পরম নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা, সহজ ও সরল রমণী। তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু পতিব্রতা, আদর্শ গৃহিণী ও অতিথিসেবাপরায়ণা ছিলেন। মোক্ষদায়িনী শ্রীশ্রীমা সারদামণির অকুণ্ঠ কৃপালাভে ধন্যা হয়েছিলেন, আর সাধু নাগমহাশয় ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদগণের সেবাধিকার লাভ ক'রে কৃতকৃত্যা হয়েছিলেন। দেশের বাড়ীতে থাকাকালে মোক্ষদায়িনী অনেক দিন যাবৎ সাধু নাগমহাশয়ের পুণ্যসঙ্গ লাভ করেছিলেন। শরচ্চন্দ্র যেমন সুযোগ পেলেই বেলুড় মঠে মহারাজদের ও ভক্তবৃন্দের নিকটে যেতেন তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ ও অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীরা তাহার কলিকাতাস্থ চিন্তামণি দাস লেনের বাসগৃহে ও অন্যান্য কর্মস্থলে শুভাগমন করতেন। মোক্ষদায়িনী এইভাবে সাধুসেবায় অভ্যস্তা হয়ে গিয়েছিলেন। শরচ্চন্দ্রের গৃহে সাধুভোজন ও আনন্দোৎসব লেগেই থাকত। সংসার-যাত্রার এটাই ছিল এক আবশ্যিক অপরিহার্য অঙ্গ। সম্পূর্ণ নিরভিমান, নির্লিপ্ত, সাত্ত্বিক ভাবের নারী মোক্ষদা তাঁর সরলতায় সকলেরই অতীব প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শেষজীবনে অবসর-সময়ে সর্বদাই তাঁকে

উদাস মনে একাগ্রভাবে মালা জপ করতে দেখা যেত। মন যে তাঁর সংসারে একেবারেই নেই, এই দৃশ্য অত্যন্ত প্রকট ছিল। শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুর বার বছর পরে মোক্ষদায়িনী কলিকাতায় দেহরক্ষা করেন।

আগেও বলা হয়েছে যে শরচ্চন্দ্রের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। 'দুখ-চেটে' গৃহস্থ হ'তে শ্রীগুরুর বারণ ছিল বলে আর্থিক অসচ্ছলতাও তাঁর সদানন্দ ভাব ম্লান করতে পারেনি। মাসের প্রথমে প্রচুর বাজার করে, ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করতেন। মাসের শেষে অর্থের অপ্রতুলতা থাকত ; কিন্তু মন নিরানন্দ হ'ত না।

শরচ্চন্দ্র কেবল গান রচনাই করতেন না, নিজে সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। বড় মেয়ে ইন্দিরা অতি সুন্দর গাইতে পারত এবং বড় ছেলে জয়চন্দ্র সঙ্গীতবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ইন্দিরা পিতার রচিত গানগুলি বাবার সঙ্গে সুমধুর কণ্ঠে গাইতে অভ্যস্ত ছিল। শরচ্চন্দ্রের রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন অবলম্বনে "শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী" নানা সুর সংযোগে আবৃত্তি ও গীত হবার যোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব সময় থেকে স্বপ্রকটন ও ভক্তমিলন পর্যন্ত সপ্তম পর্বে সমাপ্ত এই পাঁচালীর প্রতি পর্ব বিভিন্ন সুর ও ছন্দে গ্রথিত। শরচ্চন্দ্রের ছেলেমেয়েরা প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে আনন্দের সঙ্গে সেই পাঁচালী গান করত। শরচ্চন্দ্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, পাঁচালী গান সহকারে নিয়মিত আয়োজিত হত। আজ পর্যন্ত শরচ্চন্দ্রের ছেলেমেয়ের সংসারে, শরচ্চন্দ্রের নাতিনাতনীদের জন্মদিন উপলক্ষে নিয়মিত পাঁচালী গীত হ'য়ে থাকে। তাদের ঘরে ঠাকুর ও স্বামীজীর পূজা অব্যাহত আছে। শরচ্চন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা গৃহকর্তার নিয়ত সাধুসঙ্গ দেখে স্বাভাবিকভাবে তাঁর ভাবে ভাবিত হয়েছিল। তিনি কখনও কাউকে ধার্মিক হবার জন্য, এমন কি দীক্ষা নেবার জন্যও বলেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল বাড়ীতে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরী হ'লে এবং সাধুসঙ্গ লাভ হ'লে আপনা হতেই মনে ধর্মভাব জাগবে। একমাত্র এই কারণেই তিনি কন্যাদের

নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন করতে গেছেন, অথচ অপার করুণাময়ী জননীকে কখনও বলেননি কন্যাদের দীক্ষাদানে ধন্য করবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার সঙ্গে নানা দেবদেবীর স্তবগান করা শরৎবাবুর বাড়ির সন্ধ্যার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। পুরুলিয়ায় থাকতে ছোট তিনপুত্রকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণ করার সময় উদাত্ত কণ্ঠে নানা দেবদেবীর প্রণামমন্ত্র ও স্তবস্তুতি তাদের আবৃত্তি করতে শিখাতেন। প্রথমজীবনে পুত্রকন্যা সঙ্গে ও শেষজীবনে নাতি-নাতনীদের নিয়ে শরচ্চন্দ্র পাঁচালী পাঠ ও স্তবগান ক'রে গেছেন। এদের পরিবার স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণ-ভাবনায় ভাবিত। শরচ্চন্দ্রের সমগ্র পরিবারটি একই আধ্যাত্মিকতার সূত্রে গ্রথিত ছিল।

শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর তাঁর কৃপা ও প্রেমের স্মরণ মনন ও অনুধ্যান করেই শরচ্চন্দ্রের দিন অতিবাহিত হ'ত। বিভিন্ন কর্মস্থলে যখন যে অবস্থায় থাকতেন, সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীগুরুর পূজা পাঠ, স্মরণ করেই দিনের অনেক সময় কাটাতেন। বিভিন্ন কর্মস্থলে ভক্তসংঘ, পাঠচক্র, সোসাইটি, আশ্রমাদি গঠন করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতেন। এইভাবে তিনি স্বামীজীর উপদেশ স্মরণ করে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" শ্রীরামকৃষ্ণভাবে সকলকে ভাসমান করতে যত্ন করে গেছেন।

১৯০৪ থেকে ১৯০৮ খৃঃ পর্যন্ত শরচ্চন্দ্র বর্ধমানে কর্মরত ছিলেন। সেখানে শ্রীশ্রীমা শরচ্চন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তাঁকে ধন্য করেছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত "শ্রীশ্রীসারদাদেবী" পুস্তক (২৩৩ পৃঃ) থেকে জানা যায়—"একবার বর্ধমান হইয়া কলিকাতা আসিবার পথে শ্রীশ্রীমা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর বর্ধমানস্থিত বাসায় দুই-তিন দিন বাস করিয়াছিলেন এবং সর্বমঙ্গলা, অষ্টোত্তর শত-শিবমন্দির ও 'সুন্দরের মশানে'র কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।" অপ্রত্যাশিতভাবে করুণাময়ী মাকে এইভাবে কাছে পেয়ে বাড়ির সকলেই আনন্দ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল

ও বাড়ি পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। এই সময় শরচ্চন্দ্র বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও স্বামীজীর কাজে সক্রিয়ভাবে সাধ্যমত যোগদান করেন। "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের যুবকেরা উৎসাহিত হয় এবং কেবলমাত্র এই পুস্তকটি পাঠ করেই অনেক যুবক সংসার ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করে। স্বামীজীর ভাবে উদ্বুদ্ধ নব্য যুবকেরা দেশাত্মবোধের প্রেরণায় শরচ্চন্দ্র সমীপে এসে বিবেকানন্দের কথা শুনতেন। এই সময়ে নিয়মিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য রচনার মধ্য দিয়ে শরচ্চন্দ্র বিভিন্ন ভাবের প্রচার করেন।

১৯০৯ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শরচ্চন্দ্র কর্মব্যপদেশে মেদিনীপুর ও বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল সহরে ছিলেন। কলকাতা থেকে দূরে থেকেও তিনি মঠের গুরুভাই ও শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মেদিনীপুরে থাকাকালে শরচ্চন্দ্র ডাক বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। প্রথমে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত কয়েকজন ভক্তের সহযোগিতায় তিনি একটি ধর্মালোচনা চক্র স্থাপন করেন, পরে নাড়াজোলের জমিদারের দান-স্বরূপ একটি বাড়ী পেয়ে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেন। সেই আশ্রম এখন অনেক পরিবর্ধিত সেবাকেন্দ্র হয়েছে। বরিশালে থাকাকালেও সেখানকার স্থানীয় যুবকবৃন্দের সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন ক'রে নাগরিকদের অধ্যাত্ম সাধনার পথ প্রদর্শন করেন। এই সময়ে বিভিন্ন জটিল বিষয়ে জ্বলন্তভাব সহ গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ করেন তাঁর রচনার মাধ্যমে।* তৎকালীন রচনাবলীতে যেমন শরচ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই জানা গেছে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর অনুভূতি ও ধর্মানুরাগ।

স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে শরচ্চন্দ্র বদলীর কারণে যখন

* রচনা—"ক্রমাভিব্যক্তিবাদ," 'মানব জীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়', 'কাল ও কালী', 'অবতারবাদ', 'একত্ব ও বহুত্ব'—দ্রষ্টব্য।

যেখানে গিয়েছেন, সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তবৃন্দ প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর গৃহে সমবেত হয়ে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শুনতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কথা প্রচার করতে কখনও তিনি বিমুখ ছিলেন না। ১৯১৪ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গয়া, রাঁচী, ডেরেণ্ডা ও ঝরিয়ায় শরচ্চন্দ্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা বারে বারে আতিথ্য গ্রহণ ও অবসর যাপন করেছেন। এসব স্থানে পূজনীয়া গোলাপ মা, যোগিন মা, পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ও লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) নিয়মিত যাতায়াত ছিল। পূঃ খোকা মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, গৌরীমা প্রভৃতি শরচ্চন্দ্রের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কোলে পিঠে করেছেন, বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন, কত গল্প বলেছেন। এ সময়ে শরচ্চন্দ্রের সংসার সম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণভাবে ভরপুর ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র জয়চন্দ্র অনুমান এই সময়েই স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। শরচ্চন্দ্রের মাতা বিধুমুখী দেবী তাঁর বৈধব্যদশায় কাশীবাসী ছিলেন, তাই শরচ্চন্দ্র প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাশী যেতেন। সংসারধর্মের পাশাপাশি তাঁর লেখনীও বিরামহীন অমৃত বর্ষণ ক'রে চলে। নানা স্তবগান, শ্যামা-সঙ্গীত, 'বাঙালের বাক্যধর' প্রভৃতি এই সময়ে লেখা হয়। নিজে সুগায়ক ছিলেন আবার নিজ রচিত সঙ্গীতে সুরারোপও করতেন—সে সবই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিণীতে বিধৃত। জীবনের মধ্যাহ্নে যখন তিনি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দর্শনে যেতেন, তখন শ্রীমা—'বাঙ্গালের' সুললিত মধুর কণ্ঠে গান শুনতে ইচ্ছে প্রকাশ করতেন। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" (দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তম সংস্করণ) হ'তে জানা যায় একাধিকবার শরচ্চন্দ্র বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের অনুরোধে তাঁকে গান শোনান। একবার বলরামবাবুর বাসায় শ্রীশ্রীমা কোন ভক্তকে উদ্দেশ করে বলেন,—"কাল তুমি এলে না? কাল শরৎ চক্রবর্ত্তী এসেছিল। গান গাইলে,। আহা! তার কি ভাব! কি গান!" সুযোগ পেলেই শরচ্চন্দ্র বেলুড় মঠে উপস্থিত হতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের,

আরতির পর স্বরচিত গান দু-হাত তুলে নেচে নেচে গাইতেন; শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের যোগদানে সঙ্গীতবাসর দিব্যভাব ধারণ ক'রত।

১৯১৯ খৃঃ থেকে ১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত শরচ্চন্দ্র রাঁচী, ঝরিয়া, পূর্ণিয়া ও দুম্‌কাতে কাজ করেছেন। পূর্ণিয়ার প্রসঙ্গে একটি ঘটনায় শরচ্চন্দ্রের প্রতি শ্রীগুরুর অসীম কৃপা ও করুণার কথায় স্বাভাবিক-ভাবেই মন অভিভূত হ'য়ে পড়ে। একবার শ্রীগুরুর জন্মতিথি দিনে শরচ্চন্দ্র কাজে যাননি এবং নিয়ম-অনুযায়ী সেদিন ছুটির দরখাস্ত পাঠান হয়ে ওঠেনি। তাঁর অজান্তে সহসা অফিসে ইংরেজ কর্ম-কর্তার, বিশেষ পরিদর্শন কারণে পদার্পণ ঘটে। এই সংবাদ পেয়ে পরদিন চিন্তিত শরচ্চন্দ্র অফিসে গিয়ে দেখেন—তাঁর টেবিলে খোলা-খাতায় বড় সাহেব শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা ও বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক রিপোর্ট লিখে রেখে গেছেন! তাঁর কর্তব্যকর্মে অবহেলার এই পুরস্কার পেয়ে শরচ্চন্দ্র বার বার অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে শ্রীগুরুকে প্রণতি জানান। পূর্ণিয়াতে থাকাকালে শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে অমূল্যচরণ গাঙ্গুলী নামক এক রুচিবান সংস্কৃতিবান যুবকের আলাপ হয়। পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজার বাসী এই যুবকের ব্যবহার ও সদালাপে মুগ্ধ হ'য়ে শরচ্চন্দ্র পরবর্তীকালে তার সঙ্গে নিজের বড় মেয়ে ইন্দিরার বিবাহ দেন। বড় জামাই অমূল্যচরণ প্রথম আলাপেই শরচ্চন্দ্রকে চিনতে পারেন। বিবাহের পর ঘন ঘন তাঁর সান্নিধ্য লাভের কারণে তার নিজের জীবনে বিশেষভাবে শরচ্চন্দ্রের প্রভাব এসে পড়ে। অমূল্যচরণ অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। শরচ্চন্দ্র-রচিত দেশাত্মবোধক গান উদাত্তকণ্ঠে গাইতেন আর এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই সেই সময়ের স্বদেশীয়ানার উদ্দাম স্রোতে অংশগ্রহণ করে ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হন। পরবর্তীকালে এই পরিবার সম্পূর্ণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবে প্লাবিত হয়।

এরপর ঝরিয়া ও ডুমকাতে থাকাকালে স্বদেশপ্রেমী যুবকগণের প্রতি শরচ্চন্দ্র আকৃষ্ট হন এবং পরোক্ষভাবে এই সব নিবেদিতপ্রাণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়েন। শরচ্চন্দ্রের দুই খুড়তুত ভাই আজীবন চিরকুমার ছিলেন ও বিপ্লবী-সংঘে যোগ দিয়ে কারাবরণ ক'রে প্রচুর নির্যাতন ভোগ করেন। জীবনের বেশীর ভাগ তাঁদের অজ্ঞাতবাসেই কাটে। এহেন পরিবারের ছেলে শরচ্চন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। শরচ্চন্দ্রের গ্রামের বাড়ীতে বেশ কয়েকবার দারোগা-পুলিশের আগমন ঘটে ও খানা-তল্লাসী হয়। ঘর-দুয়ার লণ্ডভণ্ড ক'রে এই সব সরকারী কর্মচারীরা শরচ্চন্দ্রকে অযথা হয়রান করে। "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" পুস্তক 'উদ্বোধন' কর্তৃক প্রকাশিত হবার পর, যেহেতু বিপ্লবী সংস্থাগুলি ঐ পুস্তকের ভাবধারা গ্রহণ করতে থাকে, সেই হেতু শরচ্চন্দ্রের উপরে রাজরোষ পতিত হয়।

নিজ গ্রামের বাড়ীতে এসে শরচ্চন্দ্র ছোট মেয়ে শ্যামার বিবাহ দেন নিকটস্থ আচুরা গ্রামনিবাসী এক সদ্ ব্রাহ্মণের সন্তান যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এর পূর্বে, শরচ্চন্দ্র, জ্যেষ্ঠপুত্র জয়চন্দ্রের বিবাহ পূর্ববাংলার সাধক মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী যোগমায়ার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন।

১৯২৪ খৃঃ থেকে ১৯২৮ খৃঃ এই পাঁচ বৎসর কাল, শরচ্চন্দ্রের কর্মস্থল ছিল তৎকালে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পুরুলিয়া সহর। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সংসার আনন্দময়। পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) এই সময়ে শরৎ বাবুর বাড়ীতে দুই বার এসেছিলেন এবং দুই বারই মাসাধিকাল ঐ বাড়ীতে ছিলেন। একদিন মোক্ষদাদেবী পূজনীয় মহারাজের প্রিয় খাদ্য পোলাও রান্না করেছেন। শরচ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বিষ্ণুপদ তখন মারাত্মক রক্ত-আমাশয়ে ভুগছে। বাড়ীতে পোলাও রান্না দেখে ঐ শিশু ক্রমাগত বায়না করে চলেছে—'আমি পোলাও খাবো'। বাবা ও মা

ধমক দিচ্ছেন কিন্তু কান্না আর থামে না। অবশেষে মহারাজ বললেন, "শরৎ, তুই ওকে পেট ভরে পোলাও খেতে দে। দেখবি ও ভাল হয়ে যাবে।" সেদিনের মতো অতো পোলাও ঐ শিশু জীবনে খায়নি। আশ্চর্য!—তার পরদিনই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, এই কারণে ঔষধ আর খেতে হয়নি। সামান্য এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ মহাপুরুষেরা তাঁদের এই সরল হৃদয়, দীন ভক্তকে কতই না স্নেহ করতেন! তাঁদের অহেতুক কৃপা এই পরিবারের উপর কিভাবে বর্ষিত হতো!

স্থানীয় অনুরাগী ভক্তবৃন্দ প্রতি সন্ধ্যায় শরচ্চন্দ্রের গৃহে সমবেত হতেন। নিজ কর্তব্য সম্পন্ন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সাধু নাগমহাশয়ের কাহিনী কীর্তন করেই শরচ্চন্দ্রের জীবন অতিবাহিত হত। পুরুলিয়া থানার তৎকালীন দারোগা-সাহেবও এই নিয়মিত সান্ধ্য আলোচনাচক্রে উপস্থিত থাকতেন। মাঝে মাঝে এই সান্ধ্য আড্ডা শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ খোকা মহারাজের উপস্থিতিতে দিব্যভাব ধারণ ক'রত। শোনা যায় খোকা মহারাজ মোক্ষদাদেবীর হাতে-গড়া রুটি খেতে ভালবাসতেন।

এই সময়েই চারণকবি মুকুন্দ দাসের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। মুকুন্দ দাস শরচ্চন্দ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে এই চারণ-কবি প্রধানতঃ বাংলা বিহারের গ্রামে-গঞ্জে বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার ক'রে বেড়াতেন। গানের আসরে তিনি গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিধান ক'রে, পুরস্কারের পদক-বুকে ঝুলিয়ে, অতি সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে পরাধীন ভারতবাসীর মোহনিদ্রা দূর করতে চেষ্টা করতেন। স্বামীজীর মতই পোষাক পরে তিনি গানের আসরে অবতীর্ণ হতেন। জনসাধারণের উপর এই গায়কের প্রভাব সম্পর্কে ইংরেজ সরকার উদ্বিগ্ন ও ভীত ছিল। এ হেন মুকুন্দ দাস শরচ্চন্দ্রের রচিত ও সুরারোপিত শ্যামাসঙ্গীত

"কে ও রণরঙ্গিণী" উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে আসর মাত করেছেন। দেশে নারী-জাগরণের ডাক দিয়ে মুকুন্দ দাস তাঁর নিজ-রচিত শ্যামাসঙ্গীত 'জাগো গো, জাগো গো জননী' গানের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের শ্যামাসঙ্গীত মিলিয়ে দিতেন। এ সব কারণে শরচ্চন্দ্রের প্রতি রাজরোষ স্বাভাবিক ভাবেই বর্ষিত হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর পুরুলিয়ায় আগমন-কালে শরচ্চন্দ্র তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে শেষরাত্রে গোপনে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও নানা বাক্যালাপ করেন। শোনা যায় পুরুলিয়ার ও. সি. (দারোগা সাহেবও) নাকি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। সরকারী কর্মচারী হলেও দেশের অবিসংবাদী বরেণ্য নেতাদের এঁরা কখনও অশ্রদ্ধা করেননি। এ-সবই স্বামীজীর শিক্ষার ফলশ্রুতি।

পুরুলিয়ার 'সাহেব বাঁধের' চারদিকে তিন বালকপুত্র নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ করা শরচ্চন্দ্রের নিত্যকর্ম ছিল। সাংসারিক জীবনের আলোচনায় জানা যায়—তিনি পুত্রদের নিয়ে একঘরে শুতেন। শেষরাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের নাম ও গান করতেন, ছেলেরাও পিতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইত। তিনি ধর্মের গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। অথবা, এ বিষয়ে জোর করতেন না। কিন্তু ধর্মের বীজ এইভাবেই হয়তো সন্তানদের শিশু-মনের নরম জমিতে রোপণ ক'রে দিতেন। যদিও স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার আগে তিনি আচার-নিষ্ঠায় অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁকে কখনও ব'সে সন্ধ্যা-আহ্নিক বা পূজা করতে দেখা যায়নি। কর্মজীবনে বরং খানিকটা সাহেবী ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাল দিকটার তিনি প্রশংসা করতেন; তাই বলে তাঁর প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল, মনে করলে ভুল হবে*। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী করতেন বলে কোট-প্যাণ্ট ও টাই পরতেন। প্রচুর সিগারেট ও তামাক খেতেন। পুরুলিয়ায় থাকাকালে শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরুর অনুকরণে

* এই সময়ের রচনা "আদান প্রদান" দ্রষ্টব্য।

পরিচ্ছদ ধারণ করতেন। প্যাণ্টের উপর গলাবন্ধ কোট ও মাথায় পাগড়ী বেঁধে স্বামীজীর ভাবে অনুভাবিত হ'তে সর্ব্বদা চেষ্টা করতেন ও সংস্কৃত স্তবস্তুতি অনর্গল বলে যেতেন। অত ভোরে রোজই এই ঘটনা ঘ'টত বলে ছোট ছেলেরা ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে বাবার সঙ্গে ঐ স্তবস্তুতি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি ক'রে ভোরের আকাশে ছড়িয়ে দিত সেই স্তব গান। এই সময়ে শরচ্চন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবনের উপর 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী' রচনা ও প্রকাশ করেন। এতে শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর কাছ থেকে শোনা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাবিধি রয়েছে। তিনি শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মতো রামকৃষ্ণ-পূজাস্থলে ঐ পাঁচালী পাঠের নিয়ম প্রবর্তন করেন।

শরচ্চন্দ্রের কর্মজীবন শেষ হয় কটকের পোস্টমাস্টার রূপে। উড়িষ্যার রাজধানী কটকের প্রধান ডাকঘরের অধিকর্তারূপে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খৃঃ পর্যন্ত কাজ ক'রে শরচ্চন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। এই কয়েক বৎসর বক্সীবাজারে পোস্টমাস্টারের সরকারী বাসভবনে নিত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ হ'ত। বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মতো শরচ্চন্দ্রের সন্ধ্যাকালীন আলোচনা-চক্রে যোগ দিতেন, আর তিনিও আধ্যাত্মিক আলোচনায় তাঁদের আপ্যায়িত করতেন। কটকে থাকাকালে সেখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রদ্ধেয় জানকীনাথ বসু শরচ্চন্দ্রের নিকটে একাধিকবার এসেছেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে যোগদান করেছেন। সুভাষচন্দ্র তখন স্বদেশী নেতা, পরবর্তীকালে তিনি সর্বজনপ্রিয় 'নেতাজী'। শরচ্চন্দ্রের কটকে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর চিন্তায় ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বইখানি থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করতেন।

কটকে নানা ধর্মসভায় শরচ্চন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন ও বক্তৃতা ক'রে সবাইকে আনন্দ দান করেছেন। তাঁর ভাবনা নিজের ক্ষুদ্র চাকুরীর গণ্ডীর মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রত না। স্বামীজীর বিশাল

ব্যক্তিত্বের দিগন্তবিসারী, উদার বিস্তৃতির মধ্যে তার চিন্তা ভেসে বেড়াত। আর এই ভাবেই তিনি জীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে-ছিলেন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ও পারিবারিক বন্ধুত্ব হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি শরচ্চন্দ্রের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

চাকুরী ও ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকলেও সংসারজীবনে শরচ্চন্দ্র সাধারণ সংসারবদ্ধ জীবের মতই সাংসারিক খুঁটিনাটির খেয়াল রাখতেন। পারিবারিক সব বিষয়ে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। মোক্ষদা-দেবীও তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কোন কিছু করতে পারতেন না। তিনি যেমন কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তেমনই ছিলেন স্নেহশীল। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন নিতেন ও উৎসাহ দিতেন। পরীক্ষায় ভাল ফল করলে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মিষ্টি বিতরণ করতেন। বিষ্ণুপদ ও শিবপদর পরীক্ষায় সাফল্যে তিনি উল্লসিত হতেন এবং রহস্য ক'রে একজনকে 'কুলতিলক' ও অপরজনকে 'কুলগৌরব' বলতেন। তখনকার দিনে কন্যাদেরও প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়েছিল ইংরেজী মিশনরী স্কুলে। সংসারজীবনে সাধারণ সংসারীর মত আচরণের আড়ালে কোথাও তাঁর লুকোনো নির্লিপ্ততা ছিল। কোন বিষয়ে তাঁর আসক্তি ছিল না। কন্যাদের বিবাহের পর কখন কখন তাদের দেখার জন্য ব্যাকুল হতেন, চিঠি লিখতেন, কিন্তু তারা এলে পর তাঁর আর কোন উদ্বেগ থাকত না। কখনও তাদের বিদায়কালে অথবা অন্য সময়ে তাঁর চোখে জল দেখা যায় নি; অথচ শ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা বলতে চোখের জলে বুক ভাসাতেন। শ্রীগুরুর আদেশ—'সংসারে পাঁকালে মাছের মত থাকবি'—এটি ছিল তাঁর সাংসারিক জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

পাশ্চাত্য দেশ থেকে স্বামীজী পাঁচখানি শ্বেতমর্মরের পট ভূমিকায় বসানো শ্রীরামকৃষ্ণের এক জীবন্ত আলেখ্য এনেছিলেন। তার একখানি তিনি তাঁর স্নেহের 'বাঙাল'কে উপহার দেন। বিশেষ

পূজা-পার্বণের দিনে ঐ মর্মর আলেখ্য ভক্তিভরে বেদীতে স্থাপন ক'রে, ভোগরাগ সহকারে পূজিত হ'ত শরচ্চন্দ্রের বাসভবনে।

নিতান্তই ইহলৌকিক চাকুরী ও পদোন্নতির জন্য তিনি একেবারেই লালায়িত ছিলেন না। রাজরোষে যে উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা তিনি গ্রাহ্যও করেন নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবে ভাবিত মানুষ আর অন্য কোন লোকের বাসিন্দা হবেন!

শেষ জীবন

১৯৩৩ খৃঃ চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে শরচ্চন্দ্র ১৯৫৮ খৃঃ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাসাবাড়ীতে (১৫/১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, বর্তমানে সূর্য সেন ষ্ট্রীট) বসবাস করেন। সরকার থেকে সামান্য অবসরভাতা পেতেন। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি দেশের বাড়ী ফরিদপুরের কোটাপাড়া গ্রামেও সপরিবারে কাটিয়েছেন। এই সময় বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। অবসর নেবার পর ধূমপান একেবারেই ত্যাগ করেন; মাঝে মধ্যে নস্য ব্যবহার করতেন। এই সময় থেকে চোখেও কম দেখতে থাকেন। জীবনসায়াহ্নেও শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের নিয়মিত সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হ'তে চাইতেন না বলেই হয়তো কলকাতার বাসাবাড়ীতে থাকাই পছন্দ করতেন। তবু দেশের বাড়ীর পূর্ণ সংস্কার সাধন ক'রে, নূতন পুকুর কাটিয়ে, অন্যান্য শরিকদের মধ্যে সর্বোত্তম বসতবাটি নির্মাণ করেন। কলকাতার বাসাবাড়ীতে থাকাকালে মাঝে মধ্যে বেলুড়মঠেও রাত্রি যাপন করতেন। ক্রমশঃ বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখী হ'য়ে শরচ্চন্দ্র জপের মধ্য দিয়ে আত্মসাক্ষাৎকারে ব্রতী হন। অখণ্ড অবসরে স্বামীজীর পূর্ব আদেশ মত ব্রহ্মসূত্রের টীকা "বিবেকভাষ্য" লিখতে আরম্ভ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক ঐ পাণ্ডুলিপি সংশোধিত হয়। ফুলস্‌কেপ কাগজের সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সাত খণ্ডে সমাপ্ত এই পাণ্ডুলিপি শরচ্চন্দ্রের দেহ-

ত্যাগের পর কীটদষ্ট অবস্থায় কুরাশী গ্রামে দেশের বাড়ীতে পাওয়া যায়; পরে তা 'উদ্বোধন' অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়।* স্বামী সারদানন্দজীর ইচ্ছানুক্রমে রচিত, অসমাপ্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ-শতনাম" পুস্তিকাটি সমাপ্ত করবার কাজও এই সময় আরম্ভ হয়। শরচ্চন্দ্র তাঁর বড় নাতি রঘুবীরের নামে এই পুস্তিকা ছাপিয়ে ৺কাশী সেবাশ্রমে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বেলুড় মঠের মতো ৺কাশী-সেবাশ্রমের সঙ্গেও শরচ্চন্দ্রের নাড়ীর যোগ ছিল। এর কারণ হ'ল নিজ মাতার ৺কাশীবাস উপলক্ষে শরচ্চন্দ্র সপরিবারে নিয়মিত কাশী যেতেন।

ইতিপূর্বে শরচ্চন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীনতম মহাভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের পুণ্য জীবনালেখ্য অবলম্বনে 'সাধু নাগমহাশয়' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। শরচ্চন্দ্রই প্রথম এই পবিত্র জীবনালেখ্য জনতাসমক্ষে পরিবেশন করেন। আজ পর্যন্ত ঐ গ্রন্থ ও 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র নানা সংস্করণ 'উদ্বোধন' হ'তে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। শরচ্চন্দ্র এই গ্রন্থদ্বয়ের সর্বস্বত্ব বেলুড় মঠে দান করেছেন। শোনা যায় যে তৎকালীন বেলুড়মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শরচ্চন্দ্রের এই জনপ্রিয় গ্রন্থদ্বয়ের লভ্যাংশের কিছুটা শরচ্চন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতে চান। শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরুর সমাধি-মন্দির নির্মাণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দির নির্মাণ করবার ব্যয়ভারের কিছুটা এই পুস্তকবিক্রয়ের লভ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছিল। সাধু নাগমহাশয়ের পূত জীবনের সান্নিধ্যই শরচ্চন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনের প্রবেশ দ্বার ছিল। স্বভাবতই শরচ্চন্দ্র ওই মহাপুরুষের আচরণাদি থেকে পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। নাগ মহাশয়ের জীবনী গ্রন্থ শরচ্চন্দ্রের হৃদয়োৎসারিত শ্রদ্ধার্ঘ।

জীবনের অন্তিম চার বছর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট

* 'বিবেকভাষ্যের' ভূমিকা—"বেদান্তে কাহার অধিকার", তৎকালীন 'উদ্বোধনের' সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দজীর প্রচেষ্টায় শরচ্চন্দ্রের দেহাবসানের অনেক পরে ১৩৬৪ সালে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মাস পর্যন্ত শরচ্চন্দ্র মাঝে মাঝে কলকাতায়, বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) ও বেশীর ভাগ সময় দেশের নিজস্ব সুসংস্কৃত বাড়ীতে কাটিয়েছেন। দেশে সাধুভক্তের ভিড় লেগেই থাকত, আর তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কথাই শরচ্চন্দ্রের অবিরত হ'ত। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্রের সাধু ও সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা উল্লেখযোগ্য। বাড়ীতে সাধু এলে সেদিন আর অন্য কোন সাংসারিক কাজে মন দিতেন না, এমন কি পুত্রকন্যাদের কার্যোপলক্ষে যাত্রাও স্থগিত থাকত। বেলুড় মঠের সাধুদের তিনি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন। যুবক সাধু, এমনকি ব্রহ্মচারীদেরও তিনি তাঁর পদধূলি নিতে দিতেন না। স্বামীজীর ভাষায়, সূর্য ও জোনাকিতে যে পার্থক্য, ক্ষুদ্র জলাশয় ও সাগরে যে পার্থক্য, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে সেই তুলনা বিচার ক'রে তাঁদের নিরস্ত করতেন—এমনই ছিল তাঁর দীনতা ও মহত্ত্ব। ১৯৪১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বোমা পড়ে। শরচ্চন্দ্রের বড় ছেলেরা কিছুটা সন্ত্রস্ত হ'য়ে শরচ্চন্দ্রকে সপরিবারে বহরমপুরে, চতুর্থ পুত্রের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে রাজী করায়। শরচ্চন্দ্রের অন্তর্মুখী অবস্থা এ-সময় যাঁরা দেখেছেন, তাদের মনে একটা চিরস্থায়ী ছাপ র'য়ে গেছে। শ্রীগুরুর উপহার—মর্মরফলকে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রতিকৃতির সঙ্গেই তাঁর অধিক সময় ব্যয়িত হ'ত। তাঁকেই নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, মান-অভিমান করছেন, আবার কখনও আনন্দে বিভোর হ'য়ে ইষ্টের সঙ্গে এক হ'য়ে আছেন। ভক্ত অতিথিদের আপ্যায়নের কথা তখন আর খেয়ালে থাকত না; যাতে এই অপূর্বভাব নষ্ট না হয়, তাঁরাও সেই চেষ্টায় দূর থেকে বৃদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে চলে যেতেন। ভক্তিতে, ভাবে, প্রেমে, ভালবাসায় মাখামাখি হ'য়ে ইষ্টসান্নিধ্যে মগ্ন বৃদ্ধের দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত।

প্রায় ছয়মাস বহরমপুরে থেকে শরচ্চন্দ্র সপরিবারে কোটাপাড়া কাশ্যপবাড়ীতে নিজ গ্রামে ফিরে যান, আর সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

এর কিছু আগেই ছোট ভাই রমেশচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে পারিবারিক বিগ্রহ ৺কাত্যায়নীর শ্রীমন্দির নির্মিত হয়। অন্যান্য বসবাসের ঘরগুলি টিনের হলেও ৺কাত্যায়নী-মন্দিরটি ছিল ইষ্টকনির্মিত। বাড়ীর মণ্ডপে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হ'ত। সব শরিকের সাহায্য এই সব যৌথ কাজে পাওয়া যেত। নাটমন্দিরে যাত্রা-গান, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'ত এবং শরচ্চন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন গ্রামের মধ্যে কাশ্যপবাড়িই ছিল প্রধান। দোল-উৎসব, শনি-সত্যনারায়ণের সেবাও নিয়মিতভাবে হ'ত। শরচ্চন্দ্র তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীদের নিয়ে এ সব অনুষ্ঠানে সর্বদাই যোগ দিতেন।

শরচ্চন্দ্র সুরসিক, সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। প্রতিদিনের প্রাতরাশ নাতি-নাতনীদের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। নাতি-নাতনীদের নিয়ে মজার মজার ছড়া বেঁধে সুর ক'রে গেয়ে খুব আনন্দ করতেন। দু-একটি উদাহরণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না! পুত্রদের লক্ষ্য করে বলতেন,

"ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙলো নবদ্বীপ।"

রাত্রির প্রতি প্রহরে শিশুদের শয়নভঙ্গিমা বর্ণনা করে বলতেন,—

"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার।
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার॥
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী॥
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটলী॥"

এ সব কবিতা যে তিনি কোথায় পেতেন, তা তিনিই জানেন। কত বাংলা ও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা যে ছেলেদের শিখিয়েছেন, তার লেখা-জোখা নেই। কবিতায় ও স্তবস্তুতিতে "ইন্দু" ছদ্ম নাম ব্যবহার করতেন।* 'মূর্তমহেশ্বর' স্তবের শেষে লিখেছেন—"বালচন্দ্রধরমিন্দু-বন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্"। যোগসাধন বর্ণনার শেষে

* নিজের নামের শরচ্চন্দ্রের 'চন্দ্রের' বদলে 'ইন্দু' নাম ব্যবহার করতেন।

পঙ্‌ক্তিতেও ইন্দু ; "মজ্জিতমিন্দুমানন্দসার্ণবে দ্বন্দ্বতরঙ্গ বিলুপ্ত" ; শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালীর পঞ্চম পর্বের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি—

"স্বামিপদ শতদলে মধুব্রত প্রায়।
লাচাড়ী প্রবন্ধে ইন্দু প্রভু গীতি গায়॥"

শরচ্চন্দ্র অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে ও নাতি-নাতনীদের জন্মদিনে অন্ততঃ একটি জীয়ন্ত মাছ নিয়মিতভাবে পুকুরে ছেড়ে দিতেন। নিজে নানারূপ সোপকরণ, অন্ন-পলান্ন খেতে ও অপরকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। বর্ষার দিনে ভুনিখিচুড়ি ও ইলিশমাছ অত্যন্ত পছন্দ করতেন। শোনা যায় যে গব্যঘৃতে সুপক্ক এই ভুনিখিচুড়ি রান্না তিনি নিজ গুরুর কাছে শিখেছিলেন। লুচি মোহনভোগ ছাড়া তাঁর প্রাতরাশ হ'ত না ; স্বামীজীর নির্দেশে তিনি খেয়ে ও খাইয়ে গেছেন—'দুখ চেটে গেরস্ত' হননি। তাঁর খাওয়ার পরিমাণ অল্প ছিল, কিন্তু রকমারি রান্না পছন্দ করতেন।

দেশের বাড়ীতে থাকার সময় স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহধন্য শরচ্চন্দ্রের নাম বহুদূর বিস্তৃত ছিল। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে উৎসবাদি ও সভাসমিতি থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসত। ৺ঠাকুর-স্বামীজীর কথা প্রচার করার সুযোগ তিনি কখনও হারাতেন না। কোন আহ্বানকেই উপেক্ষা করতেন না। শেষ বয়সে শরচ্চন্দ্র হাঁপানি-রোগে আক্রান্ত হন। একটা বালিশ কোলে ক'রে বিছানায় বসে বসে কখনও বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। কিন্তু এর মধ্যেও গুরুমন্ত্র জপযজ্ঞ অব্যাহত থাকত ! তাঁর সারাদিনের আচরণই ছিল নিবেদিতপ্রাণ ভক্তের পূজানুষ্ঠান। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কথা মানুষকে শোনাবার সুযোগ পেয়ে, অদম্য উৎসাহে হাঁপানি-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ সব বাধা অতিক্রম ক'রে নৌকায়, পদব্রজে পথহীন প্রান্তর পরিক্রমা ক'রে যেতেন। এই সময়ে স্বামীজীর অনুকরণে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, মাথায় সিল্কের পাগড়ী বেঁধে ঋজুভাবে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ, সভাসমিতিতে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন—

"হাট ভেঙে গেলে কিন্তু কাঁদিয়া জনম যাবে।
কান্দিছে যেমন লোক স্মরি রামকৃষ্ণ এবে॥
গাও রামকৃষ্ণ নাম।
ভাব তায় অবিরাম॥
পূর্ণ ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ ইথে না সন্দেহ কর।
শান্তি পাবে, প্রাণ পাবে, 'বাঙালের বাক্য ধর'॥"

এইভাবে যুবকবৃন্দের মন সচকিত করতেন। "মূর্ত্ত মহেশ্বর", "তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম", প্রভৃতি স্বরচিত গান গেয়ে শ্রোতাদের তৃপ্তি সাধন করতেন। এই সব সভাসমিতিতে যখন ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আগ্রহ সহকারে বলতেন. তখন যেন তাঁর ওপর শ্রীগুরুর 'ভর' হ'ত। কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত তাঁর প্রচণ্ড হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট! ঐ অসুস্থ শরীরেও তাঁর এই সময় কখনো বাক্যস্খলন হ'ত না!

জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত জানতে পেরে শরচ্চন্দ্র প্রাণপ্রিয় গুরুভাই কালীকৃষ্ণ মহারাজের শুভেচ্ছা প্রার্থনা ক'রে চিঠি লেখেন। স্বামী বিরজানন্দ অবিলম্বে সহানুভূতি জানিয়ে উত্তর দেন। পত্রের শেষে শ্রীগুরুর জয়ধ্বনি দিয়ে শেষ বারের মত তাঁর হৃদয়ে, উৎসাহ আনন্দ ও ভরসা জাগাতে যত্নবান হন। পত্রের শেষে ছিল,...... "জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় স্বামীজীর জয়! প্রতি নিঃশ্বাসে বল। কিসের ভয়, কিসের ভাবনা! তুমি যে বৈদান্তিক, তোমার আবার রোগ কি, শরীর কি! তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা! ওয়া গুরুজী ফতে।" দীনভক্ত শরচ্চন্দ্রের বিয়োগে গুরু ভাইরা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন।

হাঁপানির টানের ওপর নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হ'য়ে ১৯৪২ খৃঃ ২৩শে আগস্ট শনিবার প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে শরচ্চন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছোট ছেলে ও জামাইকে উদ্দেশ করে শরচ্চন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বলে

উঠেন—"ওরে, ধূপধুনো দে, ধূপধুনো দে, স্বামীজী এসেছেন।" পরিবারের তখন কারো বুঝতে আর বাকী নেই যে পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারা ধূপধুনো জ্বালিয়ে দিলে ঘরে অপূর্ব পবিত্রভাবের পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এর পর আবার অসহিষ্ণু শরচ্চন্দ্র উত্তেজনায় প্রায় উঠে বসেন—"ঠাকুর এসেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন,—যতীন, ঝড়ু, তোমরা ক'রছ কি? তাঁকে বসতে দাও?" তারা সাদা চোখে কিছু দেখতে না পেয়ে, 'কে, কোথায়?' জিজ্ঞেস করায় বিরক্ত, ব্যথিত শরচ্চন্দ্র বলেন,—"এই তো, সামনে দাঁড়িয়ে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?" · "তোমরা বসতে দিলে না—উনি চলে গেলেন।"··· এরপর, একে একে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের দর্শন ও প্রণামের পালা চলতে লাগল। এইভাবে ক্রমশঃ রাত শেষ হ'য়ে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

পরদিন সকালে, বাবা ভাল আছেন জেনে জয়চন্দ্র কর্মস্থলে ফিরে যাবে। স্নানাহার সেরে পিতাকে প্রণাম করতে এসে অবাক! যিনি আজ এক মাস যাবৎ প্রচণ্ড অসুস্থ, বালিশ কোলে ক'রে অতিকষ্টে বিনিদ্র অবস্থায় রাতদিন কাটাচ্ছেন, আজ তিনি নিজের ঘরের দাওয়ায় বিছানা পেতে সটান শুয়ে আছেন,—পরম আনন্দের ছটা চোখে মুখে, শরীরে রোগ-ক্লেশের চিহ্ন মাত্র নেই। বুদ্ধিমান্ জয়চন্দ্র যাত্রা স্থগিত রাখল। বুঝল, আজই শেষ রাত! প্রদীপ নেভার আগে শেষ বারের মত উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ওঠে। সেদিন সারাদিন শরচ্চন্দ্র আর নিজের বশে ছিলেন না—তাঁর নিজেরই খেয়াল ছিল না তাঁর এ সব আচরণ কত অলৌকিক! সারাদিনই ইষ্টের সঙ্গে এক হ'য়ে ঘোরের মধ্যে তাঁর সময় কাটতে থাকে। অবশেষে সন্ধ্যার পর থেকে, সকলের মুখের ওপর তাঁর ইষ্টদেবতার মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সব মহাপুরুষদের জীবনেই এই দৃশ্য অতিপরিচিত। ভক্তের

আন্তরিক ব্যাকুলতায় ভগবান স্বয়ং এসে দাঁড়ান—তাকে হাত ধরে পরমধামে নিয়ে যাবার জন্য।

এই হ'ল ১৯৪২ খৃঃ আগস্ট মাসের ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ৯ই আগস্টের "ভারত ছাড়" আন্দোলন, তখন গর্জে উঠেছে। ধনী-দরিদ্র সবাই সন্ত্রস্ত। নিজের অন্নকষ্ট যাতে না হয়, তার চেষ্টায় সবাই যত্নবান। মাসখানেক আগেই কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শরচ্চন্দ্র সঞ্চিত অর্থব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে চাল-ডাল কিনে রেখেছিলেন। কে জানত এই তাঁর ছলনা কি না! কে জানত, তাঁর নিজেরই অন্তিম সংস্কারের কারণে গরীব, দুঃখী, কাঙালী পেট ভরে দুটি খেতে পাবে—এই আনন্দে ভাণ্ডার ভ'রে রেখে গিয়েছিলেন কি না!

শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি ও রচনাবলীর মুখবন্ধ

শরচ্চন্দ্রের রচনাসম্ভার ও তাঁর সাহিত্য-প্রীতি সম্পর্কে দু-চার কথা নিবেদন করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে শরচ্চন্দ্র অল্প বয়সেই "শরৎ-কবি" আখ্যা লাভ করেন এবং ঐ অপরিণত বয়সেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতিবৎসর তিনি সংস্কৃতে একটি স্তোত্র রচনা করতেন। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা সেগুলির যথেষ্ট সমাদর করতেন বলে প্রমাণ রয়েছে। চাকুরীজীবনে নানা সহরে পরিভ্রমণ-কালে শরচ্চন্দ্র বহু স্তোত্র, কবিতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এগুলি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন অবলম্বনে নাতিদীর্ঘ "শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী" পুরুলিয়ায় থাকাকালে তিনি রচনা করেন। এই পাঁচালীর উদার ওজস্বিনী ভাষার এমন আকর্ষণ যে কয়েকবার পাঠ করলে এর প্রধান অংশগুলি স্মৃতির মণিকোঠাতে সঞ্চিত হয়ে যায়। ভাব, ভক্তি ও অনুরাগের বন্যা ব'য়ে গেছে পাঁচালীর ছত্রে ছত্রে। সহৃদয়

পাঠকগণ এই পাঁচালী ও শরচ্চন্দ্রের রচিত অন্যান্য কবিতার মধ্যে ধর্মভাবের সমান্তরাল প্রকৃত রসোদ্দীপন লাভ ক'রে আনন্দিত হবেন। শরেচ্চন্দ্রের সমগ্র রচনাসম্ভার কিছু কম নয়। এই পুস্তকে তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলিকে একত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর রচিত স্তব-স্তুতিগুলির মধ্যে ধর্মভাবের প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। তবু এদের মধ্যে ফল্গুধারার মতো সৌন্দর্য বা রসসৃষ্টির স্রোত ব'য়ে গেছে। উৎসাহী পাঠকমাত্রেই এখানে শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর পাবেন।

কথায় বলে শোক থেকে শ্লোকের উৎপত্তি। নিষাদ-কর্তৃক ক্রৌঞ্চপাখি বাণবিদ্ধ হ'লে তার সহচরীর আর্তনাদে আদিকবির অন্তর শোকে উদ্বেল হ'ল, আর সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জন্ম নিল প্রথম শ্লোক, "মা নিষাদ ....." ইত্যাদি। গুরুবিয়োগের অব্যবহিত পরে শরচ্চন্দ্রের শোকাহত অন্তর থেকে জন্ম নিয়েছে 'পূর্বস্মৃতি', 'স্বামিপাদ', 'স্বামীজীর প্রতি' প্রভৃতি কবিতা, যেগুলির মধ্যে তাঁর গুরুবিরহের উদ্বেলিত বেদনা উৎসারিত হ'য়ে গেছে। এ সব কবিতার ছত্রে ছত্রে যে করুণরস ব্যঞ্জিত হয়েছে, তার সাহিত্যমূল্য এখনও সহৃদয় পাঠককে মুগ্ধ করে। শরচ্চন্দ্রের বুকফাটা কাতরোক্তি ও সংসারের প্রতি অনাসক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

"যথায় গিয়েছ প্রভো! নিয়ে যাও মো সবায়।"

অথবা

"যাইব তথায় তোমা একবার দেখিবারে
কিছু না কহিব কথা—শুধু পদ স্পর্শিবারে।
সে ফুল্ল কমল আঁখি, শুধু একবার দেখি,
ধেয়ানে থাকিব মগ্ন না ফিরিব ভবে আর
করুণা করহ প্রভো! ওহে ভব কর্ণধার।"—স্বামীজীর প্রতি

শরচ্চন্দ্রের এই সময়কার রচনা অনাহত বেদনাবিধুর আর করুণরসে আপ্লুত, প্রকৃত কাব্য রসাত্মক বাক্য দিয়েই গঠিত হয়।

শরচ্চন্দ্রের এই অবস্থাতে কখনো তাঁর রচনা শ্রীগুরুর কৃপা, স্নেহ, ভালবাসার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল—

"কত মতে এ দীনের পক্ষ সমর্থন—
করিতে, স্মরিলে হয় হৃদি বিদারণ ;
বাঙাল সন্তানে লয়ে   আহ্লাদে মগন হয়ে
কত কি বলিতে স্নেহ-প্রবণ হৃদয়"   —পূর্বস্মৃতি

আবার কখন বা হৃদয় অভিমানে জর্জ্জরিত ঃ

"কেন বা থাকিবে তুমি নশ্বর জগতীতলে ?
কে বুঝিল বঙ্গদেশে, যেথায় জনম নিলে ?"—স্বামীজীর প্রতি

আবার দেখা যায়—যখনই গুরুর কৃপায় স্বপ্নঘোর কেটে গেছে, সংশয়গ্রন্থি হয়েছে ছিন্ন, তখনই আবার আশা-আনন্দের গান গেয়ে উঠেছে তাঁর লেখনী—

"ভাবিলে দর্শন পাই
কেমনে বলিব তাই
গুরু মোর নাহি ভবে ? মিথ্যা উক্তি অসংশয় ।
বিবেক-আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয় ॥"   —পূর্বস্মৃতি

শরচ্চন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। কালিদাস, ভবভূতির অধিকাংশ সুন্দর রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এ-সব কাব্যে ব্যঞ্জিত রস বা সৌন্দর্য তাঁকে এতই অভিভূত করেছিল যে তাঁর নিজের রচনাতে এঁদের প্রভাব না পড়ে পারেনি। নানা দেব-দেবীর প্রণামমন্ত্রে "দেবী সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে" প্রভৃতি গঙ্গাস্তব, "দিন যামিন্যো সায়ং প্রাতঃ" প্রভৃতি আভাস পাওয়া যায়। শরচ্চন্দ্র তাঁর গম্ভীর, উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত স্তব-স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। কালিদাসের "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী"। "গ্রীবাভঙ্গাভিরাম," "ন যযৌ ন তস্থৌ" ; অথবা ভট্টিকাব্যের শরৎবর্ণনা "দত্তাবধানং মধুলিহগীতৌ" ইত্যাদির বর্ণনা অবিস্মরণীয়। শরচ্চন্দ্র "স্বামিপাদ" কবিতাতে তাঁর

গুরু-বিয়োগের বেদনা ও হাহাকারের মধ্যেও কালিদাসকে ভুলতে পারেন নি ঃ—

"রামকৃষ্ণ সংঘমঠে আশ্রম যত যথায়
তব প্রেমে বদ্ধ ছিল সূত্রে মণিগণ প্রায়
... ...
এ দীন নয়ননীরে রচিল প্রয়াণ-গীতি
আশীষ অন্তিমে পাই রামকৃষ্ণলোকে স্থিতি"—স্বামিপাদ

এখানে "সূত্রে মণিগণ প্রায়" কি "রঘু-বংশম্" কে স্মরণ করায় না ?

তাই মনে হয়, শরচ্চন্দ্র যে স্তব-স্তুতি তাঁর সন্তানদের মুখস্থ করাতেন তার মূলে হয়তো ধর্মভাবের থেকে ওগুলির সাহিত্যমূল্য বেশী। এদের ধ্বনি ও ভাবের রমণীয়তাই তাঁকে বেশী আকর্ষণ ক'রত বলে মনে হয়। একথা স্বীকার করতেই হয় যে শিশুকালে ধর্মভাবের থেকে নান্দনিক মুগ্ধতাই বেশী আকর্ষণ করে। কলিংউড্ শৈশবাবস্থাকে "আত্মার রাত্রি" (The Night of the Soul) বলেছেন, যা কিনা কল্পনার পাখায় স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত। এ অবস্থায় যুক্তিবিচার গৌণ, কাব্যের আনন্দই মুখ্য। তাই বোধ হয়, শরচ্চন্দ্র শিশুপুত্র-কন্যাদের কবিতা পড়াতেন ও গান শোনাতেন।

শরচ্চন্দ্রের কাব্য-রচনার মধ্যে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে, শব্দের অনুপ্রাস আর নানাপ্রকার বাগ্ভঙ্গিমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়। জয়দেবের আকর্ষণ তাঁর কাছে প্রবল ছিল। অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্যের অমর কবিগণ তাঁকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। ভক্তকবি রজনীকান্তের প্রভাবও কিছু কম নয়। শরচ্চন্দ্রের "কে ও রণরঙ্গিণী" গানের সুর কান্তকবির "কেরে হৃদয়ে জাগে......" মনে করিয়ে দেয়। এ সব কথা বোঝাতে শরচ্চন্দ্রের কাব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিলে হয়তো আপত্তি হবে না। বহুকাল গত হওয়ায়, লুপ্ত স্মৃতিবশতঃ উদাহরণগুলিতে কিছু ফাঁক থাকতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় শরচ্চন্দ্র লিখছেন—

"গোপী মনোরঞ্জন অঞ্জন-গঞ্জন আঁখিযুগখঞ্জন মঞ্জীর বাজে পায়···

পিহিত পীতাম্বরে, নবীন মেঘাম্বরে
দীপ্ত কামিনীকরে, লিপ্ত শ্যামলকায়
কক্ষে কামকলা, বক্ষসি বনমালা
বলিত বলাহকে বলাকা বলির প্রায়।

অথবা কালীরূপ বর্ণনায়—

"কে ও রণরঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী নাচিছে উলঙ্গিনী
আসব আবেশ হায়।
কুন্তল-দল-দল চুম্বে চরণতল মধুব্রত চঞ্চল
ঝঙ্কারে পায় পায়"

আবার—

"কালী করালিনী কলুষবিনাশিনী
কৃতান্ত-কৃন্তিনী কাশি কেশললনা।
করবাল করে ধৃতা কপালী কল্পলতা
কাঞ্চি করকলিতা কামপাশ কল্পনা॥

* * * * *

কিংশুকজিত নাসা কৌলপরায়ণা।
কদলীদলজঘনা কুমারী কৃতপূজনা
কিঙ্করে কৃপাকণা করয়তু কামনা॥"

এ সব রচনার মধ্যে, শ্রীজয়দেবের—(গীতগোবিন্দের)

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিলকুজিত কুঞ্জকুটিরে।"

সাক্ষাৎ উপস্থিতি দেখা যায়।

আবার—

"উজ্জ্বল নীল কাদম্বিনী কুন্তল-লুণ্ঠন বহুশোভমন্তং
লম্বিত নরশিরঃ কণ্ঠমালমহো করধৃতখরকরবালং।

চঞ্চলাপাঙ্গতরঙ্গ বিরঙ্গিতানঙ্গদহন হৃদিলীনং
নবজলদহ্যুতি কোটিল সত্তনুমিন্দু কমলদলভান্তম্ ॥"

এত অনুপ্রাসের ছড়াছড়িতেও কিন্তু কোথাও রসভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হয় না।

শরচ্চন্দ্র-রচিত পাঁচালীতে শ্রীশ্রীকালীর যে রূপ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়, তা একান্তই নায়িকা-বর্ণনা বা নারীদেহের সৌন্দর্য-বর্ণনা—

"ঝটিতি দেবী-মূরতি প্রকাশিল কিবা।
কোটিভানু জিনি তনু মহা মেঘপ্রভা ॥
চিকণ-চিকুর চারু চরণ-চুম্বিতা।
ভক্তসদ্ম পাদপদ্ম ভ্রমর গুঞ্জিতা ॥
জঙ্ঘা সরু গুরু-উরু নিতম্বনিবিড়।
নাভিমূলে শতদলে কামের কুটির ॥
ত্রিবলী সোপানাবলী অতিক্রম করি।
ধীরগতি রতিপতি আক্রমিছে গিরি ॥

*   *   *   *

চারু-সরু যুগ্মভুরু ছলে ধনুপাতি।
পঞ্চবান্ খরশান্ হানে রতিপতি ॥ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ সব স্থলে দেবীমাহাত্ম্য গৌণ, সাহিত্যের মূল উপাদান নায়িকা-বর্ণনাই প্রধান। শাস্ত্রে বলে যে, সাহিত্য রসের আস্বাদনও "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর" এবং রসোত্তীর্ণ কবিতাও দিব্যভাব জাগ্রত করতে পারে। কালিদাস তাঁর "কুমারসম্ভবে" নিজ আরাধ্যা দেবী পার্বতীর রূপবর্ণনায় দেবীর পাদপদ্ম বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত সেই শ্লোকগুলি দেহসৌন্দর্য বর্ণনাতেই পর্যবসিত। ঠিক এই ব্যাপারই দেখা যায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের রচনায়। তাই বলতে হয় যে শরচ্চন্দ্রের কাব্যের সাহিত্য-মূল্য সমধিক।

উপরোক্ত কাব্যকলা ছাড়াও শরচ্চন্দ্রের বহু প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ খৃঃ সময়ের মধ্যে

চাকুরীর বদলীর কারণে শরচ্চন্দ্র স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাঁর লেখনীও পাশাপাশি সজীবভাবে আপনার সুধা বর্ষণ করে চলে। এই পুস্তকে পুনঃপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি শরচ্চন্দ্রের গভীর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলির সাহিত্যমূল্য কাব্যের তুলনায় অনেক কম। সহৃদয় রসিক পুরুষের সঙ্গে বিদগ্ধ পণ্ডিতের যেন একটা বিরোধ থাকে। প্রথম জন আনন্দরসবেত্তা, পরের জন সত্য জ্ঞানযোগী। প্রবন্ধগুলি জ্ঞান ও তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়াতে সুরসাল নয়; তবু যদি উপনিষদকে কাব্য বলা যায়, শরচ্চন্দ্রের প্রবন্ধগুলিও সাহিত্য সংজ্ঞা লাভ করতে পারে।

উপরোক্ত সময়ের পূর্বে ও পরে প্রকাশিত প্রবন্ধ যথাক্রমে, 'আশ্চর্য্য সমন্বয়,' 'দুটি বন্ধু', গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী' ইত্যাদি। 'আশ্চর্য্য সমন্বয়ে' জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ আলোচনা করা হয়েছে, যা লেখকের ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন বলে মনে হয়। শিল্প যদি শিল্পীর মনের প্রতিচ্ছবি না হ'ত তা'হলে কোন সৃষ্টিই সার্থক হতে পারত না। এই সময়ে শরচ্চন্দ্রের জ্ঞানের গভীরতা ও ভক্তির আকুলতা পাশাপাশি উজ্জীবিত হয়ে তাঁর জীবনকে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। "দুইটি বন্ধুতে" বিবেকানন্দের আদর্শের—নিষ্কাম কর্ম ও ব্যক্তিজীবনে তার প্রতিফলনের ঝলক দেখতে পাই। নাটিকা "গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিতে" আদর্শচ্যুত সন্ন্যাসী অপেক্ষা যথার্থ গৃহী যে অনেক উচ্চমার্গের এবং সংসারের থেকেও যে ভগবান লাভ সম্ভব, এসব কথা যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদন করেছেন। সাধারণ গৃহী ভক্তেরা এসব থেকে প্রচুর উৎসাহ পাবেন। নিজ গুরুর উদার, স্বাধীন, স্বচ্ছ ভাবধারার শতমুখী বিশ্লেষণ "পাপ ও পুণ্য"তে পাওয়া যাবে। স্বামীজীর জীবদ্দশায় তাঁর উক্তির এমন প্রাণস্পর্শী বিশ্লেষণ অত্যন্ত দুর্লভ।

শরচ্চন্দ্রের ভাব-জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে গুরু-বিয়োগের পরে—বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশোর্ধে। শ্রীগুরুর সান্নিধ্য, সেবা ও উপদেশের ফল তাঁর পরবর্তী জীবনকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ক'রে সৌন্দর্য ও সৌরভে

ভরে দেয়। শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যাকুলতা ও পরিনিষ্ঠিত সাধন মিলিত হয়ে অতি অল্প সময়ে তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছিবার পথ পান। এই সময়ের রচিত প্রবন্ধে—"আমার কথায়"—বারংবার দেখা যায় যে সদ্‌গুরুর কৃপাবলে সাধনার উচ্চ অবস্থাতে অনায়াসে পৌঁছান সম্ভব। এই সময় শরচ্চন্দ্রের আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থার তীব্রতা এত প্রবল ছিল যে কোথা দিয়ে যে দিনরাত্রি চলে যেত তা' তিনি টের পেতেন না। স্বভাবতঃই তিনি নিজ অনুভূতি প্রচারের বিরুদ্ধে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে রাতের নিরিবিলিতে হঠাৎ হঠাৎ তাঁর লেখনী বাচাল হ'ত। তখন নিজের অজান্তে অন্তরের ভাববন্যা প্রেমের ধারায় শতধা বইত। শ্রীগুরুর কথা লিখতে লিখতে কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়, উন্মত্ততায় বলে উঠতেন—"হইতে পারি আমি উন্মত্ত—হইতে পারি আমি বাচাল—হইতে পারি আমি যা তা—কিন্তু পাঠকগণ, আশীর্বাদ করুন—আমি এই ভাব নিয়া যেন মরিতে পারি—যেন মৃত্যুকালে বলিতে পারি, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ"; যেন 'স্বামিন্ স্বামিন্' বলিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়—যেন আমার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে শেষকালে শুনিতে পাই—"বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়"।

নিবেদক—
শিবপদ চক্রবর্তী



শরচ্চন্দ্রের গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ



স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) ও নাতি কোলে শরচ্চন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহস্থদের বলতেন, এক হাতে সংসার ক'রে অন্য হাতে ঠাকুরকে ধরে থাকবে—সংসারে অবসর হলে দু'হাতেই তাঁকে ধরবে। কিন্তু ছবিতে দেখা যায়—গৃহর্ষি শরচ্চন্দ্র সংসারে থেকেও, ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে, ডান হাতে ধর্ম ও বাঁ হাতে সংসার নিয়ে উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাখ্য-স্তবমালা

প্রথমাবল্লী

প্রথমং—শ্রীরামকৃষ্ণদশকম্

পুনাতু পরমো হংসঃ সনঃ কংশারিসন্নিভঃ।
অক্ষরানন্দ সংরূঢ়ো হংসস্তমোনিরাকৃতৌ ॥

যোঽজঃ সন্নব্যয়াত্মা ভুবনহিতকৃতেঽধত্ত দেহং ধরায়াম্।
পাপানুদ্ধর্ত্তুকামঃ প্রথিতপৃথুকুলে ব্রাহ্মণো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ॥
বৈচিত্র্যাম্মানুষানাম্ ঋজুকুটিলরুচেৰ্ভিন্নধর্ম্মাশ্রিতানাম্।
যেনাপাদৈকমত্যং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ১ ॥

হুগ্ল্যস্তর্ভূত কামারপুকুরিতিপুরে ফাল্গুনে শুক্লপক্ষে।
শাকেঽব্ধিপঞ্চসপ্তাবুবিমিতবিশদে বাসরে সৌমনাথে ॥
যো জাতঃ পূতবিশ্বঃ প্রতিপদি চ তিথৌ ক্ষীণতাং প্রাপ্তবত্যাম্
শুদ্ধং বুদ্ধস্বরূপং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ২ ॥

তর্কৈর্যস্তার্কিকাণাং স্মিতধ্বতলঘিমা চূর্ণয়ন্ দর্পজালম্।
ধর্ম্মাণাং গুহ্যতত্ত্বং সুললিতবিশদৈঃ ভাষিতৈর্দ্দেশিকৈশ্চ ॥
তুল্যং প্রাবূবধৎ তৎ প্রগুণজড়মতীন্ লীলয়া সর্বলোকান্।
শুদ্ধং বুদ্ধস্বরূপং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ৩ ॥

ঊঢ়ং লক্ষ্মীস্বরূপং বিধিমনুসরতা শারদানাম রম্যম্।
স্ত্রীরত্নং যেন যূনা জনমুপদিশতা ধর্ম্মতত্ত্বং ক্রিয়াভিঃ ॥
মোহধ্বান্তং জনানাং রবিমিব সততং জ্ঞানরশ্মিপ্রণুন্নম্।
চিত্তাৎ নিঃসারয়ন্তং নভস ইব গুরুং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ৪ ॥

লীলাং রামস্য কৃষ্ণস্য চ রুচিররসাং দর্শয়ন্ বালবৃন্দৈঃ।
বাল্যে যো দর্শকেভ্যঃ সুখমদিত পরং দেবলোকেঽপ্যলভ্যম্ ॥
যো নিত্যং সেবকানামধিবসতি মনো বারয়ন্ পাপবৃত্তিম্।
শুদ্ধং বুদ্ধস্বরূপং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ৫ ॥

একঃ স্রক্‌চন্দনাদীন্ সুমধুরবিষয়ান্ ত্বস্ত্যজান্ রামকৃষ্ণঃ।
সংসারেঽস্মিন্ জহৌ যৎ তদীহ ভুবনে তৎসমো নাস্তি ধন্যঃ॥
স্ত্রীমাত্রে মাতৃভাবো মৃদি চ সুবিমলে কাঞ্চণে তুল্যভাবো।
যস্যাসীৎ বিশ্বমধ্যে প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ৬ ॥
নির্ব্ব্যাজাং যশ্চ ভক্তিং ভজননুতিনতিপ্রেমপূর্ণামহেতুম্ !
মেনে শ্রেষ্ঠাং গরিষ্ঠাং পরপুরুষপরিজ্ঞানবিবেকহেতোঃ ॥
সিদ্ধের্যস্যাণিমাত্মা অথচ চিরবশাঃ সিদ্ধয়ো বাষ্ট দাস্যঃ।
শুদ্ধং বুদ্ধস্বরূপং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ৭ ॥
বর্ষে যো ভারতাখ্যেঽপ্যকপটরুচিরং দীপয়ন্ ধর্ম্মতত্ত্বম্।
যাতং স্বর্গং প্রবোধ্য শ্রুতিসুবচনৈঃ পাপিনং তাপিনঞ্চ ॥
পাপানুদ্ধর্তুকামঃ পুনরবতরিতুং ভারতে যঃ প্রতিজ্ঞাম্।
চক্রে তং সত্যসন্ধং প্রভবভয়হরং রামকৃষ্ণং নমামি ॥ ৮ ॥
ভক্তা যে রামকৃষ্ণং শরণমুপগতাঃ সেবমানাঃ পদাব্জম্।
যেষাং লক্ষ্যো ভবাব্ধৌ ভবতি চ ভগবান্ রামকৃষ্ণঃ শরণ্যঃ॥
প্রাণানাং প্রাণভূতো ভবতি চ ভগবান্ রামকৃষ্ণশ্চ যেষাম্।
তৈঃ সার্দ্ধং ভক্তবৃন্দৈঃ প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ৯ ॥
যে ভক্তাঃ শুদ্ধচিত্তাঃ প্রণতিনুতিপরাঃ প্রত্যহং স্তোত্রমেতৎ।
প্রেমার্দ্রাঃ সংপঠন্তি প্রভবভয়হরং সর্ব্বপাপৈর্বিমুক্তাঃ॥
অন্তে যাস্যন্তি লোকং সুখময়মমলং তে নরা অক্ষয়ং তং।
সত্যং সত্যং ন শঙ্কা ভজতরে নিয়তং রামকৃষ্ণং নু হংসম্ ॥ ১০ ॥

১৩০১ সাল, ২০শে ফাল্গুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাদ্য-স্তবমালা

ভাষান্তর

প্রথমবল্লী

প্রথমং—শ্রীরামকৃষ্ণদশকম্

ব্রহ্মানন্দে ভাসমান (অক্ষরানন্দ সংরূঢ়) হংসসদৃশ, কংসারি শ্রীকৃষ্ণতুল্য সেই পরমহংস অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে (তমোনিরাকৃতৌ) আমাদিগকে পবিত্র করুন (পুনাতু)।

যিনি জন্মহীন, অব্যয় হয়েও সংসারের মঙ্গল সাধনের জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত পৃথুবংশে দেহধারণ করেছিলেন, যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে মনস্থ করে, সরল-কুটিল ইচ্ছাবশতঃ বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে মতৈক্য সাধন করেছিলেন, সেই জন্মগ্রহণের ভয়হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

হুগলীর (জেলা) অন্তর্গত 'কামারপুকুর' নামক গ্রামে সতেরশ সাতান্ন শকাব্দে ফাল্গুণ মাসে, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি গত হলে, বুধবার, জগতপাবন যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শুদ্ধ, বুদ্ধস্বভাব, জন্মভয়নিবারক রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

যিনি ঈষৎ হাস্যসহকারে, হাল্কাভাবে তার্কিকদের অহঙ্কার তর্কের দ্বারা চূর্ণ করে, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সুললিত, সহজ দেশীয় ভাষায় (গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বাংলায়), যেন খেলার ছলে, প্রখর বুদ্ধি এবং অল্প বুদ্ধি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেই শুদ্ধ, বুদ্ধস্বরূপ, জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

সমাজবিধি অনুসরণ করে যে যুবক রমণীয় 'শারদা-নাম্নী লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীরত্নকে বিবাহ করেছিলেন, যিনি নিজকৃত আচরণের সাহায্যে জনগণকে ধর্মতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন ; সূর্য যেমন নিজ রশ্মির দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত করে সেই আকাশের গুরুর (সূর্যের) মতো যিনি জ্ঞানরশ্মির দ্বারা মানুষের চিত্ত থেকে মোহান্ধকার দূর করে দেন, সেই রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

বালকবৃন্দের দ্বারা রাম এবং কৃষ্ণের মনোহর ও রুচিপূর্ণ লীলা দেখিয়ে যিনি বাল্যকালে দর্শকদিগকে, দেবলোকেও অলভ্য, পরম আনন্দ বিতরণ করেছিলেন, যিনি নিত্যই তাঁর সেবক ও আশ্রিতদের মনে বসবাসকারী পাপবৃত্তি নিবৃত্ত করেন, সেই শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

একস্বরূপ যে রামকৃষ্ণ তুস্তর স্রক্ (মাল্য) চন্দনাদি সুমধুর পদার্থ-গুলিকে এই সংসারে পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং সে কারণে যাঁর তুল্য

ধন্য ব্যক্তি এ জগতে নেই; যাঁর কাছে এ জগতে স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃভাব আর মৃত্তিকা ও বিমল সুবর্ণে সমভাব ছিল, সেই জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি পরপুরুষপরিজ্ঞানে বিঘ্ন উৎপাদনকারী, শ্রেষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ পূর্ণপ্রেমস্বরূপ নিষ্কলঙ্ক ভক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ('মেনে') যাঁর সিদ্ধির জন্য আদি অথচ চিরবশীভূত অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি দাসত্ব করে, সেই শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ, জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি 'ভারত' নামক বর্ষে কপটতাশূন্য, রমণীয় ধর্মতত্ত্ব উদ্দীপ্ত ক'রে স্বর্গে গিয়েছেন, শ্রবণসুখকর বাক্যে পাপীতাপীদের সান্ত্বনা দিয়ে তাদের পাপ থেকে উদ্ধারকামী হয়ে যিনি পুনরায় ভারতে অবতীর্ণ হবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে সত্যসন্ধ, জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যে ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা ক'রে তাঁর শরণ নিয়েছিলেন, এই ভবসাগরে যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ, এবং যাঁদের কাছে ভগবান রামকৃষ্ণ সমস্ত প্রাণিজগতের (আত্মা বা) প্রাণভৃৎ স্বরূপ, সেই সমস্ত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

শুদ্ধ স্বভাব, প্রণতিপরায়ণ যে ভক্তেরা প্রত্যহ প্রেমাপ্লুত হয়ে, সকল পাপমুক্ত জন্মভয় হরণকারী এই স্তব পাঠ করবে, সেই মানুষেরা অন্তিমে সুখময় এবং নির্মল অক্ষয়লোক অবশ্যই প্রাপ্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই হংসস্বরূপকে নিয়ত ভজনা করা হউক ॥ ১০ ॥

১৩০১ সাল, ২০শে ফাল্গুন

দ্বিতীয়ং—ত্রিষষ্টীতম জন্মোৎসবস্তোত্রম্ ।

উত্তিষ্ঠ বন্ধো ! ত্যজ মোহনিদ্রাং
সংসার চিন্তাং পরিমুঞ্চ তাবৎ ।
আনন্দ কোলাহল ধ্বনিত বেলাং
গঙ্গাতটস্থং চল দক্ষিণেশম্ ॥ ১ ॥
অত্যৈব দেবো ভগবান্ মহাত্মা
শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমেশদেবঃ ।
দিষ্ট্যাতি কারুণ্য রসার্দ্র চিত্তঃ
বঙ্গেষু ধন্যং নরজন্মলেভে ॥ ২ ॥
লোকানুশিক্ষার্থমশেষমুগ্রং
সুদুশ্চরং গূঢ়তাপাহভিতপ্য ।
বাক্যৈঃ সসারৈরপি সর্ব্ববাধৈ;
রবোধয়ৎ তৎ সুনিগূঢ় তত্ত্বম্ ॥ ৩ ॥
দুর্ব্বোধশাস্ত্রাব্ধিচয়ং মথিত্বা ।
তৎসারভূতং সুবিশুদ্ধসারম্ ।
সংরক্ষ যত্নাজ্জগতাং হিতার্থং
গতোহধুনা শাশ্বত ব্রহ্মলোকম্ ॥ ৪ ॥
সঞ্চার্য্য শক্তিং নিজসেবকেষু
বেদান্ত বিজ্ঞান সিংহোপমেষু ।
সদ্বীপসিদ্ধস্থিতমেব কম্পিতং
ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডং প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ ॥ ৫ ॥
মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
সচ্ছ্রদ্ধয়া তান্ ভজ নিত্যমাদরাৎ ।
নির্ধূতপাপানন্নুদেবকল্পান্
স্থিহৈব নির্ব্বাণ সমাধি নিষ্ঠান্ ॥ ৬ ॥
ত্যক্ত্বাতিদূরং কুলজাতিমানং
সংসার বন্ধং ব্যবহারমূলম্ ।

আনন্দ গঙ্গাম্ভসি ধৌতপাপঃ
অভীষ্ট সিদ্ধ্যৈ ভজ সদ্‌গুরুং তম্ ॥ ৭ ॥
পাতালমাট্‌লান্টিক সাগরান্তং
বেদান্ত বিজ্ঞানবিভাতি শান্তম্।
দৃষ্ট্বাকথং ত্বং পরিতপ্যমানঃ
আচারভ্রান্তৈর্নিতরাং ন লজ্জসে ॥ ৮ ॥
অতোহভিমানং ত্যজ দূরতস্ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণ শরণঞ্চ গচ্ছ।
যস্মিন্ প্রসন্নে সকলং প্রসন্নং
জ্ঞানস্য ভক্তেরভুলোহবতারঃ ॥ ৯ ॥
নিত্যং সিদ্ধং পরমপুরুষং সচ্চিদানন্দরূপং
লীলার্থং বৈ কলিত শরীরং পুণ্যদেশে বসন্তম্।
সর্ব্বং ধর্ম্মং সুবিহিতমরে সর্ব্বতো জ্ঞাপয়ন্তং
বন্দেদেবং পতিতশরণং রামকৃষ্ণং বরেণ্যম্ ॥ ১০ ॥

১৩০৩ সাল, ২৫শে ফাল্গুন।

দ্বিতীয়ং—ত্রিষষ্ঠীতম জন্মোৎসব স্তোত্র

ভাষান্তর

হে বন্ধু! তোমার ভ্রান্তি ও মোহনিদ্রা ত্যাগ করে ওঠো; অসার সংসার চিন্তা পরিহার কর; আনন্দ কোলাহল মুখরিত গঙ্গাতটে অবস্থিত শ্রীদক্ষিণেশ্বরে যাই চল ॥ ১ ॥

আজকের দিনে মহাত্মা, পরমপুরুষ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব করুণ-রসে আপ্লুতচিত্ত হয়ে, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশকে ধন্য করে নরজন্ম লাভ করেছিলেন ॥ ২ ॥

জনগণের শিক্ষার্থে বহুবিধ সুদুশ্চর এবং উগ্র তপস্যা সম্পাদন ক'রে তার নিগূঢ়তত্ত্বগুলি সারযুক্ত সর্ববোধ্য নিজ বাক্যে সকলের বোধগম্য করেছিলেন ॥ ৩ ॥

অতিশয় দুর্বোধ্য শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে, তাদের সার-সত্তা বিশুদ্ধ ভাবে ও যত্নসহকারে জগত-কল্যাণের নিমিত্ত সংরক্ষিত করে, অধুনা তিনি নিত্য ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেছেন ॥ ৪ ॥

সিংহসদৃশ নিজ সেবকদের মধ্যে বেদান্ত বিজ্ঞান সঞ্চার ক'রে তিনি দ্বীপাদিসমন্বিত ধরাধামে, নিজের প্রখ্যাত কার্যের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডকে কম্পান্বিত করেছিলেন ॥ ৫ ॥

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদি তোমার থেকে থাকে তা' হলে শ্রদ্ধার সঙ্গে, সাদরে, সেই সেবকদের নিত্যই ভজনা কর ; সেই সেবকেরা ধৌত-পাপ, দেবকল্প এবং নির্বাণরূপ সমাধিনিষ্ঠ মহাপুরুষ ॥ ৬ ॥

সংসার বন্ধন ও কর্মাদির মূল কারণ যে কুলজাতি-অভিমান তাকে অতিদূরে পরিত্যাগ ক'রে, অভীষ্ট-সিদ্ধি করবার জন্য, আনন্দময় গঙ্গাজলে ধৌত-পাপ হয়ে নিজ সদ্‌গুরুর ভজনা কর ॥ ৭ ॥

অধঃস্থিত আট্‌লান্টিক সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বেদান্ত বিজ্ঞানের প্রশান্ত প্রভা অবলোকন করেও কি তুমি পরিতাপ করবে বা ভ্রান্ত আচারনিষ্ঠায় সর্বদা লজ্জিত হবে না ॥ ৮ ॥

অতএব তোমার অভিমান দূরে ত্যাগ কর ; শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হও। তিনি জ্ঞান ও ভক্তির অতুলনীয় অবতার ; তাঁকে প্রসন্ন করলে সর্বলোক প্রসন্ন হয় ॥ ৯ ॥

নিত্যসিদ্ধ, সচ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ খেলার ছলে এই পুণ্যদেশে শরীর ধারণ ক'রে বসবাস করেছিলেন। "সকল ধর্মমতই সুবিহিত"—এই মত সর্বত্র জ্ঞাপনকারী, পতিতজনের স্মরণ স্থল, বরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১০ ॥

১৩০৩ সাল, ২৫শে ফাল্গুন।

তৃতীয়ং—শ্রীরামকৃষ্ণস্য ধ্যানমূলস্তোত্রম্।

বিকশিতমুখপদ্মং স্নিগ্ধমন্দেন্দুহাস্যং
সুঘটিতনতবামস্কন্ধ বিন্যস্ত বস্ত্রম্।
স্তিমিতকমলনেত্রং মুক্তপদ্মাসনস্থং
সকরুণমবতীর্ণং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ১ ॥

করকমলমৃণালং জানুপ্রান্তাতিলম্বং
প্রকটিতবলিচিহ্নং বীরবক্ষঃ প্রসারম্ ।
ধবলকুসুমজালং সদ্‌গিরা সংসৃজন্তং
মদনদহনরূপং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ২ ॥
নিরবধিশিশুভাবং বালসারল্যমূর্ত্তিং
স্ফুরিত বহু বিভূতিং দগ্ধকামং কবীন্দ্রম্ ।
দুরিতদলনদীপ্তং কামবিত্তাসুরারিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৩ ॥
বিদিত নিখিল তত্ত্বং লোকশিক্ষাপনার্থং
বহুবিধমপি তেপে যোগচার প্রচারান্ ।
জগদঘমপহারং কিল্বিষারণ্যদাবং
অতুলিতমহিমানং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৪ ॥
কলিতজয়বিবেকানন্দমুখ্যান্ বিনেয়ান্
ক্ষপিত কলিকলঙ্কান্ প্রেরয়ন্তং মহান্তম্ ।
ধ্বনিত জলধিপ্রান্তং যস্য সিদ্ধান্তবাক্যং
বিমল পরমহংসং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৫ ॥
প্রলয়গহনঘোরং রোধকং সত্ত্বরক্তেঃ
নিখিল নরকমূলং কাঞ্চনং কামিনীঞ্চ ।
অবহিত মথ হিত্বা জ্ঞানভক্তি জ্বলন্তং
বিমল পরমহংসং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৬ ॥
ত্যক্ত্বাদূরং প্রাকৃতিসুলভামঙ্গলার্থাতিতৃষ্ণাং
তীর্থং কৃত্বা নিখিল ধরণীং নিস্পৃহা যে ভ্রমন্তি ।
যেষাং বদ্ধশ্চরণকমলে রামকৃষ্ণস্য আসীৎ
তৈঃ সার্দ্ধং বৈ বিগত কলুষং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৭ ॥

১৩০৪ সাল, ১৬ই ফাল্গুন ।

তৃতীয়ং—শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানমূল স্তোত্র

ভাষান্তর

যাঁর মুখপদ্ম বিকশিত হয়েছে, স্নিগ্ধ ও স্তিমিত চন্দ্রের মতো যাঁর হাসি, যাঁর সুগঠিত অথচ ঈষৎ আনত বামস্কন্ধে বস্ত্রের প্রান্তভাগ বিন্যস্ত রয়েছে, অর্ধস্ফুট কমলের মতো যাঁর নেত্র, মুক্তপদ্মাসনস্থ, করুণার অবতার সেই রামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

করপদ্মের মৃণাল-বাহু যাঁর জানুপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বিত, বীরসদৃশ উদার বক্ষোপটে যাঁর বলিরেখা প্রকট, শ্বেতপুষ্পের মতো সদবাক্য সৃজনকারী, মদনের দহনসম্ভব রূপবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

সততই যাঁর শিশুভাব, বালকের মতো যিনি সরল মূর্তিধারী, যাঁর মধ্যে অগণিত বিভূতি পরিস্ফুট, যিনি কামদহন কবিরাজ, মদনতাপ ও বিত্তরূপী অসুরদ্বয় দলন করে যিনি প্রদীপ্ত, সেই অমলিন পরমহংস রামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যাঁর সমগ্র বিশ্বের তত্ত্বজ্ঞান বিদিত ছিল, যিনি লোকশিক্ষার্থে বহুবিধ তপশ্চর্যা ক'রে যোগশাস্ত্রের বিধিগুলি প্রচার করেন, দাবানলের মতো জগতের দুঃখক্লেশ দগ্ধ করে যিনি নিবারিত করেন, অতুল-মহিমান্বিত সেই রামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যিনি জয়যুক্ত বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাত্মাদের কলিযুগের কলঙ্ক ঘোচাবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যাঁর সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি সাগর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছিল সেই অমলিন পরমহংস রামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যিনি কামিনী ও কাঞ্চনকে নিখিল নরকের মূল উপাদান বলে অবহিত হ'য়ে সত্ত্বগুণের দ্বারা ঘোর প্রলয়ান্ধকার রোধ করেছিলেন সেই জ্বলন্ত জ্ঞানভক্তিরূপী বিমল পরমহংস রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

স্বভাবজ অমঙ্গল বিষয়তৃষ্ণা দূরে ত্যাগ করে, যাঁরা নিষ্কামভাবে সমগ্র ধরণীকে তীর্থস্থানে পরিণত করে ভ্রমণ করেন, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপদ্মে বদ্ধচিত্ত, তাদের সঙ্গে একচিত্ত হয়ে আমি বিগতকলুষ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

১৩০৪ সাল, ১৬ই ফাল্গুন।

চতুর্থং—পঞ্চোপাসনপুটিতস্তোত্রম্।

চৈতন্যাখ্যং দ্বিতীয় রহিতং নেতি সংজ্ঞাবগম্যং
সূর্যজ্যোতিঃ সমপ্রকটিতং সচ্চিদানন্দরূপম্।
যস্মিন্ লোকাস্তপনকিরণৈর্ব্বারিবদ্ ভাসমানাঃ
ব্রহ্মাখ্যং তং ত্রিগুণরহিতং রামকৃষ্ণং নমামঃ॥ ১॥
মায়াখ্যং বৈ ত্রিগুণবলিতং বাসনাভ্রান্তি বিম্বম্
বিশ্বাধ্যস্তং অহমহমিতিজ্ঞান সম্বুদ্ধমীড্যম্।
জাগ্রৎসুপ্তিপ্রভবপুটিতং ভেদ কৈবল্যচিত্তং
সর্ব্বজ্ঞাতং নিখিলশরণং রামকৃষ্ণং নমামঃ॥ ২॥
প্রত্যক্প্রাণপ্রণব কলিতং প্রাথমং যস্যরূপং
জ্যোতির্জ্যোতির্বিততজগতীং ভাসয়ন্তং রজোভিঃ।
ভাসা যস্য স্তিমিতকিরণাঃ কোটীচন্দ্রার্কতারাঃ
ত্রৈমাত্রাভিস্ত্রিপদগহনং রামকৃষ্ণং নমামঃ॥ ৩॥
রুদ্রস্যোরঃ সরসি নলিনীলীলয়া লাস্যমানং
লোলাপাঙ্গং গলিতচিকুরং বিভ্রতীং নগ্নবেশাম্।
বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরবিরলং কুন্দদন্তোদ্গিরন্তীং
ঘোরারাবাং নবঘনরুচিং রামকৃষ্ণং নমামঃ॥ ৪॥
শশ্বদ্ধ্যানস্তিমিত নয়নং ভৈরবং চাট্টহাস্যং
শূলাগ্রেণ ত্রিভুবনহরং ত্র্যম্বকং নীলকণ্ঠম্।
সুভ্রূভঙ্গ্যা প্রহতমদনং বালচন্দ্রার্দ্ধভালং
দেহজ্যোতিঃ স্ফটিক ধবলং রামকৃষ্ণং নমামঃ॥ ৫॥
শঙ্খং চক্রং শতদল গদে পুষ্কলং ধারয়ন্তং
লক্ষ্মীকান্তম্ গরুড়গমনং বিদ্যুদুন্মেষ দৃষ্টিম্।
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি পুরা চাবতীর্ণং ধরায়াং
শেষাক্রান্তং দনুজদলনং রামকৃষ্ণং নমামঃ॥ ৬॥
যস্যোপান্তে কৃতকরপুটা দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাঃ
দৃষ্টির্যস্য প্রপততি খলু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধ্যৈ।

হেরম্বাখ্যং গজপতিমুখং স্নিগ্ধহিঙ্গুলরক্তং
অর্ঘ্যদানে প্রথমবরিতং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৭ ॥
আবির্ভূতারুণসহচরং যে পথি ভ্রাম্যমানং
উদ্ভাসন্তং ভুবননয়নং অন্ধতামাস্রিদূরম্ ।
দেবারাধ্যং প্রকটকিরণং দিগ্বধূসেব্যমানং
শুদ্ধং বুদ্ধং গগনবসতিং রামকৃষ্ণং নমাম ॥ ৮ ॥
আক্রান্তেঽস্মিন্ কলিযুগভয়ে যো জীবস্যৈকপাতা
যস্যা পূর্ণাবতরণবশাৎ নিষ্প্রভা পূর্ব্বলীলা ।
পাদাজাভ্যাং দলিতদুরিতং হ্যাস্থিতং স্বে মহিম্নি
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রথিতযশসং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ৯ ॥
ধন্যা পৃথ্বী সফলজননা রামকৃষ্ণাতিনিষ্ঠাঃ
দূরোৎক্রান্তং কলিযুগভয়ং যস্য নাম্না মহিম্না ।
মাভৈষ্টোত্তিষ্ঠত খলু জনা পশ্য ভো রামকৃষ্ণং
জ্ঞাত্বা হ্যেনং নিখিলমনুজা সন্তু বৈ ভ্রান্তিমুক্তাঃ ॥ ১০ ॥

১৩০৫ সাল, ৬ই চৈত্র ।

পঞ্চোপাসনপুটিত স্তোত্র

ভাষান্তর

১নং শ্লোক

চৈতন্যাখ্যং (চৈতন্যনামক) দ্বিতীয়রহিতং (অদ্বিতীয়) নেতিসংজ্ঞাবগম্যম্ ('ইহা নয়', 'ইহা নয়' এইরূপ সংজ্ঞা দ্বারা যিনি অবগত হন) সূর্যজ্যোতিসমপ্রকটিতং (সূর্যের জ্যোতির মত যিনি প্রকাশিত) সচ্চিদানন্দরূপম্ (যিনি সৎ চিৎ, আনন্দ স্বরূপ) যস্মিন (যাঁহাতে) লোকাঃ (চতুর্দশ ভুবন) তপনকিরণৈঃ (সূর্যের কিরণ দ্বারা) বারিবৎ (জলতুল্য) ভাসমানা (প্রকাশমান) ; ব্রহ্মাখ্যং (ব্রহ্মনামক) তং (সেই) ত্রিগুণরহিতং (সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ বর্জ্জিত) রামকৃষ্ণং (রামকৃষ্ণকে) বয়ম্ (আমরা) নমামঃ (নমস্কার করি) ॥ ১ ॥

যিনি চৈতন্যস্বরূপ আখ্যাদ্বারা অভিধেয়, যিনি অদ্বিতীয়, 'ইহা নয়', 'ইহা নয়'এইরূপ সংজ্ঞা দ্বারা যিনি অবগত হতে পারেন, সূর্যের জ্যোতির মতো যিনি প্রকাশিত, যিনি সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ, সূর্যকিরণে যেমন জলরাশি বিভাসিত হয় তেমনি ভাবে যাঁহাতে চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত, ব্রহ্ম নামক সেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণরহিত রামকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১ ॥

২নং শ্লোক

মায়াখ্যং (তত্ত্বতঃ মায়া রহিত হয়েও যিনি 'মায়া' আখ্যা গ্রহণ করেছেন) বৈ (নিশ্চিতই) ত্রিগুণকলিতং (স্বরূপতঃ ত্রিগুণরহিত হয়েও যিনি ত্রিগুণকে—সত্ব, রজঃ তমঃকে অবলম্বন করেছেন) বাসনা-ভ্রান্তিবিম্বম্ (বাসনাভ্রান্তি যাঁর নিকট জলবিম্ব স্বরূপ) বিশ্বাধ্যস্তম্ (সমগ্র বিশ্ব যাহাতে অধ্যস্ত হয়) অহমিতিজ্ঞান সম্বুদ্ধং ('আমি' 'আমি' এই জ্ঞানে যিনি জাগ্রত) ঈড্যম্ (যিনি স্তুতি যোগ্য) জাগ্রৎ সুপ্তি প্রভবপুটিতং (যিনি নিত্য হয়েও পরিবর্তনশীল জাগ্রত, সুপ্তি প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন) ভেদকৈবল্যচিত্তম্ (অদ্বৈতসত্তা হয়েও যিনি মায়াবশে কেবল ভেদময় রূপে প্রকট-চিত্ত) সর্বজ্ঞাতম্ (যিনি সর্বজ্ঞ) নিখিলশরণম্ (যিনি নিখিল বিশ্বের আশ্রয়) (সেই) রামকৃষ্ণং নমামঃ (রামকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি) ।

তত্ত্বতঃ মায়া রহিত হয়েও যিনি নিশ্চিত 'মায়া'রূপ আখ্যা গ্রহণ করেছেন, স্বরূপত ত্রিগুণাতীত হয়েও যিনি ত্রিগুণকে অবলম্বন করেছেন' বাসনাভ্রান্তি যাঁর জলবিম্ব স্বরূপ (অথবা, বাসনাভ্রান্তিরূপ প্রতিবিম্বের যিনি বিম্ব), সমগ্র বিশ্ব যাঁহাতে অধ্যস্ত, 'আমি' 'আমি এই জ্ঞানে যিনি জাগ্রত, যিনি স্তবনীয়, যিনি নিত্য হয়েও ব্যবহারতঃ জাগ্রত, সুপ্তি প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন এবং অদ্বৈতসত্তা হয়েও মায়াবশে কেবল ভেদরূপে প্রতীয়মান হন, সেই সর্বজ্ঞ, নিখিল বিশ্বের শরণ বা আশ্রয় রামকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২ ॥

৩নং শ্লোক

(যিনি) প্রত্যকপ্রাণ প্রণব কলিতং (অন্তঃপ্রাণে প্রণব (ওঁ) রূপে প্রকাশিত), যস্য (যাঁহার) রূপং (রূপ) প্রাথমম্ (প্রথম প্রকাশিত) (যিনি) রজোভিঃ (রজোগুণের বিস্তারবশতঃ) জ্যোতির্জ্যোতিবিততজগতীং (আপন জ্যোতিপুঞ্জে সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করেছেন); যস্য (যাঁহার) ভাসা (প্রভাদ্বারা) কোটি চন্দ্রার্কতারা (কোটি চন্দ্রসূর্য তারকাবলী) স্তিমিতকিরণা। (কিরণহীন হ'য়েছে), (সেই) ত্রৈমাত্রাভি (অ-উ-ম্ রূপ ত্রিমাত্রাদ্বারা) ত্রিপদ গ্রহণং (প্রণব অথবা গায়ত্রীরূপে ত্রিপদ গ্রহণ করেছেন) রামকৃষ্ণং নমামঃ (রামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি)।

যিনি অন্তঃপ্রাণে প্রণবরূপে প্রকাশিত, যাঁর রূপ প্রথমেই প্রকাশিত হয়, যিনি রজোগুণের বিস্তৃতি সাধন ক'রে আপন জ্যোতিপুঞ্জে সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করেছেন ; যাঁর প্রভাদ্বারা কোটি চন্দ্রসূর্য তারকা স্তিমিভ-কিরণ হয়েছে, অ-উ-ম রূপ ত্রিমাত্রার দ্বারা যিনি প্রণব অথবা গায়ত্রীরূপে ত্রিপদ গ্রহণ করেছেন সেই রামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

৪নং শ্লোক

রুদ্রের (শিবের) বক্ষোরূপ (উরঃ) সরোবরে লীলাপদ্ম ধারণ-পূর্বক যিনি লাস্যনৃত্যে তৎপর ; যাঁর অপাঙ্গদেশ চঞ্চল, যাঁর কুন্তল চূর্ণ ; যিনি কালীরূপে নগ্নবেশ ধারণ করেছেন , কুন্দপুষ্পের মতো শুভ্রদন্তের শোভা বিকিরণ করে বিদ্যুদ্দামের দ্যুতি আপনাতে অপ্রত্যাহত রেখেছেন, নবমেঘসুন্দর, ঘোর আরাব-(শব্দ)কারী শক্তির সহিত অবিনাভূত সেই রামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

৫নং শ্লোক

সর্বদা ধ্যানে যাঁর নেত্রদ্বয় স্তিমিত হয়েছে, যিনি অট্টহাস্যকারী ভৈরবতুল্য, যিনি আপন শূলের অগ্রভাগ দিয়ে ত্রিভুবন হরণ করেছেন, যিনি ত্রিনয়ন, নীলকণ্ঠ শিবস্বরূপ ; যিনি আপন সুন্দর ভ্রূভঙ্গি দ্বারা

মদনকে নিধন করেছেন ; যাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে, যাঁর কলেবর জ্যোতি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, সেই রামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

৬নং শ্লোক

যিনি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা বিশেষভাবে ধারণ করেছেন, যাঁর প্রিয়া পত্নী লক্ষ্মী, যিনি গরুড়ে আরোহণ করে গমন করেন, যাঁর দৃষ্টি বিদ্যুতের উন্মেষতুল্য, যিনি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে বারংবার অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি শেষনাগের শয্যায় শায়িত; যিনি দানবগণ দলিত করেছেন সেই (বিষ্ণুতুল্য) শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

৭নং শ্লোক

যাঁর নিকটে দেবতা, গন্ধর্ব ও যক্ষগণ কৃতাঞ্জলি হ'য়ে থাকে ; ধর্ম, অর্থ, কাম সিদ্ধির জন্য যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয় ; অর্ঘ্যদান ক'লে প্রথমেই যাঁকে বরণ করতে হয়, মনোহর হিঙ্গুল রক্তাভ হস্তিমুখ 'হেরম্ব' (গণেশ) যাঁর নাম, তৎতুল্য রামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

৮নং শ্লোক

আবির্ভূত সূর্যের সহচররূপী যাঁর উদ্‌ভাসিত ভুবনব্যাপী নয়ন যে পথে ভ্রমণ করে, সে পথের অন্ধ তমিস্রা দূর হয় , যিনি কিরণোদ্‌ভাসিত দেবতাদের আরাধ্য আর দিগ্বধূরা যাঁর সেবা করেন, সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ দিব্যলোকবাসী শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

৯নং শ্লোক

যে মানুষেরা কলিযুগভীতিদ্বারা আক্রান্ত, তাদের যিনি ত্রাণকর্তা ; এইবারে যাঁর পূর্ণাবতরণবশতঃ অন্যান্য পূর্ব পূর্ব অবতারলীলা (বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি) নিষ্প্রভ হয়েছে ; যাঁর পাদপদ্মে দুষ্কৃতকারী দলিত হয়, যিনি নিজ মহিমায় সকল পূর্ণ পদার্থের মধ্যে পূর্ণতম রূপে প্রখ্যাত যশস্বী হয়ে বিরাজ করেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

১০নং শ্লোক

যে রামকৃষ্ণের সফল জন্মলাভে পৃথিবী ধন্যা হয়েছে, যে নামের মহিমায় কলিযুগভীতি অতিক্রান্ত হয়েছে, হে সাধারণ মানব ! সেই

রামকৃষ্ণকে দেখে সাহস অবলম্বন কর আর উঠে দাঁড়াও। তাঁকে জেনে নিয়ে সমস্ত ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হও।

১৩০৫ সাল ৬ই চৈত্র

পঞ্চমং— শ্রীরামকৃষ্ণনামাক্ষরস্তোত্রম্

শ্রী—রামচন্দ্রায় নিরঞ্জনায়
শ্রীশেষ সুপ্তায় গোপীশ্বরায়।
কামারখাতেহ্যবতীর্ণকায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ১ ॥
রা—জীবনেত্রায় রঘুবংশললামকায়
রাসোৎসেবামৃত হৃত মুনিমানসায়।
শ্রীদক্ষিণেশ্বর পুরীপরিশোভনায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ২ ॥
ম—নোজদগ্ধায় রণতাণ্ডবনর্ত্তকায়
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ভঙ্গিতরঙ্গিতায়
নটেশ্বরায় নবরূপবিধারকায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৩ ॥
কৃ—পাকটাক্ষৈঃ কলিকল্মষ কৃন্তনায়
জ্ঞানস্য ভক্তেরতুলস্য শুভবিগ্রহায়।
ত্রৈমূর্ত্তিভেদায় সনাতনায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৪ ॥
ষ্ণা—স্তাতি সুন্দর সুধাময় পূতনাম্নে
বাল্যাতিস্নিগ্ধমধুরায় শুচিস্মিতায়
শুদ্ধায় বুদ্ধায় নিরাময়ায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৫ ॥
য়—জ্ঞেশ্বরায় যতমান যতিব্রতায়
যুগাবতারায় যমভীতিবিলোপকায়।

যশস্বিনে যোগরূঢ়ায় তস্মৈ
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৬ ॥
ন—ন্দীশ্বরায় নিগমাদি প্রকাশকায়
নারীধনাদি নিগড়েভ্যো নির্বহকায়।
নিমিত্তমাত্রায় নিরিন্দ্রিয়ায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৭ ॥
ম—হৈজসে মোহবিলোপনায়
মৃত্যুঞ্জয়ায় মমতাদিবিকর্ষণায়।
শাস্ত্রার্থঘোর গহনস্থ মীমাংসকায়
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৮ ॥

১৩০৬ সাল, ২৮শে ফাল্গুন।

শ্রীরামকৃষ্ণনামাক্ষরস্তোত্রম

ভাবান্তর

“শ্রী—রা—ম—কৃ—ষ্ণা—য়—ন—মঃ”

অক্ষর স্তোত্র

শ্রী—শ্রীরামচন্দ্রায় (শ্রীরামচন্দ্রকে) নিরঞ্জনায় (পরমব্রহ্মকে) শ্রীশেষ-সুপ্তায় (অনন্তশয্যায় নিদ্রিত বিষ্ণুকে) গোপীশ্বরায় (গোপীগণের ঈশ্বরকে) কামারখ্যাতেহ্যবতীর্ণকায় (কামারপুকুরকে বিখ্যাত করতে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় (শ্রীরামকৃষ্ণকে), শুভায় (মঙ্গলদাতাকে) নমঃ (নমস্কার করি) ॥ ১ ॥

পরমব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে, অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, গোপীদের প্রভু, কামারপুকুরকে প্রখ্যাত করতে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই মঙ্গলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

রা—জীবনেত্রায় (পদ্মের ন্যায় নেত্র যাঁহার তাঁকে) রঘুবংশললামকায় (রঘুবংশ শ্রেষ্ঠকে) রামোৎসবামৃতহৃত (রামের জন্মহেতু আনন্দ-উৎসবের দ্বারা হৃত) মুনিমানসায় (মুনিগণের মানসকে) শ্রীদক্ষিণেশ্বর-পুরী পরিশোভনায় (দক্ষিণেশ্বর নগরীর শোভাবৃদ্ধি করেছেন যিনি

তাঁকে) শুভায় (মঙ্গলদাতাকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ (শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ২ ॥

কমলনয়ন রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ রামের জন্মহেতু যে আনন্দোৎসব হয়েছিল তার দ্বারা অভিভূত মুনিগণের মানসকে, দক্ষিণেশ্বর নগরীর শোভা বর্ধনকারী কল্যাণদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

ম—নোজ দগ্ধায় (রিপু দহনকারী) রণতাণ্ডবনর্তকায় (রণে যিনি ধ্বংসলীলা সাধন করেন সেই নর্তককে) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় ভঙ্গিতরঙ্গিতায় (সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের বিভিন্ন ভঙ্গিকে যিনি আলোড়িত করেছেন তাঁকে) নটেশ্বরায় (সেই নটরাজকে) নবরূপ বিধায়কায় (নব নব রূপ যিনি ধারণ করেন) (তাঁকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় (শ্রীরামকৃষ্ণকে) শুভায় (শুভফলদাতাকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৩ ॥

মনোজ বা চিত্তেজাত রিপুকে যিনি দগ্ধ করেন, যিনি রণতাণ্ডবনর্তক যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিভিন্ন ভঙ্গি আলোড়নকারী নটরাজ, যিনি নব নব রূপ বিধান করেন, সেই শুভফলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কৃ—পা কটাক্ষৈ (কৃপাকটাক্ষ দ্বারা) কলিকল্মষকৃন্তনায় (কলিযুগের পাপহননকারী) জ্ঞানস্য ভক্তেঃ (জ্ঞানের এবং ভক্তির) অতুলস্য (অতুলনীয়ের) শুভ বিগ্রহায় (শুভমূর্তিকে) ত্রৈমূর্তিভেদায় (একই শরীরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির ভেদ জ্ঞান যেখানে হয়) সনাতনায় (শাশ্বতকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় শুভায় (মঙ্গলদাতা রামকৃষ্ণকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৪ ॥

কৃপা কটাক্ষের দ্বারা কলিযুগের পাপহননকারী, জ্ঞান ও ভক্তির অতুলনীয় শুভমূর্তিকে, একই শরীরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপ ত্রিমূর্তির ভেদজ্ঞান যেখানে হয়, সেই শাশ্বত মঙ্গলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

ষ্ণা—ন্তান্তি সুন্দর সুধাময় পূতনাম্নে (যে সুধাময়, সুন্দর, পবিত্র নামের অন্ত অক্ষর 'ষ্ণ'-অর্থাৎ 'রামকৃষ্ণ'—সেই নামধারীকে) বাল্যাতি-স্নিগ্ধ মধুরায় (শিশুসুলভ সরল ও স্নিগ্ধ মধুরকে) শুচিস্মিতায়

(শুভ্রহাস্যযুক্তকে) শুদ্ধায় (পবিত্রকে) বুদ্ধায় (জ্ঞানকে) নিরাময়ায় (ব্যাধিমুক্তকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় শুভায় (শুভফলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৫ ॥

যাঁর সুধাময় পবিত্র ও সুন্দর নামের অন্ত অক্ষর 'ষ্ণ' অর্থাৎ 'রামকৃষ্ণ' তাঁকে, যিনি শিশুসুলভ সরল এবং স্নিগ্ধ মধুর তাঁকে, শুভ্রহাস্যযুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ ব্যাধিমুক্তকে, শুভফলদাতা সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

য—জ্ঞেশ্বরায় (যজ্ঞেশ্বরকে) যতমান যতিব্রতায় (যত্নশীল যতিব্রতচারীকে) যুগাবতারায় (যুগাবতারকে) যমভীতিবিলোপকায় (যমভয় যিনি বিলোপ করেন তাঁকে) যশস্বিনে (কীর্তিমানকে) যোগরূঢ়ায় (বিশেষার্থজ্ঞাপককে) তস্মৈ শ্রীরামকৃষ্ণায় (সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে) শুভায় (শুভদায়ককে) নমঃ (নমস্কার করি) ॥ ৬ ॥

যজ্ঞেশ্বর, যত্নশীল যতিব্রতচারী বা পরমহংস যুগাবতার, যমভয়বিলোপকারী, কীর্তিমান, বিশেষার্থজ্ঞাপক, শুভফলদায়ক সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

ন—ন্দীশ্বরায় (মহাদেবকে) নিগমাদি প্রকাশকায় (বেদ অর্থাৎ মূর্তিমান জ্ঞানকে) নারীধনাদি (স্ত্রীলোক, ঐশ্বর্য প্রভৃতি) নিগরেভ্যো নিগ্রহকায় (সাংসারিক বিষয়গুলি যিনি শৃঙ্খল বলে মনে করতেন তাঁকে) নিমিত্তমাত্রায় নিরিন্দ্রিয়ায় (যিনি নিমিত্তমাত্র এবং ইন্দ্রিয়াতীত) (সেই) শুভায় (শুভদায়ক) শ্রীরামকৃষ্ণায় (শ্রীরামকৃষ্ণকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৭ ॥

বেদ অর্থাৎ মূর্তিমান জ্ঞানস্বরূপ মহাদেব, নারী এবং ঐশ্বর্য প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়গুলি যিনি শৃঙ্খল বলে মনে করতেন, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত এবং নিমিত্তমাত্র সেই শুভদায়ক শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

ম—হৈজসে (যিনি মহাশক্তিশালী) মোহবিলোপকায় (যিনি মোহ দূর করেন তাঁকে) মৃত্যুঞ্জয়ায় (মৃত্যুঞ্জয়কে) মমতাদিবিকর্ষণায় (মায়ামমতার জাল যিনি দূর করেন তাঁকে) শাস্ত্রার্থঘোরগহনস্য মীমাংসকায়

(যিনি শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ মীমাংসা করেছেন তাঁকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় (শ্রীরামকৃষ্ণকে) শুভায় (শুভকে) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৮ ॥

মহাশক্তিশালী, মোহান্ধকার নাশকারী, মৃত্যুঞ্জয় মায়ামমতাবন্ধন-মোচনকারী, শাস্ত্রার্থের গহন অরণ্যে যাঁর মীমাংসা সাবলীল সেই শুভফলদায়ক শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

১৩০৬ সাল, ২৮শে ফাল্গুন।

ষষ্ঠং— শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্।

সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপায় জগদুদ্ধারকারিণে।
বেদধর্ম প্রতানায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

অনিল সলিল পৃথ্বী ব্যোমতেজোক্তপিণ্ডে
জনিত মলবিকারে তীব্রশোকাগ্নিদগ্ধে।
সততবিপরিপাকে দেহমিথ্যাত্মবুদ্ধি-
র্ন বিশতি পরতত্ত্বং রামকৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ১ ॥

নিরবধি ধনদারালালসাভ্রান্ত চিত্তাঃ
মৃগতৃষমনুযান্তি জন্মপ্রধ্বংশরূপম্।
বিষম বিষয়জলৈ সর্ব্বশস্তাড্যমানঃ
সমরস পরতত্ত্বং রামকৃষ্ণং ন বেদ ॥ ২ ॥

সুখদ-সুরস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দাদি পাশৈ
রহহ কঠিনবদ্ধৈ মুহ্যতেহত্র গুনীশৈঃ।
কথমিহ চ বরাকা বাসনোৎসঙ্গলগ্নাঃ
নিখিল বিভবপাদং প্রেপ্স্রবো রামকৃষ্ণম্ ॥ ৩ ॥

অভয় পরমতত্ত্বে যদ্যপি স্থাতুমিচ্ছা
মননমিহ চ চিত্তে সচ্চিদানন্দলাভঃ।
ত্বমিহ যদি প্রবেষ্টুং বাঞ্ছসী রামকৃষ্ণে
জহি জহি খলু বন্ধো! কামিনীকাঞ্চনং তৎ ॥ ৪ ॥

বিরম বিরম বন্ধো! যোগকর্ম্মানুবন্ধাৎ
ভজ ভজ হৃদি পদ্মে রামকৃষ্ণস্য মূর্ত্তিম্।

সুবিহিতমসিঘাতৈঃ ছিন্ধি সংসারপাশান্
স হ্যহ তব বিমুক্তেঃ কারণং নান্যদস্তি ॥ ৫ ॥
কিমু ধনজনলাভৈঃ স্বর্গসৌখ্যাদিভোগৈঃ
কিমথ ভজনযজ্ঞৈঃ স্মার্ত্তিকৈবৈদিকৈর্ব্বা ।
কিমু পঠন বিচারৈর্বাচিকৈঃ মৌনতাভিঃ
যদি পরম পরোক্ষং নাসিকর্ত্তুঞ্চ শক্য ঃ ॥ ৬ ॥
অনুসর শ্রুতি শীর্ষজ্ঞানবৈরাগ্য মার্গম্‌
সুখময় পরতত্ত্বে তিষ্ঠ ভো সঙ্গ শূন্যে ।
নিরবধি জপো বন্ধো ! রামকৃষ্ণেতি মন্ত্রম্‌
অভীরভীরিতিনাদৈঃ পূর্য্যতাং দিঙ্‌মুখানি ॥ ৭ ॥
শ্রীরামকৃষ্ণং সততং ভজন্তঃ
শ্রীরামকৃষ্ণে সততং বিশন্তঃ ।
শ্রীরামকৃষ্ণে সততং স্মরন্তঃ
লোকে জনাস্তে খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্‌

ভাষান্তর

সর্বধর্মের স্বরূপজ্ঞাতা, জগজ্জনের উদ্ধারকারী, বৈদিক ধর্মের প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥

বায়ু, জল, ক্ষিতি, আকাশ, তেজদ্বারা গঠিত এই ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডে যেহেতু দোষাদি উৎপন্ন হয়, এখানে সুতীব্র শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে নানা বিপদপাতে আর "আমার দেহই আত্মা" এই ভ্রান্তবুদ্ধিবশতঃ, কেহই পরমতত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝতে পারে না ॥ ১ ॥

যার চিত্ত সততই অর্থ এবং কামিনীর প্রতি লালসাযুক্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়, যে জন্মমৃত্যুরূপ মৃগতৃষ্ণিকার (মরীচিকার) অনুসরণ করে ; সেই দুঃখদায়ক বিষয়-বাসনার জালে আবদ্ধ ও এই সবের দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা একরস; পরমতত্ত্ব রামকৃষ্ণকে জানতে পারে না ॥ ২ ॥

সুখময় সুরস, সুগন্ধ, সুস্পর্শ, সুশব্দাদি রজ্জুর কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সর্বদাই (অনীশ), হায়, যে ব্যক্তিরা মুহ্যমান হয়, কি করে সেই বাসনা-কামনা যুক্ত, মূর্খ (বরাকা) মানুষেরা, যে রামকৃষ্ণের পায়ে পূর্ণ ঐশ্বর্য লুটিয়ে পড়ে তাঁকে, পাবার ইচ্ছে পর্যন্ত করতে পারে ? ॥ ৩ ॥

যে পরমতত্ত্ব মানুষকে নির্ভয় করে, তাকে যদি আশ্রয় করতে চাও, তোমার চিত্তে যদি সচ্চিদানন্দ লাভের চিন্তা থাকে, যদি রামকৃষ্ণতত্ত্বে প্রবেশ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে কামিনীকাঞ্চনে অভিলাষ ধ্বংস কর ॥ ৪ ॥

যোগাদি কর্মানুষ্ঠান থেকে বিরত হও, বন্ধু। হৃদিপদ্মে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করে ভজনা কর ; সংসার বন্ধনকে সুবিহিতরূপে অসির আঘাতে ছিন্ন কর ; সেটাই তোমার মুক্তির কারণ হবে ; অন্য কোন কারণ নেই ॥ ৫ ॥

ধনজনলাভ করে কি হবে, স্বর্গ-সুখ ভোগ করেই বা লাভ কি, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বা বৈদিক ভজন যজ্ঞাদি করেই বা কি হবে, পঠন-পাঠন-বিচার-বাগাড়ম্বর অথবা মৌনতা অবলম্বন করেই বা কি লাভ, যদি পরমতত্ত্বকে অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ করতে না পার ॥ ৬ ॥

শ্রুতির (বেদ-উপনিষদের) মুকুটমণি জ্ঞানবৈরাগ্যের পথ অনুসরণ কর ; আনন্দময় পরমতত্ত্বে নিঃসঙ্গ হয়ে অধিষ্ঠান কর। বন্ধু হে ! সদাসর্বদা রামকৃষ্ণ মন্ত্র জপ কর, আর "কোন ভয় নাই" এই উচ্চরবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত কর ॥ ৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণকে সততই ভজনা করে, শ্রীরামকৃষ্ণকে সততই আশ্রয় করে, শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করে মানুষেরা ভাগ্যবান হবেই হবে ॥ ৮ ॥

সপ্তমং— সসাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

স্বামিনং শ্রীগুরুং নত্বা বিবেকানন্দমব্যয়ম্
স্তোত্রমেতৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্ ॥

ছিত্বা যো বিশ্বরূপম্ বিভববিলসিতং ব্যজজন্মাদিলীলং
লীলার্থং লোকনাথঃ প্রকটনরতনু র্যেহত্র জজ্ঞেহজরূপঃ
কাকুৎস্থং কেশিনাশং কলিতকলিমলং কামনির্ম্মুক্তবুদ্ধিং
শুদ্ধং বুদ্ধস্বরূপং নিখিলজনগুরুং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥ ১ ॥
শক্তিস্বরূপামভয়ামতন্দ্রিতাম্
শ্রীরামকৃষ্ণার্দ্ধামতীব গৌরবাৎ।
কৃপাকটাক্ষৈর্ভব দুঃখ হন্ত্রীং
নমাম্যহং ত্বাং ভুবি সারদাখ্যাম্ ॥ ২ ॥
গুরুপদ গতচিত্তো বেদবেত্তা চ বাগ্মী
ভুবনবিজয়ী যস্তু মূর্ত্তবেদান্তবিদ্যা।
স্মরহর প্রতিমূর্ত্তির্জীবমুক্তি প্রদাতা
জয়তু গুরু বিবেকানন্দপাদঃ পিণাকী ॥ ৩ ॥
যোহহংভাববিবর্জ্জিতস্তপশশীজ্যোৎস্নাভিরুদ্ভাসিতঃ
ভোগাসক্তি নিরাকৃতো গুরুকৃপামন্ত্রেণ সংপ্রাণিতঃ।
দৈন্যামানিত্বকেতনং গুরুপদে ভৃঙ্গায়মানো মুদা
বন্দেহহং শিরসা সদা তমমরং নাগাখ্যামুদ্ধারকম্ ॥ ৪ ॥
রামকৃষ্ণস্তু ভূৎ যেন পুত্রবান্ ভৌমমণ্ডলে।
"ব্রহ্মানন্দং" নমামি ত্বাং রাখালদলনায়কম্ ॥ ৫ ॥
নাস্তিমায়াঞ্জনং যস্য রঘুবীর পরাক্রমং।
ন্যাসীনাঞ্চ বরিষ্ঠং বৈ বন্দে ভক্ত্যা "নিরঞ্জনং" ॥ ৬ ॥
রাধাভাব প্রস্তায় প্রেমোজ্জ্বলমনস্বিনে।
ভক্তানাঞ্চ বরিষ্ঠায় "প্রেমানন্দায়"তে নমঃ ॥ ৭ ॥
মুক্তাত্মানমতিস্থিরং ধ্যাননিষ্ঠমহর্নিশম্।
নমামি শ্রীযোগানন্দমানন্দকন্দমন্দরম্ ॥ ৮ ॥
নিরক্ষরোঽপি সর্ব্বং যো জানাতি গুরুসেবয়া।
নমোহস্তু ভুতপাদায় পশ্চিমোত্তরদেশিনঃ ॥ ৯ ॥
শিবে যস্য পরা ভক্তিস্ত্যাগেহপিরক্তিরুত্তমা।

অহেতুকদয়াসিন্ধুং শিবানন্দং নমাম্যহম্ ॥ ১০ ॥
রামকৃষ্ণগতপ্রাণং হনুমদ্ভাবভাবিতং।
নমামি স্বামিনং রামকৃষ্ণানন্দেতি সংজ্ঞিতং ॥ ১১ ॥
সারদায়াঃ পদাব্জে বৈ নিত্যং যো ভ্রমরায়তে।
নমোহস্তু সারদানন্দ স্বামিনে জ্ঞানদায়িনে ॥ ১২ ॥
কর্ম্মিনাঞ্চ বরিষ্ঠায় জীবসেবাব্রতায় চ।
ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং গুণত্রয়মুপেক্ষিণে ॥ ১৩ ॥
শাস্ত্রজ্ঞায় প্রশান্তায় বেদান্তপ্রতিপাদিনে।
নমোহস্তু ভেদপাদায় জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্তয়ে ॥ ১৪ ॥
ফুল্লচিত্তায় ধীরায় গীতানির্ম্মাল্যমালিনে।
তুরীয়াম্বুধিমগ্নায় তুরীয়ায় নমোহস্তুতে ॥ ১৫ ॥
অখণ্ডানন্দসিন্ধৌ যঃ সততং বৈ মীনায়তে।
কর্ম্মযোগাতিনিষ্ঠায়াখণ্ডানন্দায়তে নমঃ ॥ ১৬ ॥
শুদ্ধ বুদ্ধি প্রশান্তায় বৈরাগ্যজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সুবোধায় নমোস্তুভ্যং ত্রিলোকং তীর্থীকুর্ব্বতে ॥ ১৭ ॥
পোঢ়ায়াদ্বৈতপাদায় শিবধ্যানপরায় চ।
কারুণ্যপূর্ণচিত্তায় সত্যনিষ্ঠায় তে নমঃ ॥ ১৮ ॥
নির্ম্মলং হৃদয়ং যস্য গুরোরাজ্ঞানুবর্ত্তিনে।
নির্ম্মলানন্দপাদায় নমোহস্তু মে সহস্রশঃ ॥ ১৯ ॥
গুরুপাদাম্বুজধ্যানপরায় শিবসঙ্গিনে।
জীবাধিব্যাধিনাশায় সদানন্দায় তে নমঃ ॥ ২০ ॥
আজন্মজ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ণাতায় মহাত্মনে।
বিজ্ঞানানন্দপাদায় ভূয়ো ভূয়ো নমস্তমে ॥ ২১ ॥
সন্ন্যাসীনোহপরান্ বন্দে ছিন্ন সংসার বন্ধনান্।
রামকৃষ্ণ মঠ স্থান্ তান্ কামকাঞ্চন বর্জ্জিতান্ ॥ ২২ ॥
বাৎসল্যসরসোচ্ছ্বাসৈঃ পরিপূর্ণামতন্দ্রিতাম্।
শুদ্ধাং যশোমতীং বন্দে বালগোপালমাতরং ॥ ২৩ ॥

সিংহিস্থেব পরাক্রান্তাং সিংহবাহিনী নায়িকাং।
রানীং রাসমনীং বন্দে রামকৃষ্ণৈকনিষ্ঠিতাম্ ॥ ২৪ ॥
দাস্যভাবানুসন্নদ্ধং মহাপ্রাজ্ঞং মহাবলং।
মথুরং চাতিদুর্দ্ধর্ষং বন্দে রাবণবিক্রমং ॥ ২৫ ॥
বলরামেতি বিখ্যাতং বসুবংশস্য ভূষণং।
রামকৃষ্ণময় প্রাণং বন্দে চৈতন্যপার্ষদম্ ॥ ২৬ ॥
ভৈরবস্যাবতারায় ত্বসদ্‌বিশ্বাস মূর্ত্তয়ে।
পূর্ণাদধিকবুদ্ধির্যস্তস্মৈ ঘোষায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥
বীরভক্তি স্বরূপায় রামকৃষ্ণ প্রচারিণে।
আত্মত্যোরেক নিষ্ঠায় রামচন্দ্রায় তে নমঃ ॥ ২৮ ॥
মোহনিদ্রাগত যস্য রামকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবয়া।
বন্দেমিত্রমমিত্রাণাং "মনোমোহন"-সংজ্ঞকং ॥ ২৯ ॥
সুরসং হৃদয়ং যস্য সুরেশ মিত্রবংশজং।
মহাশাক্তমভীং শান্তং দানবীরং নমাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥
রামকৃষ্ণকথোল্লাসামৃতোৎসায় যশস্বিনে।
নমো মহেন্দ্রগুপ্তায় গুপ্তগোপীদেহায় বৈ ॥ ৩১ ॥
অক্ষোভিত মতির্যো বৈ প্রশান্ত ইব সাগরঃ।
নমো নরেন্দ্রমিত্রায় শান্তায় গৃহমেধিনে ॥ ৩২ ॥
"সখীতি" খ্যাতি র্যস্যেহ গোপীপ্রেমোন্মদাপ্লুতঃ।
দ্বিজন্মায় নমস্তভ্যং দেবেন্দ্রায় দিবৌকসে ॥ ৩৩ ॥
"দানা"খ্যং ভৈরবাবিষ্টং দেবীধ্যানপরং সদা।
কালীপদেতি বিখ্যাতং নমামি জনপালকং ॥ ৩৪ ॥
রামকৃষ্ণলীলাখ্যানং গ্রন্থং যস্য মহদ্‌ যশঃ।
অক্ষয়ায় সেনাখ্যায় ব্যাসকল্পায়তে নমঃ ॥ ৩৫ ॥
রামকৃষ্ণকৃপাদৃষ্টি প্রণষ্টাষ্টভুবন্ধনং।
বন্দে সশক্তিকং ভক্ত্যা নবগোপাল সংজ্ঞকং ॥ ৩৬ ॥

পূর্ণচন্দ্রসমোল্লাসঃ প্রফুল্ল কমলোপমঃ।
ভক্তা যস্যাগমে পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রায় তে নমঃ ॥ ৩৭ ॥
তারকাদীন্ মহাভক্তান্ অপরানেকনিষ্ঠিতান্।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণান্ বন্দেহহং গৃহিণঃ সদা ॥ ৩৮ ॥
যে ভক্তাস্ত্বনুভক্তা বা রামকৃষ্ণস্য সন্তি যে।
ভবিষ্যন্তি চ যে ভক্তাস্তেভ্যোঽপ্যস্তু নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥
কামারপুকুরং বন্দে দক্ষিণেশ্বরবাটিকাং।
বন্দে পঞ্চবটীপ্রান্তং যোগভূমিঞ্চ সিদ্ধিদাং ॥ ৪০ ॥
মহাতীর্থমিদং বন্দে যোগাদ্যানমনুত্তমম্।
জীবনং রামচন্দ্রস্য প্রভোর্দেহাস্থিসম্পুটং ॥ ৪১ ॥
যত্র তিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বে রামকৃষ্ণস্য পার্ষদাঃ।
ভূস্বর্গং তমহং বন্দে বেলুড়মঠমন্দিরং ॥ ৪২ ॥
যত্র পেতুশ্চ ভাগ্যেন চরণাম্বুজরেণবঃ।
রামকৃষ্ণস্য তদ্দেশং বন্দে জন্মনিবৃত্তয়ে ॥ ৪৩ ॥
স্তবরাজমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রণতঃ শুচিঃ।
সর্ব্ব পাপবিধুতাত্মা পদং গচ্ছত্যনাময়ম্ ॥ ৪৪ ॥

১৩০৮ সাল ২রা চৈত্র।

সসাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র

ভাষান্তর

সাঙ্গোপাঙ্গগণ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব

অক্ষয় শ্রীগুরু স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম করে সর্বপাপহর এই স্তোত্র নিবেদন করছি।

যিনি বিশ্বরূপের বৈভবে বিলসিত, যাঁর জন্মাদি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা-লীলামাত্র, খেলার ছলেই যিনি প্রকট নরশরীরে লোকনাথ, যিনি নিত্য-স্বরূপ ও কূটস্থ (অচঞ্চল), কলিযুগের মালিন্য যাঁকে স্পর্শ করে না; যাঁর বুদ্ধি কামনাশূন্য, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ নিখিল জগতের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

অভয়া, শক্তিস্বরূপা, অতন্দ্র এবং অতীব গৌরবে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গিনী, যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ভবভয় দূর হয়, এই পৃথিবীতে "সারদা" নাম্নী সেই মাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যিনি গুরুপদচিত্ত, বেদজ্ঞ, বাগ্মী, ধর্মপ্রচারে বিশ্বজয়ী, যিনি মূর্ত বেদান্তবিজ্ঞানস্বরূপ, যাঁর প্রতিমূর্তি অনঙ্গদহনকারী, যিনি জীবের মুক্তি প্রদান করেন সেই শিবতুল্য শ্রীগুরু বিবেকানন্দের জয় ঘোষিত হউক ॥ ৩ ॥

যিনি 'অহং' (আমি) ভাব বর্জিত, যিনি তপস্যার স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, ভোগ এবং আসক্তি যাঁর মধ্যে নিবারিত, যিনি কেবল শ্রীগুরুর কৃপাদত্ত মন্ত্রেই উজ্জীবিত, অতি দীনভাবে যিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মুগ্ধ ভৃঙ্গের মতো গুঞ্জন করেন সেই উদ্ধারকারী 'নাগাখ্য' (দুর্গাচরণ 'নাগ' যাঁর নাম) মানুষটিকে মস্তক অবনত করে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁর উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই জগতে যেন পুত্রবান হয়েছিলেন, সেই 'রাখাল-দল' নায়ক কৃষ্ণোপম 'ব্রহ্মানন্দ'কে আমি নমস্কার করি ॥৫॥

যাঁর চোখ থেকে মায়াকাজল অপগত হয়েছে, যিনি রাঘবের মত পরাক্রমশালী, সন্ন্যাসীদের বরিষ্ঠ সেই ভক্ত 'নিরঞ্জনকে' আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

সাধনায় রাধা-ভাবে প্রমত্ত, প্রেমোজ্জ্বল মনীষী, ভক্তশ্রেষ্ঠ 'প্রেমানন্দকে' আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

যিনি মুক্তাত্মা সদাসর্বদা অচঞ্চলভাবে ধ্যানসিদ্ধ সেই আনন্দময় মন্দার পুষ্পের মতো শ্রী'যোগানন্দ'কে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

যিনি নিরক্ষর হয়েও গুরুসেবা করে সব কিছু অবগত হয়েছেন, সেই পশ্চিমদেশীয় 'অদ্ভুতানন্দের' পদতলে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

মহাশিবে যাঁর অচলা ভক্তি, ত্যাগে যাঁর উত্তম আসক্তি, অহেতুক কৃপার সাগর 'শিবানন্দ'কে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণ, শ্রীহনুমানের ভাবে ভাবিত ভক্ত 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামে খ্যাত স্বামিজীকে প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

শ্রীমা সারদার পাদপদ্মে যিনি সর্বদা মধুকরের মতো গুঞ্জন করেন সেই জ্ঞানদায়ী 'সারদানন্দ' স্বামীকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

বরিষ্ঠ কর্মবীর, জীবসেবাব্রতে আত্মদানকারী, সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের পরপারে 'ত্রিগুণাতীত' স্বামীকে বন্দনা করি ॥ ১৩ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ, প্রশান্ত, বেদান্ত, বেদান্তধর্ম প্রতিপাদনে নিযুক্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানদীপ্ত স্বামিজী 'অভেদানন্দ'-পদে প্রণাম জানাই ॥ ১৪ ॥

ধীর, প্রফুল্লচিত্ত, ভগবৎ-গীতা নির্মাল্যের মালাকার, তুরীয় সাগরে নিমগ্ন শ্রী'তুরীয়ানন্দকে' নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

অখণ্ড আনন্দসাগরে যিনি সর্বদা মীনের মতো বিহার করেন সেই কর্মযোগে নিষ্ঠাবান 'অখণ্ডানন্দকে' প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥

যাঁর বুদ্ধি শুদ্ধ এবং প্রশান্ত, যিনি বৈরাগ্য ও জ্ঞানের প্রকটমূর্তি, ত্রিলোককে যিনি তীর্থে রূপায়িত করেছেন সেই 'সুবোধানন্দ'কে প্রণাম ॥ ১৭ ॥

শিবধ্যানপরায়ণ, করুণাপূর্ণ চিত্ত, সত্যনিষ্ঠ 'অদ্বৈতানন্দ' পদে প্রণাম জানাই ॥ ১৮ ॥

যাঁর হৃদয় পবিত্র ও নির্মল, যিনি গুরুর আজ্ঞাবর্তী সেই 'নির্মলানন্দে'র পায়ে সহস্র প্রণাম ॥ ১৯ ॥

গুরুর পাদপদ্মে ধ্যানপরায়ণ, শিবসঙ্গী, জীবের আধি-ব্যাধি নাশের কারণ শ্রী'সদানন্দকে' নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

আজন্ম জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মা 'বিজ্ঞানানন্দ' পদে বারে বার প্রণাম জানাই ॥ ২১ ॥

সংসার বন্ধন ছিন্নকারী, কামিনীকাঞ্চন বর্জিত, রামকৃষ্ণ মঠে অবস্থিত সন্ন্যাসীগণকে বন্দনা করি ॥ ২২ ।

বাৎসল্যরসে উচ্ছ্বসিতা, পরিপূর্ণা, অতন্দ্র অপাপবিদ্ধা যশোমতী বাল-'গোপাল মা'-কে বন্দনা করি ॥ ২৩ ॥

সিংহীর মতো পরাক্রান্তা, সিংহবাহিনী দুর্গার নায়িকা, শ্রীরামকৃষ্ণে পরম শ্রদ্ধাবতী রাণী রাসমণিকে বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

দাস্যভাবে সংস্থিত, মহাজ্ঞান, মহাবল, রাবণের মতো পরাক্রমশালী, দুর্দ্ধর্ষ শ্রীমথুরকে বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥

শ্রী 'বলরাম' নামে প্রখ্যাত বসুবংশের ভূষণ, রামকৃষ্ণময় প্রাণ, চৈতন্যের সাক্ষাৎ পার্ষদস্বরূপ মহাজনের বন্দনা করি ॥ ২৬ ॥

ভৈরবের অবতার, অতুলনীয় জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রকট মূর্তি, যে মানুষটির বুদ্ধি পূর্ণাতীত, সেই 'ঘোষকে' (নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ) নমস্কার করি ॥ ২৭ ॥

রামকৃষ্ণ নাম প্রচারে যিনি বীরভক্তিস্বরূপ (হনুমৎস্বরূপ), আমৃত্যু যিনি একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, সেই 'রামচন্দ্রকে' নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় যাঁর মোহনিদ্রা অপগত হয়েছিল সেই মিত্র এবং অমিত্রের বন্দিত "মনোমোহন" সংজ্ঞক মানুষটির বন্দনা করি ॥ ২৯ ॥

যাঁর হৃদয় সুরসিত সেই মিত্র বংশোদ্ভূত মহাশাক্ত কিন্তু প্রশান্তচিত্ত দানবীর "সুরেশ মিত্র"কে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তকে (শ্রীম) প্রণাম করি, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত-উল্লাস বর্ণনা করে যশস্বী হয়েছেন, আর যিনি অবশ্যই গুপ্তভাবে গোপীদেহ ধারণ করেছিলেন ॥ ৩১ ॥

যাঁর মত বা বুদ্ধি একটুও ক্ষুব্ধ বা ক্ষোভিত হয় না, যিনি প্রশান্ত-সাগরের মতই প্রশান্ত, সেই সমাহিত গৃহী নরেন্দ্র মিত্রকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

"সখী" এই নামে যিনি প্রখ্যাত হয়েছিলেন, গোপীজন প্রেমোন্মত্ত দ্বিজ 'দেবেন্দ্র'কে নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥

'কালিপদ' নামে খ্যাত, যাকে 'দানা' বলে ডাকা হত, সেই শিবাবিষ্ট, দেবীধ্যানে নিমগ্ন জনপালককে নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥

রামকৃষ্ণলীলার আখ্যানগ্রন্থ যাঁর মহৎ যশের কারণ সেই বেদব্যাস-কল্প শ্রীঅক্ষয় সেনকে প্রণাম করি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতে যাঁর অষ্টভুবনপাশ মুক্ত হয়েছিল সেই "নবগোপাল" নামধারী শক্তিমান ভক্তকে প্রণাম করি ॥ ৩৬ ॥

প্রফুল্ল কমলের মত, পূর্ণচন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত, যাঁর আগমনে পূর্ণা ভক্তি প্রকট সেই 'পূর্ণচন্দ্রকে' প্রণাম করি ॥ ৩৭ ॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণ 'তারকাদি' অপর বহু নিষ্ঠাবান মহাভক্ত গৃহীদিগকে বন্দনা করি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরাই ভক্ত বা অনুভক্ত আর যাঁরা ভবিষ্যতেও তাঁর ভক্ত হবেন তাঁদেরকেও নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর উদ্যানবাটিকা, সিদ্ধিপ্রদানকারী পঞ্চবটির যোগভূমি এই সকলেরই বন্দনা করি ॥ ৪০ ॥

প্রভু রামকৃষ্ণের দেহাস্থি যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে সেই রামচন্দ্রের প্রাণসমান, উত্তম, যোগস্থান মহাতীর্থকে বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

যেখানে সকল রামকৃষ্ণপার্ষদ বাস করেন সেই ভূস্বর্গ তুল্য বেলুড়মঠ মন্দিরকে বন্দনা করি ॥ ৪২ ॥

যে যে স্থানে মহাভাগ্যবশতঃ রামকৃষ্ণের চরণরেণু পড়েছে সেই সেই স্থানকে জন্মমৃত্যু রোধের নিমিত্ত বন্দনা করি ॥ ৪৩ ॥

এই পুণ্য স্তবরাজকে যে বিনম্রভাবে, শুচিস্মিত হয়ে পাঠ করে সে সর্বপাপ মুক্ত-আত্মা হয়ে স্বর্গ-পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

১৩০৮ সাল ২রা চৈত্র।

অষ্টমং— শ্রীরামকৃষ্ণজন্মলীলাস্তোত্রম্।

ভূর্ভুবস্বরতিক্রমং ভবতি বৈ যৎস্থানমত্যাদৃতম্
শস্ত্যতস্তদ্ বিচারণে যদমিতং শুদ্ধা চ নিত্যা শ্রুতিঃ।
দিক্কালৌ হতচেতনৌ নিবসতো যদ্ধামদৌবারিকৌ
ব্রহ্মোর্ম্মিশতঘাততাড়িতমহো যস্যাস্তি ন স্পন্দনম্ ॥ ১ ॥
ভিত্ত্বাকাশমগাধমাচলতি হি তেজোজ্বলং চিদ্ঘনম্
তল্লোকাদপরাজিতং শতশতমার্ত্তণ্ড বিদ্যুৎ প্রভম্।

আব্রহ্মমনুজাঃ খলু বিচলিতা বিচ্যুত যোগাসনাঃ
দিকপালাঃ শতবজ্রনাদনিবহাৎ সন্ত্রাসিতাঃ কম্পিতাঃ ॥ ২ ॥

অগ্নীন্দ্রাদিকদেবতাঃ কিময়মু সম্মুক্ষিতাত্রাসিতাঃ
তদ্দৃষ্ট্বা বিমনীকৃতা দ্রুতপদং ব্রহ্মাস্পদং প্রস্থিতাঃ।
পৃচ্ছন্তী করযুগ্মকাঃ কিমিতি ভো জ্ঞাপয়াস্মানবুদ্ধাঃ
শ্রুত্বাপ্যেতন্নবেদ বা কমলজস্তূষ্ণীমাস্তে ত্ববুদ্ধঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিবরুণসহিতা দেবগন্ধর্বযক্ষাঃ
উৎক্রামন্তে গগনমমলং চণ্ডিকাং দৃষ্টবন্তঃ।
পৃচ্ছিন্তীমাং বদ করুণয়া মোহসম্মূলয়ন্ত্রী
কস্মাজ্জাতং প্রচলিত মহো কুত্র বা দীপ্ততেজঃ ॥ ৪ ॥

ব্যোম্নি শ্যামা প্রবদতি খলু সস্মিতং দেবসঙ্ঘান্
মাভৈর্মাভৈঃ শৃণুত নিখিলাশ্বাসবাক্যং পবিত্রম্।
প্রাত্যগব্রহ্ম স্তনিতগগনো জন্মলাভার্থমত্র
জ্যোতির্ভূত্বা প্রবিশতি খলু ভারতাখ্যে হি বর্ষে ॥ ৫ ॥

সন্দিগ্ধাস্তে নিখিলবিবুধাঃ সোৎসুকং চোক্তবন্তঃ
শাস্ত্রোক্তা বৈ প্রকটিত দশস্থূলমূর্ত্তিশ্চ বিষ্ণোঃ।
সন্দেহং নঃ কলয়তু সদা দেবত্বঃখাগ্নিহন্ত্রী
কোহয়ং বিষ্ণুঃ পততি জগতি জীবমুদ্ধর্ত্তৃকামঃ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুর্বেধাহর প্রতিদিনং তীব্রযোগী যদর্থম্
মীনাত্মা বৈ দশতনুকলা যস্য প্রশ্বাসবাতাঃ।
তত্ত্বং যস্য প্রখরতপসা নাধিগম্যং জনানাম্
সোহসাবাত্মাশ্রিতনরবপুঃ প্রোক্তমেতচ্চদেব্যা ॥ ৭ ॥

সং গচ্ছধ্বং ত্রিদশপ্রবরাঃ জীবরূপাহি মর্ত্ত্যে
লীলার্থং বৈ ত্রিদশললনা প্রেষয়িষ্যামি তূর্ণম্।
ছায়ামূর্ত্যা নিরবধিমহো রক্ষয়িষ্যামি নিত্যম্
সর্ব্বান্ দেবান্ ঝটিতি সকলা জীবজন্মালৎধ্বম্ ॥ ৮ ॥

তত্তেজোহগ্র্যং পতন সময়ে সপ্তঋক্ষাখ্য চক্রাৎ
ধ্যানাসীনং গলিতকিরণং সপ্তলোকাভিরামম্ ।
আকৃষ্যাহো স্খলিতভুবনে পশ্যত জ্ঞাননেত্রাঃ
সন্দিগ্ধা মা ভবত সকলাঃ প্রাপ্নুত কর্ম্মভূমিম্ ॥ ৯ ॥
প্রস্থিতাগ্রে মম পদরতা কিঙ্করী মে প্রধান
গঙ্গাপ্রান্তে রচয়িতুমহো শৈবলোকং দ্বিতীয়ম্ ।
তস্মিন্ স্থিত্বা প্রভুসুবপুষি বাসয়িষ্যামি নিত্যম্
সাক্ষীকৃত্য মৃড়পদযুগং কথ্যতে নাত্র শঙ্কা ॥ ১০ ॥
গত্বা চাত্যাতিশুভসময়ে ফাল্গুনে শুক্ল পক্ষে
শ্রীশ্রীকামারপুকুরপুরে পশ্যত জন্মলীলাম্ ।
নির্ঘোষস্তু ত্রিদশমনুজাস্তঙ্গদুন্দুভিনাদান্
বর্ষন্ত্বাশু স্তনভরনতা দেবকামিন্যঃ লাজান্ ॥ ১১ ।
যজ্ঞাগ্নয়ঃ প্রগৃহ্নন্তু হবীংষি দক্ষিণার্চ্চিসঃ
প্রসন্নাঃ ককুভঃ সন্তু শান্তিশ্চরতু ভুবনে ॥ ১২ ॥
নৃত্যন্তু চাপ্সরাঃ নগ্নাঃ বহন্তু মলয়ানিলাঃ ।
জয়তু রামকৃষ্ণাখ্যঃ পরব্রহ্মশ্রীমূর্ত্তিমান্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মলীলাস্তোত্রম্ ।

যাঁর অতি আদরের স্থান রয়েছে ভূর্ভুবস্বর্লোক অতিক্রম করে, শুদ্ধ আর নিত্য বেদ যাঁর বিচার প্রসঙ্গে প্রভূত নির্দেশ দেয়, হতচেতন দিক ও কাল যাঁর ভবনের দ্বার রক্ষক হয়ে বাস করে, শত তরঙ্গের অভিঘাতেও যাঁর স্পন্দন হয় না, অহো তিনি ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

অগাধ আকাশকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তেজে সমুজ্জ্বল, অপরাজিত, ঘনচৈতন্য, শতশত সূর্য ও বিদ্যুতের প্রভায় সেই লোক থেকে নেমে চলে আসে। ব্রহ্মা থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলে বিচলিত ও যোগাসন ভ্রষ্ট হয় ; দিকপালেরা শত বজ্রনাদে সন্ত্রস্ত ও কম্পমান হয় ॥ ২ ॥

অগ্নি, ইন্দ্র ও দিগ্‌দেবতারা তা দেখে, "এটা কি ?" এইভাবে ত্রাসে মনঃসংযোগ হারিয়ে দ্রুতপায়ে ব্রহ্মার আশ্রমে যান এবং করজোড়ে বলেন "আমরা অজ্ঞ, এটা কী আমাদের জানান।" ব্রহ্মা কিন্তু তাঁর বেদ দিয়েও তা জানতে পারেন না; অজ্ঞানতা বশে চুপ করে থাকেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ সমেত দেব, গন্ধর্ব, যক্ষগণ নির্মল আকাশে উৎক্রমণ করতে করতে মোহঘাতিনী চণ্ডিকাকে দেখতে পান ও তাঁকে প্রশ্ন করেন—এই দীপ্ততেজ কোথা থেকে উৎপন্ন হল, আর কোথায় বা গেল তা দয়া করে বলুন ॥ ৪ ॥

আকাশে শ্যামা স্মিতহাসে দেবসত্তমদের বললেন, ভয় নাই! ভয় নাই। পবিত্র এই সকল আশ্বাসবাণী শ্রবণ কর। প্রত্যগ্ ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) আকাশকে মুখরিত করে, জ্যোতিস্বরূপ হয়ে, জন্মলাভের জন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করছেন ॥ ৫ ॥

সেই সব দেবতারা সন্দিগ্ধচিত্তে ঔৎসুক্য সহকারে বললেন, "শাস্ত্রে তো বিষ্ণুর দশটি স্থূলমূর্তি (দশাবতার) প্রকট রয়েছে। আপনি সর্বদা দেবতাদের দুঃখহারিণী; আপনি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন; জীবের উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু কিভাবে জগতে নামছেন?" ॥ ৬ ॥

দেবী এই কথা বললেন যে, বিষ্ণু-ব্রহ্মা-মহেশ্বর, যাঁর জন্য প্রতিদিন কঠোর যোগ সাধনা করেন, মৎস্য ইত্যাদি দশাবতারমূর্তি যাঁর নিঃশ্বাস-বায়ু, যাঁর তত্ত্ব প্রখর তপস্যাবলেও মানুষের অধিগম্য হয় না, সেই তিনি আজ মানুষের দেহ ধারণ করেছেন ॥ ৭ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা মর্ত্যে জীবরূপে মিলিত হোন। লীলা করবার জন্যে দেবললনাকে (শ্রীশ্রীমাকে) আমি শীঘ্রই পাঠাব। ছায়া-মূর্তিতে আমি সর্বদা সকল দেবতাকে রক্ষা করব। সকলে জীবজন্ম লাভ করুন ॥ ৮ ॥

সপ্তর্ষিচক্র থেকে আকৃষ্ট হয় জগতে নিম্নপতনের সময় সপ্তলোকের নয়নসুখকর, গলিত কিরণতুল্য, ধ্যানাসীন সেই মুখ্য তেজকে সকলে

আপনারা জ্ঞাননেত্রে দেখুন। কোন সন্দেহ করবেন না; নিজ কর্মভূমিতে গমন করুন ॥ ৯ ॥

আগেই আমার পদসেবারত প্রধানা কিঙ্করী গঙ্গাতীরে দ্বিতীয় শৈবলোক নির্মাণের জন্য রওনা হয়েছেন। আমি বলছি এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সেখান থেকে শিবের পদযুগলকে সাক্ষী রেখে আমি প্রভুর কল্যাণময় দেহে সর্বদা বাস করতে থাকব ॥ ১০ ॥

আজ অতি শুভ সময়ে ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে শ্রীশ্রীকামারপুকুর গ্রামে গিয়ে জন্মলীলা প্রত্যক্ষ করুন। দেবতা ও মানুষেরা উচ্চ দুন্দুভিনির্ঘোষ তুলুন। স্তনভারে নম্র হয়ে দেবললনারা শীঘ্র লাজ (খৈ) ছড়াতে থাকুন ॥ ১১ ॥

দক্ষিণদিকে শিখাযুক্ত হয়ে যজ্ঞাগ্নিগুলি আহুতি দ্রব্য গ্রহণ করুক। দিকসমূহ প্রসন্ন হোক। জগতে শান্তি বিরাজ করুক ॥ ১২ ॥

নগ্ন অপ্‌সরার দল নৃত্য করুক; মলয় বাতাস প্রবাহিত হোক্। শোভনমূর্তিমান রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত পরব্রহ্মের জয় হোক ॥ ১৩ ॥

নবমং—সর্ব্বদেবতাখ্যস্তোত্রম্।

কুম্ভকক্ষসূর্য্যমণ্ডলাতিদীপ্ত বিগ্রহং
বালচন্দ্রলিপ্তভাল দিব্যপাদপঙ্কজং।
দক্ষিণেশ্বরাদিবাস মিষ্টদৈবতং বিভুং
সর্ব্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ১ ॥
ক্ষুদ্ররামশুদ্ধবংশপাবনং গদাধরং
কামকাঞ্চনাখ্য ঘোরদৈত্যগর্ব্ব খর্ব্বকং।
লোলদৃষ্টি পাতনষ্ট সংস্থতি প্রবন্ধনম্
সর্ব্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ২ ॥
কামকাঞ্চনান্ধকূপমজ্জিতং চরাচরং
বীক্ষ্য শোকমোহলোভ তাপদৈন্যজীবিতং।
"স্থাপনায় সম্ভবামি" পাতুমাত্মসঙ্গরম।

ব্রহ্মবংশ জাতমস্ত রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ৩ ॥
জন্মহীনমাদিজন্মবস্তমীশ্বরং প্রভুং
বাললোলমুগ্ধদৃষ্টি নাশ রক্ষণং ধ্রুবং ।
বাক্যবুদ্ধি মানসাদি রূঢ়মীড্য চেতনং
সর্ব্বদেবদেবতাখ্যরামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ৪ ॥
একমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং দিগম্বরং
কোটী বিষ্ণুরামরুদ্রবিশ্বকালজৃম্ভনং ।
আদিহীনমন্তহীনমিন্দ্রিয়াদি বর্জ্জিতং
সর্ব্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ৫ ॥
সাঙ্গবেদ বোধ কল্প সর্ব্বশাস্ত্রবন্দিতং
দেবদানবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিমীশমাদিমস্তকং ।
ভুক্তিমুক্তিদায়কং ভবাব্ধিনাবমক্ষরং
সর্ব্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ৬ ॥
কর্ষিতঞ্চ যেন দগ্ধখক্ষকক্ষমগুনং
জ্ঞানভক্তিচন্দ্রভানু রশ্মিভিঃ সুরঞ্জিতং ।
দিক্‌পালাদি ভক্তবৃন্দবেষ্টিতং-নিরন্তরং
সর্ব্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মপালমিন্দু ভাল মর্করাগবিম্বিতং
যৌগধর্মপালনং যুগাবতারণং বিভুং ।
ছন্নরূপমিষ্টদঞ্চ সোমসূর্য শাসনং
সর্ব্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥ ৮ ॥
রামকৃষ্ণ পাদমীড্যমাশু জাড্যনাশনং
তীব্রতাপতপ্তসপ্তলোক শীত সিঞ্চনং ।
সংবিভাব্য যে পঠন্তি পূতমেতদষ্টকম্
ব্রহ্মসদ্মসন্নিধিং তে যান্তি যান্তি নিশ্চিতং ॥ ৯ ॥

১৪ রামকৃষ্ণাব্দ, ২রা ফাল্গুন ।

সর্বদেবতাখ্য স্তোত্রম্

(সর্বদেবতার নামে স্তব)

কুম্ভরাশিস্থ সূর্যমণ্ডলের প্রদীপ্ত বিগ্রহ, নতুন চন্দ্রানুলিপ্ত ললাট, দিব্য পাদপদ্মশালী, দক্ষিণেশ্বরাদিতে বসবাসকারী সর্বব্যাপী ইষ্টদেবতা, সকল দেবতার "দেবতা" যাঁর নাম সেই রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

গদাধর ক্ষুদিরামের শুদ্ধ বংশকে পবিত্র করেছিলেন; 'কাম ও কাঞ্চন' নামক ভীষণ দৈত্যের গর্ব খর্ব করেছিলেন; চকিত দৃষ্টিপাতে যাঁর সংসার প্রবন্ধ নষ্ট হয়ে যায় সেই সকল দেবতার 'দেবতা' নামী রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

কামকাঞ্চনের অন্ধকূপে নিমজ্জিত, শোক, মোহ লোভজনিত দুঃখদৈন্যে জর্জরিত চরাচর দেখে, "ধর্ম স্থাপনে আবির্ভূত হব" এই মানসে, নিজ সংঘ রচনার জন্য অত্য ব্রাহ্মণবংশে জাত রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি জন্মহীন আর আদিকাল থেকেই রয়েছেন, যাঁর চঞ্চল অপাঙ্গ-দৃষ্টি সর্বদা সকলকে রক্ষা করে, সেই বাক্য, বুদ্ধি ও মানসাদির অগোচর চৈতন্যরূপী প্রভু এবং ঈশ্বর, সকল দেবতাদের মধ্যে 'দেবতা' যাঁর নাম, এমন রামকৃষ্ণের ভজনা করি ॥ ৪ ॥

এক, অদ্বিতীয় দিগম্বর ইষ্টদেবতা, কোটি বিষ্ণু রামরুদ্র ও অসীমকাল যাঁর নিশ্বাস স্বরূপ সেই আদিহীন অন্তহীন, ইন্দ্রিয়বাসনাদি সূক্ষ্মশরীর বর্জিত সকল দেবতাদের মধ্যে 'দেবতা' যাঁর নাম, সেই রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

বেদ এবং তার অঙ্গ কল্পশাস্ত্র তথা সর্বশাস্ত্রে বন্দিত, দেবদানবের দ্বারা অর্চিত আদি, অনন্ত ঈশ্বর ভক্তিমুক্তিদায়ক, ভবসাগর পার করেন এমন যে অক্ষর, সর্বদেবতাদের দেবতা যাঁর নাম সেই রামকৃষ্ণের ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের কক্ষপথ কর্ষণ করেছেন, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ সূর্যচন্দ্রের প্রভা দিয়ে যিনি সুরঞ্জিত, যিনি সর্বদা দিক্‌পাল ভক্তবৃন্দের দ্বারা বেষ্টিত থাকেন সেই সকল দেবতার দেবতা নামক রামকৃষ্ণের ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি ধর্মপালন করেন, যাঁর ললাটে চন্দ্র, যিনি সূর্যকরে বিম্বিত, যিনি যুগধর্ম পালনে যুগাবতার, প্রচ্ছন্নরূপে যিনি ইষ্টদান করেন, যিনি চন্দ্রসূর্যকে শাসন করেন, সর্বদেবতাদের দেবতা যাঁর নাম সেই রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

রামকৃষ্ণপদে মতি থাকলে অচিরে জড়তা নষ্ট হয়, তীব্র উত্তাপে তপ্ত সপ্তলোকে শীতল বারিসিঞ্চন হয়, এই কথা সম্যক চিন্তা করে যে ব্যক্তি এই পবিত্র অষ্ট শ্লোক পাঠ করবে, সে ব্রহ্মলোকের নিকটে অবশ্য অবশ্যই যাবে ॥ ৯ ॥

৭৪ রামকৃষ্ণাব্দ, ২২৷ ফাল্গুন।

দশমং—বাসন্তজন্মোৎসবস্তোত্রম্।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

নৃত্যতি কথমহ রহসি হসন্তী।
বনকুসুমকলিতা দেবী বাসন্তী ॥
কোটীযোগিনীবৃতা ক্ষুদিরামগৃহে। ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥
মলয়পবনমহো বহতি সুমন্দং।
কিরতি সজলকণকুসুমসুগন্ধং ॥ ২ ॥
দশদিশো নির্ম্মলা ঝটিতি বিভান্তি।
মুকুলিতচূতে লঘু পিকাঃ কুজন্তি ॥ ৩ ॥
মুখরিতা দিঙ্‌মুখা মঙ্গলবাদ্যৈঃ।
বকুলকো মুকুলিতো রতিমুখমদৈঃ ॥ ৪ ॥

মধুব্রত ঝঙ্কৃত মন্দারদাম।
ক্ষিপতি সুরপতিরিহ চারু নাম ॥ ৫ ॥
ধাবতি সাগরমুদ্বেল গঙ্গা।
মঙ্গল-কল-কল-নাদ তরঙ্গা ॥ ৬ ॥
কিন্নরী নৃত্যতি কুচভর নম্রা।
পুলক রোমাঞ্চিত ক্ষুদিরাম শর্ম্মা ॥ ৭ ॥
স্মর হর মুর হর শ্রুতিধর প্রমুখাঃ।
স্বাগতা দেবতাঃ শিশুপদ প্রণতাঃ ॥ ৮ ॥
অঞ্চল চঞ্চলা চলতি হ রামা।
ধরণীধরধরণী "ধনি"—নামা ॥ ৯ ॥
জয়তু গদাধর নদতি চ গগনং।
দ্বিতীয় কলান্বিত শশধর কলনং ॥ ১০ ॥
মুঞ্চতি ক্ষিতিতলমতিবল দর্পঃ।
কণক-কাম সখ কলিমলসর্পঃ ॥ ১১ ॥
হরিহর কমলজাকর্ষণ ভ্রমিতাঃ।
নরতনুধারণ ভয় সঞ্জাতাঃ ॥ ১২ ॥
হরিরিতি হরিরিতি ধ্বনতি মৃদঙ্গঃ।
গুম্ফিত-ধিমি ধিমি তালতরঙ্গং ॥ ১৩ ॥
বাণী খে নাদিতানাহতশব্দে।
জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ কৃপাব্দে ॥ ১৪ ॥
কিরতু শুভা তিথিঃ কৌমুদীমিন্দোঃ।
যচ্ছতু করুণাং হে কৃপাসিন্ধো ! ॥ ১৫ ॥
গুরুপদ ভ্রমর ভণিতগীতমিষ্টং।
সুখয়তু জনমিহ ভক্ত বরিষ্ঠং ॥ ১৬ ॥

৭৫ রামকৃষ্ণাব্দ, ২১শে ফাল্গুন।

বসন্ত-জন্মোৎসব স্তোত্র

বসন্তকালীন জন্মোৎসবের স্তোত্র

(বসন্তরাগে যতিতাল সহকাবে গাইতে হবে।)

দেবী বাসন্তী বনকুসুমভূষণে সজ্জিতা হয়ে, কোটি যোগিনীর সঙ্গে, রহস্যময় হাসি হেসে শ্রীক্ষুদিরামের গৃহে নৃত্য করছেন ॥ ১ ॥ ধ্রুবং ॥

মন্দমধুর মলয় বাতাস বহমান আর সে সজলকণ বাহি হয়ে ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে ॥ ২ ॥

অকস্মাৎ দশদিকে নির্মল বিভা দেখা যাচ্ছে ; মুকুলিত আম্রবৃক্ষে কোকিলের মৃদু কুজন শোনা যাচ্ছে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলবাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হলো আর রতির মুখমদের ছোঁয়ায় বকুল পুষ্পিত হয়ে উঠল ॥ ৪ ॥

মন্দারবৃক্ষে মৌমাছির ঝংকার উঠছে ; দেবতাধিপতি এখানে এক সুন্দর নাম ক্ষেপণ করলেন ॥ ৫ ॥

গঙ্গাসাগরাভিমুখে উদ্‌বেল তরঙ্গে ধাবিত হলে মঙ্গলময় কল কল নাদ উদ্‌গত হলো ॥ ৬ ॥

স্তনভারে আনতা কিন্নরীরা নৃত্য করছে, আর ক্ষুদিরামশর্মা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছেন ॥ ৭ ॥

স্মরহর, মুরহর, শ্রুতিধর প্রমুখ দেবতারা শিশুপদে প্রণত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে ॥ ৮ ॥

যিনি (যে নবজাত শিশু) ধরনীকে ধারণ করবেন, তাঁর ধরনী অর্থাৎ ধারণকারিনী, 'ধনি'-নাম্নী যুবতী চঞ্চল অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ॥ ৯ ॥

আকাশে "জয় গদাধর !" ধ্বনিত হচ্ছে। চাঁদের দ্বিতীয় কলা উদিত হয়েছে (দ্বিতীয়া তিথি) ॥ ১০ ॥

অহিদলে দর্পিতা কামসখা কাঞ্চনরূপী কলিকালের দুষ্টা সর্পিনী ভূমিতে লুটাচ্ছে ॥ ১১ ॥

হরিহরের কমলজাত আকর্ষণ হেতু ভ্রমাত্মক নর নারীর ধারণের ভয় সঞ্জাত হচ্ছে ॥ ১২ ॥

'হরি হরি' এই ধ্বনিতে মৃদঙ্গ বাজ্‌ছে ; ধিমি ধিমি এই তাল তরঙ্গ গুমরিত হচ্ছে ॥ ১৩ ॥

"কৃপাসিন্ধু রামকৃষ্ণের জয় হউক" এই বাণী অনাহত শব্দে আকাশে ধ্বনিত হচ্ছে ॥ ১৪ ॥

শুভতিথি চন্দ্রের কিরণরাশিকে বিকীর্ণ করুক। হে কৃপাসিন্ধু আমাদের করুণা কর ॥ ১৫ ॥

এরূপ ভ্রমর গুঞ্জিত এই ইষ্ট গীতাদি ভক্ত শ্রেণীদের সুখী করুক (আনন্দ দিক) ॥ ১৬ ॥

৭৫ রামকৃষ্ণাব্দ, ২০শে ফাল্গুন ॥

একাদশং—শ্রীগদাধরস্তোত্রম্।

ঘন-চেতনমক্রিয়মাদিমজং
চিরনিশ্চল-নিষ্কল-নির্ব্বিরুজং।
সুখ-সত্ত্ব-বিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ বরং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্মপরং ॥ ১ ॥
শত-সৌরি-মুরারী-তরঙ্গ যুতং
অযুতাযুত-ভাস্কর-কুক্ষি-ধৃতং।
সুবিশাল-সমুদ্র-সুদভ্র-করং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্মপরং ॥ ২ ॥
খুদিরাম-বিরাম-বিলাস-করং
ছল জৃম্ভিত-কারণ-কার্য্য-বলং।
জিত-কাঞ্চন কাম-প্রপঞ্চ হরং
প্রণমামি গদাধর ব্রহ্মপরং ॥ ৩ ॥
যুগধর্ম-প্রবর্ত্তক-গুপ্ত নটং
জন-পাবন-গাঙ্গ-তটাবসথং।

শিশু-সৌম্যমগম্য-প্রণম্য-বরং
প্রণমামি-গদাধর-ব্রহ্মপরং ॥ ৪ ॥
শিব-কেশব-বাসব-সঙ্গ-যুতং
অবতার-গরিষ্ঠমরিষ্ঠ হৃতং।
অঘমোচন-হুঙ্কৃত মুক্তি করং
প্রণমামি-গদাধর-ব্রহ্মপরং ॥ ৫ ॥
করুণা-ঘন-কর্ম্ম-কঠোর-পণং
গুণহীনমপাপমশেষ গুণং।
যুগচক্র-বিবর্ত্তক-তর্ক হরং
প্রণমামি-গদাধর-ব্রহ্মপরং ॥ ৬ ॥
শুভ বেলুড়-মন্দির-সন্নিহিতম্
নিজ-শিষ্য-প্রশিষ্য বিশেষ রতং।
শিবমোক্ষ ধনেশ্বরমাদি গুরুং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্মপরং ॥ ৭ ॥
সুগভীর-সমাধি-সমুদ্র-গতং
কৃত-ভক্তি-বিকাশন-বিশ্বহিতং।
শুভ জন্ম-তিথৌ ভব-তাপ-হরং
প্রণমামি গদাধর ব্রহ্মপরং ॥ ৮ ॥

৭৬ রামকৃষ্ণাব্দ, ১৬ই ফাল্গুন।

শ্রীগদাধরস্তোত্রম্

ঘনচৈতন্যস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, আদিরূপ, জন্মরহিত, চিরনিশ্চল, কলা বা অংশ রহিত, ব্যাধিহীন, সুখের আবাসস্থলরূপ বিশুদ্ধ বুধ—(পণ্ডিত) শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

শত বিষ্ণু-মুরারি যাঁর কাছে কেবল তরঙ্গভঙ্গ, অযুতাযুত সূর্য যাঁর

কুক্ষিভূত হয়ে আছে, সুবিশাল সমুদ্রের মতো শুভ্রহৃদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

খুদিরামের বিলাস আর বিরাম বা আশ্রয়স্থল; কার্যকারণরূপ শক্তিকে যিনি ছলনাবলে প্রকট করেন, কামকাঞ্চনকে যিনি জয় করেছেন আর জগৎপ্রপঞ্চকে হরণ করেছেন সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যিনি গুপ্তভাবে যুগধর্ম প্রবর্তনার নট বা অভিনেতা, যিনি জনগণের পবিত্রকারী গঙ্গার তটে অবস্থান করতেন, যিনি শিশুর মতো সুন্দর— প্রণম্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর অগম্য অর্থাৎ যাঁকে সহজে বোঝা যায় না, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের সঙ্গযুক্ত যিনি গরিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ অবতার, যিনি বিঘ্ন, বিপদ হনন করেন, পাপমোচনকারী ও দুষ্কৃতকারীদের মুক্তিদাতা ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যিনি করুণাঘন, যিনি কর্ম করবার কঠোর পণ গ্রহণ করেছেন, যিনি নির্গুণ হয়েও অপাপবিদ্ধ ও অশেষগুণসম্পন্ন, যিনি যুগচক্রের বিবর্তনকারী ও বুদ্ধিজাত তর্কহরণকারী, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

শুভ বেলুড় মন্দিরের সন্নিকটে নিজ শিষ্য-প্রশিষ্যের সঙ্গে নিরত, সর্বকল্যাণরূপী মোক্ষধনের প্রধানের আদি গুরু বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

সুগভীর সমাধি-সাগরে যিনি নিমজ্জিত, যিনি বিশ্বজনের হিতসাধনে ভক্তির বিকাশ করেছেন, তাঁর শুভজন্মতিথি সংসারের তাপ দুঃখ হরণ করে; ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

৭৬ রামকৃষ্ণাব্দ, ১৬ই ফাল্গুন।

দ্বাদশং— শ্রীরামকৃষ্ণাক্ষরস্তোত্রম্।

ও—মিতি বীজং যস্য শরীরম্।
চেতনঘন পরাজিত বীরম্॥
মায়াময় তনুমান্তরবেদ্যম্
নৌমি গদাধর-ভবরুজবৈদ্যম্॥ ১॥

রা—মরমেশ্বরমব্যয় মীড্যম্।
হৃতবনিতাবন মোহজ জাড্যম্॥
রাকাশশধর সস্মিত বদনং
নৌমি গদাধরমাহত মদনম্॥ ২॥

ম—ধুকর গুঞ্জিত লোহিত চরণং।
মূর্ত্তমুদাকর মুপমাহীনং॥
কামারপুকুর কুট্টিম কমলং।
নৌমি নিগমগুরুমতিজবমচলম্॥ ৩

কৃ—স্তিত কলিকলুষান্ধতমিস্রং।
কেলিকুতূহলবাল বিবস্ত্রং।
গহন সমাধাবসকৃন্মগ্নং।
কটাক্ষপাত বিঘট্টিত বিঘ্নম্॥ ৪॥

ষ্ণা—স্তমনুত্তমনাম-বরেণ্যং।
হরতি দরতিমিরমনন্তপুণ্যং॥
ব্রহ্মপরাৎপরমপাপবিদ্ধং।
নৌমি গদাধরমাগমবেদ্যম্॥ ৫॥

য—মভয়ভেদকবিবুধবরিষ্ঠং।
যোগসমাহিত-যতিজনজুষ্ঠং॥
ভবভয়তারণ-ভৈরবশরণং।
নৌমি গদাধর কারণকরণম্॥ ৬॥

ন—গ্ননিরাকৃতি-নিম্ননিমিত্তং।
নির্মল নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নিত্যং॥
নটবর নাগর নিঃস্বনরেশং।
নৌমি নিরাময় নির্ম্মলবেশম্ ॥ ৭ ॥
ম—ন্মথমারমিহির করলিপ্তং।
মঙ্গলময় তনু মন্বয় দৃপ্তং ॥
মানমতঙ্গজমর্দ্দন দক্ষং।
নৌমি গদাধর করধৃত মোক্ষম্ ॥ ৮ ॥

১১ রামকৃষ্ণাব্দ, ২৯শে ফাল্গুন।

শ্রীরামকৃষ্ণাক্ষর স্তোত্রম্

ওঁ—কার বা প্রণববীজরূপী যাঁর শরীর, চেতনঘন হয়ে যিনি বীর-শ্রেষ্ঠগণকে পরাজিত করেছেন, মায়াময়তনুধারী যাঁকে অন্তর দিয়ে জানা যায়, সেই ভবরোগহারী বৈদ্য (চিকিৎসক) গদাধরকে প্রণাম করি॥ ১॥

রা—ম ও রমেশ্বর বা নারায়ণ (রমা ঈশ্বর) রূপে যিনি অব্যয় ও পূজনীয়, যিনি বনিতা ও ঐশ্বর্য মোহ থেকে উৎপন্ন জড়তাকে হরণ করেছেন, পূর্ণচন্দ্রের মতো যাঁর স্মিত বদন আর যিনি মদনকে জয় করেছেন সেই গদাধরকে প্রণাম করি॥ ২ ॥

মধুকর গুঞ্জিত যাঁর রক্তবর্ণ চরণ-যুগল, যিনি উপমাহীন ও মূর্তিমান আনন্দ, কামারপুকুর কুট্টিমে বা অঙ্গনে যিনি পদ্মস্বরূপ, সেই অচল বেদগুরুকে প্রণাম করি॥ ৩ ॥

কৃ—ন্তিত (ছিন্নকারী): কলিকালের পাপ-অন্ধকার যিনি ছিন্ন করেছেন, ক্রীড়ানিরত বালকের ন্যায় যিনি বিবস্ত্র, গভীর সমাধিতে যিনি পুনঃপুনঃ নিমগ্ন হন আর কটাক্ষপাতের দ্বারা যিনি বিঘ্ন দূর করেন॥ ৪ ॥

'ষ্ণ'—যাঁর নামের অন্তে (অর্থাৎ 'রামকৃষ্ণ') আর যিনি সেই অনুত্তম নাম বরেণ্য, যিনি মনের অন্ধকার (দরতিমির) দূর করেন, যিনি অনন্তপুণ্যের আধার, ব্রহ্মপরাৎপর বা ব্রহ্মনিষ্ঠ, যিনি অপাপবিদ্ধ, অগমবেদ্য (অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নেই জ্ঞেয়) সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

য—মভয় হরণকারী যিনি যোগসমাহিত বুধশ্রেষ্ঠ, যিনি যোগীগণ কর্ত্তৃক সেবিত, ভবভয় অতিক্রমকারী ভৈরব আশ্রয় বিশেষ, সকল কারণের করণ বা সাধকতম কারণ, সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

ন—গ্ন, নিরাকার, নিম্ননিমিত্ত নির্মল, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নটবর, নাগর, নিঃস্বজনের আশ্রয়স্বরূপ, নির্দোষ নির্মলবেশধারীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

ম—ন্মথ-মার (অর্থাৎ মদনহত্যারী), সূর্য কিরণ লিপ্ত, মঙ্গলময়, মৃগু তণুধারী, মান (অহংকার) রূপী মাতঙ্গ বিমর্দনে দক্ষ, যাঁর হাতে সহজমুক্তি ধৃত, সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

৭৭ রামকৃষ্ণাব্দ, ২৯শে ফাল্গুন।

ত্রয়োদশং—শ্রীরামকৃষ্ণলীলাস্তোত্রম্।

ফাল্গুনস্যাষ্টাদশদিবসে, ৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণাব্দে, শুক্ল দ্বিতীয়ায়াম্ ॥

লীলার্থমাচ্ছাদিত নিত্যমূর্ত্তি—
যুগে যুগেহভুদ্ভুবি যোহবতীর্ণঃ।
কামারখাতে ক্ষুদিরামধাম্নি
পশ্যন্তু তং বালকমদ্য জাতম্ ॥ ১ ॥
শীতদ্যুতৌ শুক্ল কলাযুগস্থে
দিক্ষু প্রসন্নাসু চ সৌমবারে।
সিদ্ধাংশুগাদ্রীন্দুমিতে শকাব্দে
যঃ প্রাদুরাসীজ্জয়তীশ্বরোহসৌ ॥ ২ ॥

হিত্বা মহৈশ্বর্য্য মুদগ্রলীলং
মাধুর্য্য সান্দ্রংশ্রিত আত্মভাবম্ ।
কৈবল্য রত্নং বিতরন্ সমন্তা—
জ্জাতস্ত্বিদানীং ভুবি রামকৃষ্ণ ॥ ৩ ॥

রামস্য কৃষ্ণস্য চ বিগ্রহো যো
বাল্যে সুকেলী রুচিরং ননর্ত্ত ।
প্রাগ্‌জন্ম সংসিদ্ধ বিরাগবৃত্তি
র্নামানুরক্তো বিষয়েষ রক্তঃ ॥ ৪ ॥

সসোদরঃ প্রাপ্য চ দক্ষিণেশ্বরং
লোকান্নু শিক্ষাব্রতমাস্থিতো মুদা ।
মুক্তি প্রসাদাং ভবতারিণীং হিত্বা—
মুদ্বোধয়ামাস জগদ্ধিতেচ্ছয়া ॥ ৫ ॥

তত্যাতিদূরং কনকঞ্চ কামিনীং
ররাজ যোহসাবকলঙ্ক চন্দ্রবৎ ।
লীলাং সমাগম্য চ নাকলোকত-
শ্চকার ভূধর্ম্ম সমন্বয়ায় বৈ ॥ ৬ ॥

সঞ্চার্য্য শক্তিং নিজসেবকেষু
চাপাঙ্গভঙ্গ্যা ভবতাপহারী ।
যঃ প্রেরয়ামাস বিধুতপাপান্
সিংহোপমেযান্ দশদিক্ষু শিষ্যান্ ॥ ৭ ॥

স্থিরাসনং যস্য শ্রীদক্ষিণেশ্বরঃ
প্রসাদ ধন্যঞ্চ বেলুড় মন্দিরম্ ।
বেদান্ত সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মতত্ত্বকং
হস্তে স্থিতং চামলকং সুযস্য-ভোঃ ॥ ৮ ॥

তদ্রামকৃষ্ণস্য শুভাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে
ভক্তদ্বিরেকোন্মদমত্ত ঝঙ্কৃতে ।

গীর্ব্বাণ গন্ধর্ব্ব গণেন্দ্র সেবিতে
অহৈতুকীং ভক্তিময়ঞ্চ যাচতে ॥ ৯ ॥
শ্রীরামকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি, শুভাজয়োর্মে
ভৃঙ্গায়তাং চিন্ মকরন্দলিপ্সু ।
স যচ্ছতূত্থন্ ভবভীমসিন্ধোঃ
সুধানিধিঃ শান্তিসুধাং সদেন্দুম্ ॥ ১০ ॥

৭৮ রামকৃষ্ণাব্দ, ১৮ই ফাল্গুন ।

প্রথমাবলী সমাপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাস্তোত্রম্

(ফাল্গুণের অষ্টাদশ দিবসে, ৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণাব্দে শুক্ল দ্বিতীয়ায়)

লীলা করবার জন্য যিনি নিজের নিত্য মূর্তি আবরিত করেছেন, যিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কামারখাতে বা পুকুরে ক্ষুদিরামের গৃহে আজ সেই বালক জন্মগ্রহণ করল, অবলোকন কর ॥ ১ ॥

চন্দ্রের (শীতদ্যুতৌ) শুক্লপক্ষে, দ্বিতীয় কলাতে, (অর্থাৎ দ্বিতীয়াতে) সৌম্যবারে সমস্ত দিক প্রফুল্ল হলে, ১৭৫৭ শকাব্দে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) * যে ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন তাঁর জয়জয়কার হোক্ ॥ ২ ॥

মহান লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মহৈশ্বর্য ত্যাগ করে মাধুর্য্যমণ্ডিত আত্মভাব আশ্রয় করেন আর চতুর্দিকে কৈবল্য (মুক্তি) রত্ন বিতরণ করবার জন্য এখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন ॥ ৩ ॥

---

* সিন্ধ্বাশুগাদ্রীন্দুমিতেশ কাব্দে—১৭৫৭ শকাব্দে। এই বাক্যাংশ উল্টো দিক থেকে পড়ার নিয়ম; প্রথমে 'ইন্দু', পরে 'অদ্রি' তারপর 'আশুগ' তারপর 'সিন্ধু' এভাবে পড়তে হবে। 'ইন্দু' (চন্দ্র) ১, 'অদ্রি' (পাহাড়) ৭, 'আশুগ' বা দ্রুতগতি বাণ ৫, ও সিন্ধু (সমুদ্র) ৭ অর্থাৎ ১৭৫৭ শকাব্দ। মনে রাখতে হবে একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পাঁচে পঞ্চবাণ, ছয়ে ঋতু, সাতে সমুদ্র ইত্যাদি।

রাম ও কৃষ্ণের মূর্তি ধারণ করে যিনি বাল্যকালে মনোহরভাবে নাচতেন, পূর্বজন্মের সিদ্ধকর্মহেতু বিরাগপ্রাপ্ত হয়ে যিনি বিষয়-বাসনাদিতে অনুরাগহীন ছিলেন ॥ ৪ ॥

সোদরের (ভাইএর) সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে লোকশিক্ষার নিমিত্ত যিনি ব্রত অবলম্বন করেছেন, মুক্তি যাঁর প্রসাদ সেই ভবতারিণীকে যিনি জগতের হিতকামনায় উদ্বোধিত করেছিলেন ॥ ৫ ॥

কণক ও কামিনী অতি দূরে ত্যাগ করে যিনি কলঙ্কহীন চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করেন, আর যিনি লীলা আশ্রয় করে মর্ত্যলোকে নিখিল ধর্ম সমন্বয় করেছিলেন ॥ ৬ ॥

অপাঙ্গভঙ্গের (দৃষ্টিকোণের) দ্বারা যিনি পৃথিবীর সকল দুঃখ তাপ দূর করেছিলেন, যিনি নিজের সেবকদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে নিষ্পাপ, সিংহসদৃশ শিষ্যগণকে দশ দিকে প্রেরণ করেছিলেন ॥ ৭ ॥

যাঁর সুচির আসন হলো শ্রীদক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মন্দির যাঁর অনুগ্রহে ধন্য হয়েছে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত পরব্রহ্মতত্ত্ব যাঁর করামলকবৎ * প্রত্যক্ষ ছিল ॥ ৮ ॥

সেই রামকৃষ্ণের শুভ পাদপদ্মে, যেখানে ভক্তরূপী দ্বিরেফ বা ভ্রমর-কুল মদমত্ত ঝঙ্কার করে, আর যেখানে দেবতা, গন্ধর্ব ও গণপতিরা সেবা করেন, সেখানে অহেতুকী ভক্তি যাচ্ঞা করা হোক্ ॥ ৯ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি শুভ পাদপদ্মে মধুলিপ্সু চিত্ত ভৃঙ্গের মতো ভ্রমণ করুক। ভীষণ ভবসিন্ধু থেকে উত্থিত সেই সুধানিধি বা রত্ন (রামকৃষ্ণ) ইন্দুকে (শরচ্চন্দ্রকে) শান্তি সুধা দান করুন ॥ ১০ ॥

৭৮ রামকৃষ্ণাব্দ ১৮ই ফাল্গুন

প্রথমাবল্লী সমাপ্ত

* (হস্তস্থিত আমলকী যেমন স্পষ্ট ও বিবিক্ত তেমনি)

প্রথমং—

দ্বিতীয়া বল্লী

"বিবেকানন্দাষ্টকম্"

ওঁ নমো বিবেকানন্দায়

স্বামিন্ শ্রীগুরুং নত্বা বিবেকানন্দমব্যয়ং।
স্তোত্রমেতৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্ ॥

ওঁকার-পাবিত্র্য-বিশুদ্ধ মূর্ত্তিং
বন্দে নিরঙ্গেন্দু বিনোদ-কান্তিম।
বিবেক সংমোদ-হৃতারি গর্ব্বং
ভবাব্ধি-পোতং প্রণমামি দেবম্ ॥ ১ ॥

নটবর-নিভরূপং নন্দিপাথ প্রশান্তং
নলিন-নয়নমশ্রং মোক্ষ সংসর্গহেতুম্
নিখিল-মনুজ পালং সংশরন্যং দয়ালুং
তমহমজবিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

মোহান্ধতমসচ্ছেদং শারদেন্দ-শত-প্রভম্।
ভাস্করং হৃদয়াকাশে বন্দে সত্য সনাতনম্ ॥ ৩ ॥

বিষম-বিষয়-বার্ণৈর্বিদ্ধ-সংলুপ্ত বুদ্ধিং
সকল-ভবজনং যশ্চাবলোক্যাদ্র্র-চিত্তঃ।
জনন-মরণ-দুঃখং প্রাপ্ত বোধঃ প্রসেহে
তমহমজ বিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

বেদাদি-শব্দ-সামগ্রী-রত্নরাজী-মহোদধিম্।
স্মরামি সংস্থতি-শ্রেয়ঃ সম্পত্তিমক্ষরং গুরুম্ ॥ ৫

কারুণ্য কল্পদ্রুম্-চারু-রূপং
গুরুং প্রপদ্যে ভব-তাপ-নাশম্।
বিরাজমানং হৃদি-রম্য-বেশং
মূর্ত্তং বিবেকং শরণং চ নাথম্ ॥ ৬ ॥

নংদ-শ্রীরামকৃষ্ণাখ্য-ব্রহ্মশিষ্যং মুদাকরম্।
দাসোঽহং সততং বন্দে বিবেকানন্দমক্ষরম্ ॥ ৭ ॥

যম-ভয়-লয়-কারী যো বিভর্ত্যেক মূর্ত্তিং
বহুরপি ভুবনে যঃ সর্ব্বলোকৈক বন্ধুঃ।
অচল-গুরু-সুমেরোর্ধীরতা যত্র ভাতি
তমহমজ-বিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

(শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর নিজকৃত)

ভাষান্তর

অব্যয় বিবেকানন্দ গুরু করি নমস্কার।
সর্ব্বপাপ প্রণাশন বলিব এ স্তোত্রসার ॥
পবিত্র-প্রণব-শুদ্ধ-প্রকটিত-কলেবর।
বন্দি সে বিনোদকান্তি নিষ্কলঙ্ক শশধর ॥
ষড়রিপু হীনবল বিবেকবিচারে যাঁর
ভবসিন্ধু পোতরূপী গুরুদেবে নমস্কার ॥ ১ ॥
নটবর নিভরূপ সদাশিব শান্তিময়।
প্রধান, নলিননেত্র মুক্তিহেতু অসংশয় ॥
নিখিল পালক যিনি শরণ্য দয়ালু অতি
জন্মহীন শ্রীবিবেকানন্দ পদে মোর নতি ॥ ২ ॥
শরদেন্দু শত প্রভ উচ্ছিন্ন মোহ আঁধার
হৃদাকাশে দীপসত্য সনাতনে নমস্কার ॥ ৩॥
বিষম বিষয় বাণে বিদ্ধ লুপ্ত বুদ্ধি বল
ক্ষুণ্ণমন-হেরি যিনি নিখিল এ ভূমণ্ডল
জ্ঞানরূপ তবু সহে জন্মমৃত্যু দুঃখভার
জন্মহীন হেন গুরু পদে কোটি-নমস্কার ॥ ৪ ॥
বেদাদি অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের রত্নাকর
সংসারের সার যিনি নমি সে গুরু অক্ষর ॥ ৫ ॥
করুণার কল্পতরু মোহন মুরতি যাঁর।
ভবতাপবিনাশন গুরুদেব নমস্কার ॥

হৃদিশতদলে তিনি দীপ্তমান, রম্যবেশ
বিবেক সুমূর্ত্তিমান শরণ্য মম প্রাণেশ ॥ ৬ ॥
সদানন্দ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মশিষ্য রাঙ্গাপায়
এ দাসের কোটি নতি যিনি ভূমানন্দকায় ॥ ৭ ॥
বহুরূপে হয়ে যিনি নিত্য এক মূর্ত্তিধর
নিখিলজনের বন্ধু দূরকারী যমডর।
অচল গুরু সুমেরু ধীরতা যাঁহাতে স্থিতি
জন্মহীন হেন গুরু পদে মোর কোটি নতি ॥ ৮

দ্বিতীয়ং— ॥ শ্রীযুগ্মস্তোত্রম্ ॥

স্বামিনং শ্রীগুরুং নত্বা বিবেকানন্দমব্যয়ম্।
স্তোত্রমেতৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
যা সত্ত্বশক্তির্ভবজন্মসংস্থিতি-
র্যা রৌদ্রশক্তির্জনকর্ম্ম-প্রেষণা।
যা রামকৃষ্ণে ধৃতসৌম্য বিগ্রহা
যা দীপ্তবীর্য্যা নরসিংহস্বামিনি ॥ ১ ॥
তে নোহবতামুজ্জলযুগ্মশক্তী
যুনক্তু চৈকা শুভশুদ্ধভক্ত্যাম্।
পরা চ কর্ম্মণ্যপরাধিমোক্ষে
আনন্দমস্মান্ গময়ত্ব কর্ম্মান্ ॥ ২ ॥
যো বিষ্ণুলোকে সহ ভক্তবৃন্দৈ—
বিরাজতে নিত্যমনন্তরূপঃ।
কৈলাসশীর্ষে সহ শৈলপুত্র্যা
যো রাজমানস্তপযোগমূর্ত্তিঃ ॥ ৩ ॥
যো রামসংজ্ঞো রঘুবংশকীর্ত্তনঃ
প্রশান্ত চিত্তঃ স্ফুরদংশুভাস্করঃ।
যো রৌদ্রতেজা কপিকুলকেশরী
যস্যাদ্ভুতং কর্ম্ম প্রোবাচ বাল্মীকিঃ ॥ ৪ ॥

যো বৃষ্ণিবংশে ধৃত কৃষ্ণমূর্ত্তি—
র্জঘান কংশাদিক দৈত্য পুঙ্গবান্ ।
গাণ্ডীবধন্বা যোঽজয়ৎ ত্রিলোকম্
যৎ বীর্যমুগ্রন্নিপপাত কৌরবান্ ॥ ৫ ॥

যো জীবমুদ্ধর্ত্তু মিহাগমৎ পুন—
শ্চৈতন্য মূর্ত্তিস্তনুতপ্ত কাঞ্চনঃ ।
যো নিত্যানন্দোঽবধুত সংজ্ঞকঃ
সংকীর্ত্তনারাধন নিত্য তৎপরঃ ॥ ৬ ॥

তাবেব মর্ত্ত্যে কিল মূর্ত্তিমন্তা—
বুদ্ধর্ত্তু মস্মান্ রত কামকাঞ্চনান্ ।
স্ফুরৎ প্রভৌ রামবিবেক সংজ্ঞিতৌ
সদাপ্তকামাববতীর্ণবন্তৌ ॥ ৭ ॥

প্রাঙ্ রাঘবো যস্তু পুনশ্চ কেশবঃ
স এব জাতস্ত্বিহ রামকৃষ্ণঃ ।
যঃ সিতচন্দ্রোজ্জ্বল বালভৈরবঃ
স স্বামিপাদোঽবতরত্ত্বিদানীম্ ॥ ৮ ॥

হে রামকৃষ্ণ তব পাদপদ্মে
চেতঃ স্থিরং তিষ্ঠতু জন্মজন্মানি ।
হে স্বামিরূপিন্নটরাজশঙ্কর
গৃহাণ পাদাঞ্জলি দীনদাসম্ ॥ ৯ ॥

কৃত্বাপি সঙ্গং বহু পুণ্যলব্ধম্
নাত্মাপি প্রস্ফুটিতমিষ্টরূপম্ ।
নাবিস্থিতস্বা হৃদি পাদযুগ্মকম্
প্রত্যক্ষতামেহি মোহান্ধচেতসঃ ॥ ১০ ॥

শমন্তু সর্ব্বা হৃদি চিত্তবৃত্তয়ঃ
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকানি ।

পরার্থকর্ম্মাভ্যভিসন্ধিশূন্যম্
স্ফুরন্তু শক্তিং ময়ি তৎসুদৃষ্টয়ঃ ॥ ১১ ॥
জপতু জপতু তুণ্ডে রামকৃষ্ণেতি মন্ত্রম্
স্ফুরতু হৃদয়পদ্মে রামকৃষ্ণস্বরূপম্ ।
বিরমতু মম চিত্তং স্বামিপাদাম্ভোরুহে
জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতি ধন্যম্ ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়ং— শ্রীযুগ্মস্তোত্রম্

ভাষান্তর

শ্রীগুরু অক্ষয় স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম করে সমস্ত পাপনাশকারী এই স্তব বলছি ॥

যাঁর শক্তি বিদ্যমানতায়, সংসারে জন্মস্থিতি স্বরূপ, রুদ্রশক্তিরূপে যিনি জনগণের কর্মের প্রেরণা, যিনি রামকৃষ্ণে সৌম্য বিগ্রহ ধারণ করে আছেন, যিনি নরসিংহ স্বামীতে প্রদীপ্ত বীর্য্য-স্বরূপ ॥ ১ ॥

সেই সমুজ্জ্বল শক্তিদ্বয় আমাদিগকে রক্ষা করুক—যার মধ্যে একটি (শক্তি) শুভশুদ্ধ ভক্তিতে আর অন্যটি কর্মের পর মোক্ষে যুক্ত হউক; আনন্দস্বরূপ তা' আমাদিগকে কর্মসমূহে গমন করাক ॥ ২ ॥

নিরন্তর অনন্তরূপ যে বিষ্ণুলোকে ভক্তবৃন্দের সহিত বিরাজ করেন ; তপযোগ মূর্তিধারী যে কৈলাস শীর্ষে গিরিকন্যার সহিত বিরাজমান ॥ ৩॥

'রাম'-নামক যিনি রঘুবংশের সমুজ্জ্বলকারী প্রশান্তচিত্ত বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণ স্বরূপ, যে রুদ্রতেজা বানরকুলসিংহ, যার অলৌকিক কার্যাবলী বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন ॥ ৪ ॥

যিনি বৃষ্ণিবংশে কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করে কংসাদি দৈত্যকুলকে নিধন করেছিলেন ; গাণ্ডীবধনুধারণ করে যিনি ত্রিলোক জয় করেছিলেন এবং যাঁর উগ্রবীর্য্য কৌরবদিগকে নিপাতিত করেছিল ॥ ৫ ॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণরূপ চৈতন্য মূর্তি ধারণ করে যিনি জীবকুলকে উদ্ধার করতে পুনরায় এই সংসারে আবির্ভূত হয়েছিলেন ; আর যিনি নিত্যাই

আনন্দস্বরূপ 'অবধূত' নামে খ্যাত হয়ে পূজা সংকীর্তনে নিত্যই নিরত ॥ ৬ ॥

তাঁহারা দুইজন "রাম-বিবেক" সংজ্ঞায় আখ্যাত হ'য়ে (রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ), আর সদা সর্বদা আপ্তকাম হয়ে, এই মর্ত্ত্যে মূর্তিমান হ'য়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমাদের মতো কাম-কাঞ্চনে আসক্ত মানুষদের উদ্ধার করবার জন্য ॥ ৭ ॥

পূর্বে যিনি রাঘব (রাম) পুনরায় কেশব (কৃষ্ণ) সেই এখানে রামকৃষ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি শুভ্র চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল বালক ভৈরব সেই স্বামিপাদ এক্ষণে অবতীর্ণ হয়েছেন ॥ ৮ ॥

হে রামকৃষ্ণ ! তোমার পাদপদ্মে জন্ম জন্ম ধরে চিত্ত স্থির থাকুক। হে স্বামীজীরূপ নটরাজ শঙ্কর ! তোমার পদতলে এই দীনদাসের অঞ্জলি গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥

বহুপুণ্যার্জিত তোমার সঙ্গলাভ করেও আজ পর্যন্ত আমার ইষ্টরূপ প্রস্ফুটিত হয় নি ; তোমার পদযুগল হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় নি ; আমার মোহরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন চেতনায় তা প্রত্যক্ষ গোচর হউক ॥ ১০ ॥

সকল সংক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তি হৃদয়ে প্রশমিত হউক ; হস্তপদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পরের কাজে অভিসন্ধিশূন্য হয়ে ব্রতী হউক ; তোমার সুদৃষ্টি আমাতে শক্তি স্ফুরিত করুক ॥ ১১ ॥

মুখে (তুণ্ডে) সর্বদা রামকৃষ্ণ মন্ত্র জপ কর ; হৃদয়কমলে রামকৃষ্ণের স্বরূপ স্ফুরিত হোক্। চিত্ত আমার স্বামিপাদ মহাপদ্মে বিশ্রাম লাভ করুক। পৃথিবীতে 'বিবেকানন্দ' এই ধন্যনাম জয়যুক্ত হোক্ ॥ ১২ ॥

তৃতীয়ং— **শ্রীগুরুদেবস্তোত্রম্।**

অখণ্ডিতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং
নিরস্ত-নানাত্বমথাবভাসকং।
আত্মৈক্যবোধাদ পরোক্ষভূতং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ১

প্রযত্নরাহিত্যমজস্রজ্‌ম্ভিতং
যস্মিন্নিদং ভাতি চরাচরাখ্যং।
অনেকাদেকং পরমাত্মরূপং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ২

আনন্দসিন্ধুক্ষিতদিব্যকান্তিং
আকর্ণ বিশ্রান্ত বিশাল নেত্রং।
স্ফুরচ্ছশাঙ্কাঙ্কিত দীপ্ত ভালং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৩

দিগন্ত বিশ্রান্ত যশঃ সুশুভ্রং
মহাবলোদ্দ্‌প্ত শ্রীবাল ভৈরবং।
চীনাংশুকোষ্ণীষমতীবগৌরং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৪

বিবেক-বৈরাগ্য হৃতার্কবীর্য্যং
সপ্তর্ষিচক্রেশ্বরমাদিদেবং।
স্বয়ম্ভুবং শম্ভুমহাম্বুশীর্ষং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৫

যদীক্ষণং সুষ্ঠু হরত্যঘং ক্ষণং
প্রস্ফূর্ত্তিসংমেলন নাড়ী চক্রং।
সুষুম্নবর্ত্মো জ্জ্বলয়ন্তমূর্দ্ধং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৬

বাণী চ লক্ষ্মীঃ কলহং বিসৃজ্য
যদাস্ত্রি কণ্ঠে চ সুখং বিরাজতে।
দশভ্যো হৃষ্টাধিকশক্তিমন্তং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৭

শ্রীরামকৃষ্ণাঙ্গমভিন্নদেহং
লীলাশ্রিতং নিত্যমনন্তরূপং।

যুগাবতারাংশকমীশমিষ্টং
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৮
ধনুষি কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমী যা শুভাতিথিঃ
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

তৃতীয়ম্— শ্রীগুরুদেব স্তোত্র

ভাষান্তর

অখণ্ড, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ (পাপ স্পর্শ করে নাই এমন) বহুরূপতা-বিহীনভাবে প্রকাশমান, আত্মার একত্ব জ্ঞানহেতু অপরোক্ষীভূত পূজ্য শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিভরে নমস্কার করি ॥১॥

এই চরাচর নামক বিশ্বে যেখানে চেষ্টা রহিত, সহজভাবে অজস্র তথ্য বিকশিত রয়েছে, সেখানে অনেকের মধ্যে একরূপ সম্পন্ন পরমাত্মা স্বরূপ, পূজ্য গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥২॥

আনন্দ সাগরে নিমগ্ন দিব্যকান্তি, আকর্ণ বিশ্রান্ত বিশাল নয়নশালী, বিচ্ছুরিত চন্দ্রালোকে প্রদীপ্ত ললাট, পূজ্য গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥৩॥

যিনি দিগন্ত বিস্তৃত যশেরদ্বারা শুভ্রবর্ণ, মহাবলশালী বাল ভৈরব (শিব), চীনাংশুক (রেশম, সিল্ক) রচিত উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারী, অতীব গৌরকান্তি, মহাপূজ্য শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করি ॥৪॥

যাঁর বিবেকবৈরাগ্যে সূর্যের বীর্য নিষ্প্রভ হয়েছে, যিনি সপ্তর্ষিচক্রের ঈশ্বর আদিদেবতা, স্বয়ম্ভু শিবশম্ভুর মহাসাগরশীর্ষরূপ পূজ্য শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥৫॥

যাকে সম্যকভাবে দর্শন করলে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত পাপ অপহৃত হয়ে যায়, সেই সুষুম্নাপথে উজ্জ্বলীকৃত মূর্ধ বা শীর্ষস্থল, উপাস্য গুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করি ॥৬॥

সরস্বতী আর লক্ষ্মী ঝগড়াবিবাদ পরিত্যাগ করে যাঁর কণ্ঠে (সরস্বতী) ও চক্ষুতে (লক্ষ্মী) সুখে বিরাজ করেন, অষ্টাধিক দশ অর্থাৎ

অষ্টাদশ সংখ্যক শক্তিতে শক্তিমান পূজনীয় গুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করি ॥৭॥

শ্রীরামকৃষ্ণশরীরের সঙ্গে অভিন্ন দেহরূপী, লীলাশ্রিত, নিত্য, অনন্তরূপী যুগাবতার অংশ স্বরূপ ঈশ্বররূপী উপাস্য গুরুদেবকে, আমার ইষ্টদেবতাকে, ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥৮॥

ধনুরাশির কৃষ্ণপক্ষে যে সপ্তমী শুভতিথি তাকে নমস্কার, তাকে নমস্কার।

চতুর্থং— কলিতজয় বিবেকানন্দস্তোত্রম্।

বিগলিত শত সূর্য্যজ্যোতিষালিপ্তকান্তিং
স্ফুরদগণিতবিদ্যুদ্দীপ্ত বিস্ফোরনেত্রং।
শিশুশশধর ভালং ভৈরবং ভস্মগাত্রং
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ১
অরুণ কিরণজালোচ্ছিন্ন পাদারবিন্দং
নখরতরলজ্যোৎস্নাধিকৃকৃতেন্দু প্রকাশং।
স্তিমিতমদন গর্ব্বং শর্ব্বমানন্দরূপং
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ২
নয়ন কমল বাসং লোললাস্যং রমায়া
গু´ণবিভজিতবাণী কণ্ঠে যস্যাতিলগ্না।
নিখিলবিভবসিদ্ধির্যস্য সেবানুরক্তা
তমহমজবিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ৩
প্রহরণধৃতবেদং জ্ঞানবিজ্ঞান নেত্রং
মৃগপতিবলদৃপ্তং মূর্ত্তবেদান্তসূর্য্যং।
অভীরভীরিতি ঘোষৈর্নাদিত ক্ষৌণীপৃষ্ঠং
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ৪
কলিমলমপনেতুং স্বাগতং হৃক্ষচক্রাৎ
জড়মতিজনসঙ্ঘান্ দীপয়ন্তং রজোভিঃ।

জনহিত-মতি-কেন্দ্রস্থাপকং দিগ্‌দেশান্তং
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ৫

কলিযুগমলহারী শোভনঃ জ্ঞপ্তিখড়্গোঃ
সকলমতমপাস্য শ্রৌতধর্ম্মং রটন্তং।
নিহতনিখিলকামং মাত্রকৌপীনবিত্তং
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥৬

জননমরণমুগ্ধ ধ্বান্ত বিধ্বংসকার্য্যং
অমিতবলবিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং।
ভজনরসসমুদ্রং ভাববাত্যাতিলোলং
কলিতজয় বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৭

চরণকমলগন্ধ ভ্রামিতং ভৃঙ্গমিন্দুং
গময়তু গুরুদৃষ্টিস্তূর্ণমীশানলোকং।
শময়তু রমণাদ্য শ্রদ্ধেয়া শেষদোষান্
জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতি ধন্যং ॥৮

চতুর্থ— কলিতজয় বিবেকানন্দস্তোত্রম্

লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের স্তব

ভাষান্তর

শতসূর্যের গলিত জ্যোতির দ্বারা যাঁর দেহকান্তি লিপ্ত, যাঁর বিশাল চক্ষুতে অগণিত স্ফুরিতবিদ্যুতের দীপ্তি, যিনি ভৈরব, ললাটে যাঁর নূতন চন্দ্রকলা, যাঁর গাত্র ভস্মাচ্ছাদিত, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সূর্যের কিরণজালে উদ্ভাসিত পদ্মের মতো যাঁর চরণ, যাঁর নখের তরল জ্যোৎস্নাশোভায় চাঁদের প্রকাশ ধিক্কৃত হচ্ছে, যিনি মদনের গর্বকে প্রশমিত করেছেন, যিনি শিব এবং আনন্দস্বরূপ, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

পার্বতীর রমণীয় লাস্য যাঁর নয়নপদ্মে বাস করছে, গুণানুরক্তা

সরস্বতী একান্তভাবে যাঁর কণ্ঠলগ্না, যাবতীয় ঐশ্বর্যসিদ্ধি যাঁর অনুরক্ত সেবিকা, সেই ধ্রুব বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

বেদ যাঁর হস্তধৃত প্রহরণ, জ্ঞানবিজ্ঞান যাঁর চক্ষু, যিনি সিংহের মত বলশালী, যিনি মূর্তিমান বেদান্তসূর্য, পৃথিবীপৃষ্ঠকে যিনি "ভয় নাই! ভয় নাই!" ধ্বনিতে শব্দময় করেছিলেন, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণতি জানাই ॥ ৪ ॥

কলিকালের দোষ দূর করবার জন্য ঋষিচক্রের (সপ্তর্ষিমণ্ডল) থেকে যাঁর শুভ আবির্ভাব, রজোগুণের দ্বারা যিনি জড়বুদ্ধি জনগণের উদ্দীপন সাধন করেন, দিকে দিগন্তরে যিনি জনহিতকর কেন্দ্র স্থাপন করেছেন, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

সুন্দর জ্ঞানখড়্গের দ্বারা যিনি কলিযুগের দোষ হরণ করেন, সকল মত পরিহার করে যিনি শ্রুতির (বেদের) ধর্ম প্রচার করেছেন, যিনি সকল কামলিপ্সা নিহত করে কৌপীনবিত্ত মাত্র অবলম্বন করেছিলেন, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণতি জানাই ॥ ৬ ॥

জন্মমৃত্যুর মোহান্ধকার নাশই যাঁর কার্য, অমিতশক্তির বিলাসে যিনি ব্যোমকেশ, যিনি ভাবের ঝঞ্ঝায় অতি চঞ্চল ভক্তিরসের বিশাল সাগর, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

ইন্দু* সেই পাদপদ্মের সৌরভে মাতোয়ারা ভ্রমর। শ্রীগুরুর দর্শন তাকে ত্বরায় ঈশানলোকে পৌঁছে দিক ; রমণ প্রভৃতি যাবতীয় অশ্রদ্ধেয় দোষ শান্ত করুক ; জগতে বিবেকানন্দের অতিধন্য নামের জয় হউক ॥ ৮ ॥

পঞ্চমং— **মূর্তমহেশ্বরগীতিস্তোত্রম্।**

মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্করমিষ্টমমরনর বন্দ্যং।
বন্দে বেদতনুমুজ্ঝিতগর্হিত কাঞ্চন কামিনীবন্ধং ॥

* ইন্দু—কবি শরচ্চন্দ্র।

কোটীভানুকরদীপ্ত সিংহমহো কটিতট কৌপীণবস্তং
অভীরভীহুঙ্কারনাদিতদিঙ্মুখ প্রচণ্ডতাণ্ডবনৃত্যং—
ভুক্তিমুক্তিকৃপাকটাক্ষপ্রেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষং
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরু বিবেকানন্দং ॥

পঞ্চমং— **মূর্তমহেশ্বর স্তোত্র**

ভাষান্তর

যিনি মূর্তিমান মহেশ্বর, উজ্জ্বল ভাস্কররূপী ইষ্ট, অমরদেবতা ও মনুষ্যকুলের বন্দনীয়, বেদরূপ শরীরবিশিষ্ট, যিনি কাঞ্চনকামিনীতে অনাসক্ত, কোটি সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত যিনি সিংহ অথচ কটিতটে কৌপিনধারী, অভয়-হুঙ্কারনাদিত চারিদিকে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যরত, যাঁর কৃপাকটাক্ষে ভক্তিমুক্তি অপেক্ষিত থাকে, অঘদলকে (পাপসমূহকে) বিদলন করতে দক্ষ, বালচন্দ্রধর ইন্দুর* বন্দনীয়, শ্রীগুরু বিবেকানন্দকে নমস্কার করি ॥

ষষ্ঠং— **শ্রীজন্মস্তোত্রম্**

যস্মিন্ ভান্তি মিহিরশশিনঃ ক্ষীণখাস্থাৎ প্রকাশং ।
তারাফেনোদ্গামনকলনা রাজতে ব্যোমগঙ্গা ॥
সৃষ্টিস্থেমপ্রলয়মরীচিকোটিকল্লোর্ম্মিভাস্তং ।
স্থানং যত্রাচ্যুতবিধিহরাঃ ধ্যানসুপ্তং বসন্তি ॥ ১ ॥
তস্মাদূর্দ্ধং স্তিমিতনিখিলজ্যোতিষাং স্বপ্রকাশং
দিক্কালাক্রান্তমতিবলিনং চিদ্ঘনং সার্ব্বভৌমং ॥
সপ্তর্ষিভিঃ সহনিবসতিং শুদ্ধবোধাধিগম্যং ।
কর্ষত্যস্থামিতবলবপুর্লীলয়া রামকৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥
ভিত্বা ছায়াপথমবতরতীদ্ধমার্তণ্ডতেজঃ ।
দেদীপ্যন্তং প্রপতিতমহঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠং বিচাল্য ॥
বীরেশার্পিতমনন—"ভুবনেশ্বরী"—ক্রোড়তল্পে ।
শেতে রুদ্রো নরহিতধৃতব্যক্তদেহো হ্যদেহঃ ॥ ৩ ॥

---

*ইন্দু—কবি শরচ্চন্দ্র ।

স্বস্তিবার্ত্তাং ধ্বনিত গগনং দিগ্‌ গজা বৈ নদন্তি।
সুপ্তাবেদাঃ সচকিতমহঃ স্পন্দনং প্রালভন্তে ॥
গৃহ্লাত্যগ্নির্বির্তিতরসনো হুতহব্যং নতার্চ্চিঃ।
মন্দং বাস্তি মলয়মরুতো ভীতিরুর্ব্বীং জহাতি ॥ ৪ ॥
নিহতনিখিল তাপং নামরূপাদতীতং।
জনহিত ধৃত কায়ং সর্ব্বসুখৈকভূমিং ॥
গিলিত গগনকোটীং নেতিনেতীতিসংজ্ঞং।
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং প্রপদ্যে ॥ ৫ ।
নিবসতি রসনাগ্রে যস্য বাণী সদর্থা।
বিলসতি কমলাস্যাকর্ণ বিশ্রান্তনেত্রে ॥
তরুণমিহিররক্তালিপ্ত পাদাম্বুজন্ম।
কলিতজয় বিবেকানন্দপাদং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥
রজতগিরিপ্রকল্পং ভাস্বরং চন্দ্রভালং।
অমিতবল বিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং ॥
ভজনরসসমুদ্রং ভ্রান্তিনাশং বীরেশং।
কলিতজয় বিবেকানন্দপাদং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥
জননমরণহীনং দগ্ধকামং কবীন্দ্রং।
শরণমশরণানামাধি দৌর্ব্বল্য নাশং ॥
করুণনয়নমিন্দোর্দ্ধন্দ্ব দুঃখাভিঘাতং।
কলিতজয়বিবেকানন্দ পাদং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠং— শ্রীজন্মস্তোত্রম্

ভাষান্তর

যেখানে চন্দ্রসূর্য জোনাকির ক্ষীণ আলোর মত শোভা পায়, যেখানে আকাশগঙ্গা নক্ষত্রের ভাঙা ফেনা নিয়ে বিরাজ করছে, যে স্থান সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে সূর্যের কোটিকল্প তরঙ্গে বিভাসিত, আর যে স্থানে অচ্যুত (বিষ্ণু), বিধি (ব্রহ্মা) ও হর (শিব) ধ্যানসুপ্ত হয়ে বাস করেন ॥ ১ ॥

তারও ঊর্দ্ধে যেখানে সব জ্যোতি-স্তিমিত হয়ে গেছে, সেখানে আজ রামকৃষ্ণ তাঁর স্বপ্রকাশ, দিক্‌কালাতীত, অতিবল, চিদ্‌ঘন, সার্বভৌম, অমিতশক্তি তনুখানি লীলাচ্ছলে বহন করছেন ; সপ্তর্ষিদের সঙ্গে তিনি বাস করছেন যা শুদ্ধ জ্ঞান প্রভৃতি দিয়েই লাভ করতে হয় ॥ ২ ॥

উজ্জ্বল ছায়াপথকে ভেদ করে, ধরাতলকে সচকিত করে, দেদীপ্যমান সৌরতেজ নেমে আসে ; লোকহিতে স্থূলদেহ ধারণ করে বিদেহী রুদ্র, বীরেশ প্রদত্ত মনন নিয়ে 'ভুবনেশ্বরীর' কোলে শুয়ে রয়েছেন ॥ ৩ ॥

দিগ্‌হস্তীরা আকাশ ধ্বনিত করে স্বস্তির বার্তা ঘোষণা করছে ; সুপ্ত (লুপ্তপ্রায়) বেদরাশি মহাস্পন্দন লাভ করে চকিত হয়ে উঠছে ; অবনত শিখায় জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নি তাতে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করছে ; মলয় পবন ধীর গতিতে বইছে আর ভয় পৃথিবী ছেড়ে পালাচ্ছে ॥ ৪ ॥

নিখিলের সন্তাপ যেখানে অবসিত হয়, নামরূপের অতীত হয়েও যিনি জনহিতে স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, সকল সুখের যিনি একমাত্র আশ্রয়, নেতি নেতি সংজ্ঞায় যিনি আকাশসীমা গ্রাস করেন, লব্ধ-বিজয় সেই বিবেকানন্দের পাদপদ্ম শরণ করি ॥ ৫ ॥

সদর্থক বাণী যাঁহার জিহ্বাগ্রে বাস করে, যাঁর আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রে লক্ষ্মী বিরাজিত, লব্ধ-বিজয় সেই বিবেকানন্দের নবোদিত সূর্যের কিরণে রঞ্জিত ও অনুলিপ্ত পাদপদ্মকে স্মরণ করি ॥ ৬ ॥

রজতগিরির মতো যিনি উজ্জ্বল ও ভাস্বর, যাঁর কপালে চন্দ্রকলা, অমিত ও বিশাল পরাক্রমবিলাসী যিনি ব্যোমকেশ, ভক্তিরসের সমুদ্র, ভ্রান্তিনাশকারী, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা লব্ধ বিজয় সেই বিবেকানন্দের পাদপদ্ম শরণ করি ॥ ৭ ॥

যিনি জন্মমৃত্যুরহিত, বিজিতকাম, কবিশ্রেষ্ঠ, অনাথের আশ্রয়, * আধি ও দুর্বলতার বিনাশক, করুণনেত্র, ইন্দুর ** সকল দ্বন্দ্ব ও দুঃখের প্রশান্তি, লব্ধবিজয় সেই বিবেকানন্দের পাদপদ্ম শরণ করি ॥ ৮ ॥

* সকল শরণাগত এবং অশরণাগতদের আশ্রয়

** ইন্দু—কবি শরচ্চন্দ্র

সপ্তমং— **শ্রীগীতিস্তোত্রম্‌।**

প্রলয়পয়োধিজলে—সুর

প্রকট শরীর মীশং ভবভার নিরাশং
পরহিত-কলিত-ললিত-লীলাভাসং
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্রং
গুরুমিহ শম্ভুমীড়ে ॥ ১ ॥

বিবেক-বিরাগ ধনং শ্রুতিবিস্ফারনেত্রং
গলিত-মিহির কর-রঞ্জিত গাত্রং
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্রং
গুরুমিহ শম্ভুমীড়ে ॥ ২ ॥

ছিন্ন-জন্ম-জরা-কীনাশ-পক্ষং
করুণ-কটাক্ষ-বিনিক্ষেপ-দক্ষং
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্রং
গুরুমিহ শম্ভুমীড়ে ॥ ৩ ॥

গুরুগতজীবিতমহো কামকাঞ্চণত্যক্তং
মায়িনমিব কদা ব্যক্তমব্যক্তং
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্রং
গুরুমিহ শম্ভুমীড়ে ॥ ৪ ॥

শিরোধৃত ক্ষয়িত সপ্তমকল চন্দ্রং
জ্ঞানভক্তিকৃতি যৌগৈককেন্দ্রং
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্রং
গুরুমিহ শম্ভুমীড়ে ॥ ৫ ॥

ইতি জন্মতিথি পঞ্চকং।

দ্বিতীয়াবলী সমাপ্ত

—x—

সপ্তমং— শ্রীগীতি স্তোত্রম্।

ভাষান্তর

প্রলয়পয়োধিজলে সুর

পৃথিবীর ভার নিরাশ করবার জন্য আবির্ভূত (প্রকাশিত) হয়েছে শরীর যে ঈশ্বরের, পরের মঙ্গলের জন্য যাঁর লীলা অতি সুকোমল ভাবে সূচিত, চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্র সদৃশ সেই শিবরূপী গুরুদেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিবেক আর বৈরাগ্য যাঁর ঐশ্বর্য, আকর্ণবিশ্রান্ত যাঁর চক্ষু, গলিত সূর্যকিরণের দ্বারা যাঁর গাত্র রঞ্জিত সেই চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্ররূপী শিবতুল্য গুরুদেবকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

জরাজন্ম রূপ দুঃখ যাঁর ক্ষয়িত হয়েছে, যিনি করুণ কটাক্ষপাতে নিপুন, এমন যে চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্ররূপী শিবতুল্য গুরুদেব তাঁকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

গুরুগতপ্রাণ, কামকাঞ্চন ত্যাগী, মায়াধীশের মতো কখনো প্রকাশিত, কখনো বা অপ্রকাশিত, এমন যে চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্র-রূপী শিবতুল্য গুরুদেব তাঁকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

ক্ষয়িত সপ্তম কলা চাঁদকে (আধখানা চাঁদকে) যিনি শিরে ধারণ করেছেন, যিনি জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কেন্দ্র, সেই চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্ররূপী আর শিবতুল্য গুরুদেবকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

ইতি জন্মতিথি পঞ্চক।

দ্বিতীয়াবল্লী সমাপ্ত

তৃতীয়া বল্লী

প্রথমং— **শ্রীকালিকারূপগীতিস্তোত্রম্।**

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

রক্তসুরঞ্জিত-মঞ্জীর-গুঞ্জিত-নীলনলিনী পদ যুগ্মং
পশ্যতু শিবসিতহৃদয়সমাশ্রিতমাধূতমনুপমরূপং ॥ ১ ॥
উজ্জ্বলনীল কাদম্বিনীকুন্তল-লুণ্ঠনবহুশোভমস্তং
লম্বিতনরশিরঃ কণ্ঠমালমহো করধৃতখর করবালং
চঞ্চলাপাঙ্গতরঙ্গবিরঙ্গিতানঙ্গ দহন হৃদিলীনং
নব জলদদ্যুতিকোটিলসত্তনুমিন্দুকমলদল ভাস্তং ॥ ২ ॥

তৃতীয়া বল্লী

প্রথমং— **শ্রীকালিকারূপগীতি স্তোত্র**

ভাষান্তর

বসন্তরাগযতিতাল সহকারে গাইতে হবে

রক্তরাগে রঞ্জিত নূপুর গুঞ্জনে শিঞ্জিত, নীল পদ্মের মতো চরণ-যুগল ও শিবের শুভ্রবর্ণ হৃদয়দেশ আশ্রয় করেছে এমন পরিকল্পিত নিরুপম রূপ দর্শন কর ॥ ১ ॥

উজ্জ্বল নীল মেঘমালার মতো কেশরাশি লুণ্ঠিত হয়ে অনাবিল শোভা ধারণ করেছে ; (মায়ের) কণ্ঠমালা মানুষের মস্তক গঠিত হয়ে লম্বমান ; হস্তেধৃত তীক্ষ্ণ তরবারি ; চঞ্চল নয়নের দৃষ্টিপাতে কন্দর্পদহন স্তব্ধকারী শিবের হৃদয়দেশে অবস্থিত (মা) ; তিনি আবার নূতন মেঘের কান্তি-বিশিষ্ট ; কোটি লক্ষ স্থানে শোভা পাচ্ছে যে চন্দ্র ও পদ্মদল, তৎতুল্য (মায়ের) সুশোভিত রূপ দর্শন কর ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ং— ভীমাক্ষেমা দশকম্ ।

ভীমা— অমাবস্যারাত্রৌ স্তিমিততিমিরাগ্রস্তভুবনে
স্ফুরদ্ বিদ্যুদ্দামঘনঘন ঘটাব্যাপ্তবিয়তি ।
মহাধ্বংসাশংসি প্রলয়পবনোৎ পাটিত নগে
মদোন্মত্তা কেয়ং বিচরতি খলু ভীতিরহিতা ॥ ১ ॥

ক্ষেমা— নবাম্বুদশ্যামা গলিতবসনা মুক্তচিকুরা
ক্বণৎপাদাম্ভোজা মুখরিতমদোন্মত্ত ভ্রমরা ।
সমন্তাদাপীনস্তনযুগভর স্তোক নমিতা
লসৎকান্তী হন্তি ভৃশমখিলজনভ্রান্তিনিবহান্ ॥ ২ ॥

ভীমা— মহাঘোরারাবধ্বনিতগহন ধ্বান্তগগনা
বহৎশ্বাসোচ্ছ্বাসৈশ্চলিতপ্রলয়াশংসিঝটিকা ।
প্রমচ্চন্দ্রাদিত্যগ্রহগনপথভ্রষ্টকলিতা
মহাবার্য্যা কেয়ং তরুণতপনারক্তনয়না ॥ ৩ ॥

ক্ষেমা— সমন্তাদাকৃষ্টামরবরগণস্তুতিহসিতা
বরাভীতিহস্তধ্বৃতপদনতভক্তনিবহা ।
মহাবিদ্যা চাদ্যা চিরমনবদ্যেন্দুবদনা
প্রসন্না তন্বীয়ং তপনতনয়ত্রাসনিহতা ॥ ৪ ॥

ভীমা— মহাভীমা শ্যামা বিকটদশনা দৈত্যবলহা
শিরোমাল্যাহতুল্যা নরকরকৃতালম্বিরসনা ।
বমদ্রক্তালিপ্ত নিশিত করবালোদ্যত করা
মহারৌদ্রী রুদ্রোরসি রমণরসোৎফুল্লবদনা ॥ ৫ ॥

ক্ষেমা— সুরস্তাস্তম্ভোরূর্ঘমজঘনদ্বগস্মুজমুখী
নিতম্বা শম্ভুরুকমলনিবসদ্ধাস্য মধুরা ।
মহামায়া ছায়াসমমদনহাস্যগমনা
বরাঢ্যা ব্রহ্মাদেরপি কলুষজাড্য প্রমথিনী ॥ ৬ ॥

ভীমা— হুহুঙ্কারৈরুগ্রৈঃ স্তনিতদশদিঙ্ নাগনিলয়া
শিবানাং ফুৎকারৈর্মুখরিতচিতানর্তন পরা।
প্রমত্তা দীপ্তেয়ং ত্রিভুবনতলোৎপাটনকারী
সমন্তাৎ ক্ষিপন্তী ক্ষয়িতভবজনব্যাধিবিকটান্ ॥ ৭ ॥

ক্ষেমা— অপাঙ্গাস্ফুলিঙ্গাহত মদনতনূৎসঙ্গনিবস—
জবামাল্যালম্বি শতদলদলালক্ত চরণা।
স্ফুরদ্ধাস্যা বশ্যা জিতরতিকলা জ্যোতিঃ কলনা
জগদ্‌যন্ত্রী ক্ষান্তিক্ষয়িতভবমলা শান্তিমধুরা ॥ ৮ ॥

ভীমা— গ্রসচ্চন্দ্রাদিত্যাত্মমিতবলবদ্ধ মরসনা
মহাকালী খ্যাতা নমিতহরিহর শীর্ষমুকুটা।
বিধের্বন্দ্যা সন্ধ্যা মনসি জনসঙ্ঘপ্রসবিনী
কটাক্ষাৎ ক্ষিপন্তী স্খলদযুতরবিচন্দ্রতারকান্ ॥ ৯ ॥

ক্ষেমা— মহাক্ষেমা ক্ষেমঙ্কর-হরপদ প্রান্তনমিতা
সতী লক্ষীর্লক্ষীপতি ধৃত নিজোৎসঙ্গকমলা।
দধন্ মুক্তিঃ শক্তিঃ শমিত নিখিলাসক্তিরচনা
প্রশান্তিং দেহেন্দুমতি কৃপণমহোম্মড়ুলনে ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয়ং— ভীমাক্ষেমা দশকম্

ভীমাক্ষেমাদি দশশ্লোক বিশিষ্ট স্তোত্র

ভীমা— অমাবস্যা রাত্রিতে, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে, ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণে আর মহাধ্বংসের সূচনাকারী প্রলয়কালীন বায়ুদ্বারা উন্মূলিত পর্বতশীর্ষে, মদোন্মত্তা ইনি কোন ভয়লেশ শূন্যা বিচরণ করছেন? ॥ ১ ॥

ক্ষেমা—নবজলধরের শ্যামকান্তি, বিশ্রস্তবসনা দিগম্বরী, উন্মুক্ত কেশদামে অলংকৃতা, যার পাদপদ্মের চারিদিকে মদোন্মত্ত ভ্রমরকুল গুঞ্জরণ

করছে, যার উন্নত স্তনযুগলের ভার ঈষৎ অবনত হয়েছে, যার লাবণ্য অতিশয় বিলসিত হয়েছে, এই রকম যোগ্যতাপ্রাপ্তা তিনি নিখিল জনসমূহের ভ্রান্তি সকল দূর করছেন ॥ ২ ॥

ভীমা— মহাভয়ঙ্কর শব্দ দ্বারা ধ্বনিত নিবিড় অন্ধকারের গণনা-প্রবাহের নিঃশ্বাস উদ্‌গমের দ্বারা উত্তোলিত, প্রলয়ের আশংকাকারী ঝড়ে পরিঘূর্ণিত হয়ে চন্দ্রসূর্য গ্রহগণের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মহাবীর্যবতী, উদীয়মান তপনের মতো রক্তচক্ষুবিশিষ্টা ইনি কে? ॥ ৩ ॥

ক্ষেমা—চতুর্দিকে আকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ দেবগণের স্তুতির দ্বারা হাস্যবদনা, বরাভয় হস্তযুগশালী, যাঁর পদতলে ভক্তেরা অবনত, মহাবিদ্যারূপিণী কালিকা, যিনি আদিভূতা (উৎপত্তিবিনাশ রহিতা), চিরকালের জন্য অনবদ্যরূপা, চন্দ্রাননা, প্রফুল্লা (হর্ষযুক্তা) এই তন্বী, তপনতনয় বা শনির ত্রাস নিবারণ করেন ॥ ৪ ॥

ভীমা— মহাভয়ঙ্করী, শ্যামবর্ণা, ভীষণদন্তা, দৈত্যবল-হরণকারিণী, মুণ্ডমালাভূষিতা, অতুলনীয়া, যাঁর কাঞ্চীদাম মনুষ্যহস্ত গ্রথিত, নির্গলিত রক্তে ঈষৎলিপ্ত তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে উদ্যতহস্তা, মহাভয়ঙ্করা রমণী, রুদ্রের (শিবের) বক্ষদেশে রমণজনিত রসে উৎফুল্ল বদনা হয়েছেন ॥ ৫ ॥

ক্ষেমা— উৎকৃষ্ট কদলীবৃক্ষসকলের মতো মসৃণ যাঁর উরুদেশ, যাকে তাঁর প্রগাঢ় জঘনদেশ ধারণ করে; যে নিতম্বিনী শম্ভুর (শিবের) পদ্মমুখী কমলের মতো বক্ষোদেশে বসে হসমানা আর মধুরা, যে মহামায়া ছায়ার মত মদনহন্তাকে (শিবকে) অনুগমন করেন, সেই উৎকৃষ্ট বরদায়িনী ব্রহ্মাদির অপরাধজনিত জড়তাকে বিনষ্ট করেন ॥ ৬ ॥

ভীমা— উগ্র হুঙ্কারধ্বনির দ্বারা শব্দায়মান যে দশদিগ্‌হস্তী সমূহ তাদের

যিনি আশ্রয়রূপা, শৃগালীদের চিৎকারে প্রতিধ্বনিত যে চিতা বা শ্মশানভূমি তাতে নর্ত্তনরতা, উন্মত্তা, দীপ্তিময়ী এই কালিকা, ত্রিভুবনের তলদেশ নির্মূলকারিণী হয়ে ক্ষয়িত সংসারের জনগণের ভয়ঙ্কর ব্যাধিসমূহকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ॥ ৭ ॥

ক্ষেমা—মহাদেবের দৃষ্টিকোণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আহত মদনদেবের উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) অবস্থিত জবামাল্যকে অবলম্বন করেছে যে রক্তশতদল তার দ্বারা অলক্তকচরণা, স্ফুরিতহাসিনী, রতি এবং কলাকে যিনি বশীভূত করেছেন, বিশেষ দীপ্তিশালিনী, জগতের নিয়ন্ত্রণ কর্ত্রী মাতা শান্তিমধুরা, আর ক্ষমাগুণের দ্বারা জগৎসংসারের জ্বালাসমূহ দূর করেন ॥ ৮ ॥

ভীমা— অতিবলে বলীয়ান অরশনা (অজিহ্ব) 'মহাকালী' নামে খ্যাতা, যিনি চন্দ্রসূর্যাদিকে গ্রাস করেন, বিষ্ণু ও শিবের মস্তকের মুকুট যাঁর কাছে অবনমিত, বিধির (ব্রহ্মার) বন্দ্যনীয়া সন্ধ্যার চিত্তে জনসমূহের সৃষ্টিকারিণী, মেঘমণ্ডলে যুক্ত সূর্যচন্দ্রতারকা-রাশিকে তিনি কটাক্ষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত করেন ॥ ৯ ॥

ক্ষেমা—হে মহামঙ্গলকারিণী মৃড়ললনা (মহাদেবের স্ত্রী)! শুভঙ্কর হর (শিব) তোমার পদপ্রান্তে নিপতিত ; (তুমি) সতীলক্ষ্মী, বিষ্ণুর ক্রোড়স্থিতা কমলাকে সঙ্গে নিয়ে, শক্তি আর মুক্তি দিয়ে, সমুদয় অভিলাষ ও আসক্তি উপশম করে অতি দীন ইন্দুকে * প্রশান্তি দান কর ॥ ১০ ॥

* ইন্দু—কবি শরচ্চন্দ্র

তৃতীয়ং— শ্রীকুণ্ডলিনীগীতি স্তোত্রম্।

রাগতালাভ্যাং গীয়তে।

মেরুমূলকুলকুন্তলবাসিনি! জাগৃহি জননী সুসুপ্তে
বহ্নিবায়ুযুত জৃম্ভিতচেতনা চলপথি দামিনী দীপ্তে ॥ ১ ॥
মুঞ্চ মূলাধার মহিবপূর্ব্বেষ্টিত ত্র্যম্বকলিঙ্গবিলাসং
ভিত্বা স্বাধিষ্ঠান মণিপুরানাহতমারোহ চক্রমাকাশং
দ্বিদলমুজ্জ্বলমাশু হিত্বাচল সহস্রদলরতিতৃপ্তে
মজ্জতামিন্দুমানন্দরসার্ণবে দ্বন্দ্ব তরঙ্গ বিলুপ্তে ॥ ২ ॥

তৃতীয়ং শ্রীকুণ্ডলিনীগীতি স্তোত্র

রাগতাল সহকারে গাইতে হবে।

মেরুমূল (মেরুদণ্ডের মূল) কুলকুণ্ডলে বসবাসকারিনী হে সুষুপ্তা জননী! তুমি জাগ্রতা হও। অগ্নি ও বায়ুর বেগে চেতনা লাভ করে বিদ্দ্যুদ্দীপ্ত পথে অগ্রসর হও ॥ ১ ॥

যে মূলাধারে সর্পদেহবেষ্টিত শিবলিঙ্গের বিলাস, তাকে (হে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি!) পরিত্যাগ কর। তার উপরের চক্র 'স্বাধিষ্ঠান' (নাভিস্থল), মণিপুর (হৃদয়), অনাহত (কণ্ঠ) ভেদ করে আকাশ চক্রে অর্থাৎ তালুদেশের আজ্ঞাচক্রে আরোহণ কর। উজ্জ্বল দ্বিদল চক্র (ভ্রূমধ্যদেশ) আশু পরিত্যাগ ক'রে, অচল যে সহস্রদলপদ্ম তাতে 'রতি' অর্থাৎ তৃপ্তি লাভ কর। এইভাবে দ্বন্দ্বতরঙ্গশূন্য আনন্দরসের সাগরে ইন্দুকে * নিমগ্ন কর ॥ ২ ॥

চতুর্থং— শ্রীশ্রীদেবীচরণকমলস্তোত্রম্।

অস্যুয়ন্ত্যা দেব্যাশ্চরণকমলস্তাড়য়তি য—
ললাটে ভর্ত্তারং পশুপতিমহঃ কেলিকলহে।
স্খলদ্বেণী শ্রোণীতটপ্রমথিনী যত্র পতিতা
বিলদ্বারং সিদ্ধে স্তবতু সদা নে'হতিকৃপণান্ ॥ ১ ॥

---

* ইন্দু—কবি শরচ্চন্দ্র

নখানস্যাঃ দৃষ্ট্বা ত্রিপুরদহনো মন্যুমথিতঃ
যদাক্ষিপৎ শীর্ষান্নভসি দয়িতঞ্চেন্দুমুকুটং।
প্রেমাপ্লুতা যা বৈ নিজনখমণিং দত্ত্ব তরসা
কৃতাশ্বস্তভর্ত্রী স্ফুরতু মনসি সাতিমধুরা ॥ ২ ॥
ভ্রমদ্ভক্তৈর্ভৃঙ্গৈর্মুখরিতক্বণৎ কঙ্কণপদং
গলদ্রক্তালিপ্তং নবরসঘনং ফুল্লকমলং।
সকৃদ্ দৃষ্ট্বা হিত্বা নিখিতনিয়তিকর্ম্ম কিল যৎ
ভবাম্বুধেঃ পারং চলতি মনুজস্তন্মে শরণম্ ॥ ৩ ॥

সম্পূর্ণম্।

চতুর্থং শ্রীশ্রীদেবীচরণকমল স্তোত্র

দেবীর চরণ-বিষয়ক স্তব

দাম্পত্য কেলিকলহে অসূয়াসম্পন্না (ঈর্ষান্বিতা) দেবীর যে চরণ-কমল ভর্তা (স্বামী) পশুপতিকে ললাটদেশে আঘাত করে, যে দেবীর স্খলিত বেণী সিদ্ধিশক্তিবশতঃ নিতম্বতট প্রমথিত করে (আবৃত করে) যেখানে বিলদ্বারে (বিল = গহ্বর) নিপতিত হয়, সেই দেবীর, সেই পাদপদ্ম আমাদের সর্বদা রক্ষা করুক ; (কেননা) আমরা অতি দুর্বল ॥ ১ ॥

কালিক'র নখরগুলিকে দেখে ত্রিপুরারি শিব ক্রোধমথিত হয়ে যখন নিজের অতি প্রিয় চন্দ্রমুকুট মস্তক থেকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করলেন, তখন তাড়াতাড়ি প্রেম'প্লুতা দেবী নিজের নখমণি ভর্তাকে দান করে তাঁকে আশ্বাসিত করলেন ; অতি মধুরা সেই দেবী আমাদের চিত্তে বিকশিত হউন ॥ ২ ॥

সেই চরণকমলেতে আসক্ত হয়ে ভক্তরূপ ভ্রমরগুলি মুখরিত। যে পাদে নূপুরও গুঞ্জরিত, নির্গলিত রক্তদ্বারা আলিপ্ত সেই পদ নবরসের গাঢ় এবং ফুল্ল কমলের রূপ ধারণ করেছে, সেই চরণ একবার দেখে বিধি লিখিত কর্ম ত্যাগ করে মানুষেরা সংসারসমুদ্রের পারে গমন করে ; সেই চরণপদ্ম আমার একমাত্র শরণ ॥ ৩ ॥

সম্পূর্ণ

সঙ্গীত

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত।

(১)

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর।

জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম। (গাও রে)॥
জয় কামারপুকুর, জয় জয় রঘুবীর,
চিন্ময় চেতন শালগ্রাম ॥
(বল জয় জয় রঘুবীর।)
(রামকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ) ॥ ১ ॥

বন্দি খুদিরামকুল, ত্রিকাল বিশুদ্ধমূল,
প্রভু যথা লইলা জনম্ (হায় রে)—
(দীন কাঙালের ঘরে)
(মহারাজ রাজেশ্বর প্রভু)।
কামারপুকুর মাটী, বন্দি দন্তে তৃণ-কাটি,
বাল্য-লীলা যথা সমাপন ॥ (হায় রে)—
(রামকৃষ্ণভাবাবেশে) ॥ ২ ॥

বন্দি শ্রীদক্ষিণেশ্বর, যথা প্রভু গদাধর,
নরলীলা বিস্তারের তরে। (হায় রে)—
দ্বাদশ বৎসর ধরি, কঠোর সাধনা করি,
জাগাইলা ভবতারিণীরে ॥ (হায় রে)—
(জাগো মা জাগো মা বলে)
(তোমায় যুগে যুগে জাগাইনু) ॥ ৩ ॥

বন্দি পঞ্চবটী মূল, বিল্বতরু গঙ্গাকূল,
প্রভু যথা করিলা সাধনা। (হায় রে)—

(সাধনার ধন হ'য়ে)
(পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ) ॥—
আচরি সকল ধর্ম, বুঝাইলা গূঢ় মর্ম্ম,
একব্রহ্ম কহে জীবে নানা ॥
(শিব রামকৃষ্ণ কালী) ॥ ৪ ॥

বন্দি রাণী রাসমণি, বিক্রমে সিংহিনি জিনি,
ভবানীর নায়িকা প্রধানা। (যিনি)
প্রভুর সাধন তরে, অগ্রে সুরধুনী তীরে.
মন্দির যে করিলা স্থাপনা ॥
(প্রভু আসিবেন ব'লে)
(রামকৃষ্ণ অবতারে) ॥ ৫ ॥

রামকৃষ্ণ ভক্তগণে, লীলার সহায় জেনে,
ধূলি হ'য়ে রহি তাদের পায়।
(জনমে জনমে যেন)
সবে এক এক অবতার, দেহমাত্র নরাকার,
(কেহ ব্রহ্মা কেহ বিষ্ণু)
(যুগে যুগে সঙ্গী এঁরা) ॥
বুঝিয়াছি শ্রীগুরু কৃপায় ॥ (হায় রে)—
বেলুড় মঠ মন্দিরে, স্থাপি যিনি শ্রীপ্রভুরে,
স্ব-স্বরূপে করিলা প্রয়াণ।
সে বিবেকানন্দে প্রাণ, দিয়ে 'ইন্দু' বলিদান,
(এলেন সাক্ষাৎ শঙ্কর যিনি।)
(রামকৃষ্ণ অবতারে।)
নির্ব্বাণের পথে আগুয়ান্ ॥
জয় রামকৃষ্ণ ব'লে
(প্রেমানন্দে বাহু তুলে) ॥ ৭ ॥

(২)

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ জয় ভবভয়হারী হে।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম জয় নররূপধারী হে ॥
(তুমি অবতারের জন্মদাতা) ॥ ১ ॥

কাম-কাঞ্চন-আঁধারে ধরণী ডুবিল হেরে,
(তুমি) উদিলে সূর্য, অমিত বীর্য যুগ যুগ অবতারী হে ॥
(ভবের অন্ধকার দূরে গেল) ॥ ২ ॥

এবার মহাসমন্বয়ের তরে, রামকৃষ্ণ একাধারে,
(তুমি) ডাক্‌ছো কেন, সকরুণ জগতের নরনারী হে।।
(জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে) ॥ ৩ ।

আমি শুনেছি অভয় বাণী, তুমি জগৎ চিন্তামণি,
(তাই) তোমার দ্বারে অতি কাতরে, এসেছি দীন
ভিখারী হে ॥
(দেখো যেন ফিরায়ো না) ॥ ৪ ॥

(৩

পূজক ব্রাহ্মণবেশে, কে তুমি দক্ষিণেশ্বরে।
বিলাইছ ভক্তি মুক্তি জীবে জীবে অকাতরে ॥ ১ ।
স্বরূপ গোপন করি, সেজেছ দীন ভিখারী,
তবু মন কর চুরি, করুণ নয়নে হেরে ॥ ২ ॥
বাঁধা দিলে তব বাধ্য, নইলে কি জীবের সাধ্য,
অগম্য অপাপবিদ্ধ তোমারে জানিতে পারে ॥ ৩ ॥
উঠ জীব মেলো আঁখি, রামকৃষ্ণে লহ দেখি,
কামিনী-কাঞ্চন ফাঁকি, বুঝিতে পাবে অচিরে ॥ ৪ ॥
গুরুপদ হৃদে ধরি, বলে 'ইন্দু' গর্ব্ব করি,
পর-ব্রহ্ম অবতরি—এসেছে নরশরীরে ॥ ৫ ॥

(৪)

তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম ;
তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভবিষ্ণু প্রাণারাম ॥ ১ ॥
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
তুমি নর-রূপ-ধর, বিজিত-কণক কাম ॥ ২ ॥
অপার করুণাসিন্ধু, তুমি দেব দীনবন্ধু,
যাচে 'ইন্দু'—কৃপাবিন্দু—চরণে করি প্রণাম ॥ ৩ ॥

(৫)

বাউলের সুর

জয় রামকৃষ্ণ বল।
(তোর) জীবন হবে সফল ॥ ১ ॥
কি কর মন বসি রামকৃষ্ণ সাগরেতে চল।
(কত) ব্রহ্মাবিষ্ণু তরঙ্গ তায় রঙ্গে করে মহারোল ॥ ২ ॥
রামকৃষ্ণ চিদাকাশ কোটি সূর্য সমুজ্জ্বল।
(সদা) বন্দে প্রেমানন্দে যারে রামরুদ্র মহাকাল ॥ ৩ ॥
রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম-পূর্ণপ্রেম-পরিমল।
(কত) ভক্তভৃঙ্গ রঙ্গে যাহে গুঞ্জরে হয়ে ব্যাকুল ॥ ৪ ॥
(যার) নাম নিলে, অবহেলে, মিলে চতুর্ব্বর্গ ফল।
(তাঁর) দরশ-পরশ তবে ইন্দুর প্রাণ চঞ্চল ॥ ৫ ॥

(৬)

(ওরে) রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল আমার মন।
যুগ-অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ॥ ১
জীব দুঃখেতে কাতর, ধরি নর-কলেবর
বারম্বার অবতার জগত-ঈশ্বর ;
(এবার) মাধুর্যঘন-মূরতি জিত-কামিনী-কাঞ্চন ॥
(ঐশ্বর্য-বিহীন লীলা) ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার, এলো কলাংশে যাঁহার।
স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার।*
(ওরে) চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ পাবে রে নবজীবন ॥
(কত আর ঘুমাবে জীব)
(কাম-কাঞ্চন-আবেশে) ॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়,
ভক্তি মুক্তি বিনামূল্যে কে নিবি রে আয়।
রামকৃষ্ণ ব'লে, নেও রে তুলে, যার যত ভাই, প্রয়োজন ॥
(ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) ॥ ৪ ॥

(৭)

জয় জয় কানু নবঘনতনু মৃদুমধু বেণুবাদন।
রুনুঝুনু রুনু নূপুরচরণ গোপীগণ মনোরঞ্জন ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনধন গোপিনীমোহন মাধব মধুসূদন।
রাখালজীবন রাজীবলোচন যুগে যুগে অবতারণ ॥ ২ ॥

(তুমি) নদে ধামে গোরা, প্রেম মাতোয়ারা
হরিনামে ধরা কম্পন।
প্রেম বিতরণে, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে
করিলে না কারে (ও) বঞ্চন ॥ ৩ ॥

বাকী ছিল যাহা রামকৃষ্ণরূপে করিয়ে শরীর ধারণ।
(বসি) দক্ষিণ-ঈশ্বরে, সুরধুনীতীরে তরালে পতিতপাবন ॥৪॥

কামিনী-কাঞ্চন ভাব বিসর্জন, দেখাতে লীলাপ্রকটন।
(তুমি) সবধর্ম্মসত্য বলি প্রচারিলে ধরম বিশ্বজনীন ॥ ৫ ॥

আমি ভাগ্যহীন, তাই না দেখিনু তব লীলামুনিরঞ্জন
(তব) ভক্তের-চরণ শিরে ধরি যেন লভে ভক্তি ইন্দুভূষণ ॥৬॥

* এই লাইনটি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের রচনা

শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্গীত

মহাসিংহ পরাক্রমে কে তুমি সন্ন্যাসীবর।
আক্রমিলে জ্ঞান-গুরু-গিরি-গরিষ্ঠ-শেখর॥ ১॥
ভালে দীপ্ত দিনমণি, হৃদয়ে ভক্তির খনি,
কণ্ঠে বাঁধা বীণাপাণি অদ্ভুত করমবীর॥ ২॥
অভীরভী হুহুঙ্কারে, দিক দেশ ভেঙ্গে পড়ে,
বিবেক-কৃপাণ-করে বীরদর্পে অগ্রসর॥ ৩॥
রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ, জীবন যৌবন দান,
(শুনি) অখণ্ডে তব আসন-পরার্থে নর-শরীর॥ ৪॥
তব সঙ্গ কৃপাগুণে, নিত্যমুক্ত অভিমানে,
'ইন্দু' তৃণতুল্যগণে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর॥ ৫॥

শ্রী শ্রীদেবী সঙ্গীত

(১)

হৃদয়ে চমকে আজি কেরে বামা নিরুপমা।
রূপ হেরি, লাজে মরি, সাগরে প্রবেশে রমা॥ ১॥
কমলের কোমলতা শ্রীঅঙ্গে কি হয় উপমা।
অবণ অনঙ্গ-অঙ্গ হেরি অপাঙ্গ-ভঙ্গিমা॥ ২॥
কোটী-কাম-করম্বিত উজ্জ্বল রসপ্রতিমা।
ভুরুভঙ্গে তরঙ্গিত ললাটে বালচন্দ্রিমা॥ ৩॥
আকাশে কিঞ্চিৎ ভাসে ও-রূপ গাঢ় নীলিমা।
নিতম্ব-লম্বিত-কাদম্বিনী-কেশে বাসে অমা॥ ৪॥
কমলাস্যে মৃদু হাস্য লোললাস্য ত্রিভঙ্গিমা।
দশনে দামিনী হাসে—নাশে মনের কালিমা॥ ৫॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু স্তব্ধ হ'য়ে ভেবে না পায় যাঁর মহিমা।
ভাষাতে কি পাবে ইন্দু—সে রূপসিন্ধুর সীমা॥ ৬॥

(২)

দয়াময়ী নামে তোমায়—ভক্তে ডাকে বারম্বার।
দয়ার লেশ তো পাই না খুঁজে দেখে মা তোর ব্যবহার ॥ ১ ॥
পতি বুকে পদ দিলে, সতীর কীর্ত্তি রাখিলে,
নরমুণ্ড পরি গলে—দেখালে দয়া অপার ॥ ২ ॥
প্রলয় মূরতি ধরি, নাচ গো বিশ্ব সংহারি,
সঙ্গে ফেরে মহামারী, রোগ শোক হাহাকার ॥ ৩ ॥
ধ্বংসমুখে কর লীলা, নাম তবু "সর্ব্বমঙ্গলা",
ব্রহ্মযোনী—জ্যোতির্মূলা—করালাস্যে অন্ধকার ॥ ৪ ॥

(৩)

কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেমতরঙ্গিণী, নাচিছে উলঙ্গিনী,
আসব-আবেশে হায়।
কুন্তল দল-দল চুম্বে চরণতল, মধুব্রত চঞ্চল,
ঝঙ্কারে পায় পায় ॥১॥
তুঙ্গ পয়োধরা, রঙ্গে লাস্যপরা, সঙ্গে কামধুরা,
কোটী যোগিনী ধায়।
হুঙ্কারে ঘন ঘন, কম্পিত ত্রিভুবন, শঙ্কিত দেবগণ,
শঙ্কর লোটে পায় ॥২॥
লাস্য সমুল্লাসে, চন্দ্রসূর্য্য খসে, কক্ষভ্রষ্টাকাশে,
গ্রহতারা নিভে যায়।
গভীর অন্ধকারে, বিশ্ব ব্যাপ্ত করে, সপ্ত সাগরনীরে,
মুহু ধরণী ডুবায় ॥ ৩॥
বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝঞ্চন, প্রবল প্রভঞ্জন,
বুঝি প্রলয় ঘটায়।
কোটী বিজলী-হাসি বিম্বিত ভীম অসি,
নিশুম্ভে রণে নাশি শোণিততৃষা মিটায় ॥৪॥

ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেমফুল্লাননা,
হেরি নিরভয়মনা ইন্দু পদে বিকায়।
কালীকরুণাবশে, শমনে জয়ি অনাসে,
কাটিয়ে অষ্টপাশে—মহাশিবে সে মিলায় ॥৫॥

(৪)

নাচিছে উলঙ্গিনী ষোড়শী রূপসী রঙ্গিনী।
নয়নাপাঙ্গে কোটী অনঙ্গ মহাদেবমনোমোহিনী ॥১॥
আসব আবেশে ঢল ঢল ঢল, চরণে চিকুর দল দল দল,
বিম্ব অধরে হাসি খল খল, টলমল পদে মেদিনী—
নব জলধর—অসিত-কান্তি, কুন্দদশনে দামিনী ভ্রান্তি,
দরশে পরশে পরম শান্তি—মরণ ভ্রান্তিনাশিনী ॥ ২ ॥
পীনজঘনা গুরুনিতম্বা হেরি লাজে মরে শ্রীরতিরম্ভা,
অশিথিল-কুচ-যুগল-কুম্ভা—শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী ;
চন্দ্রকিরণ ধৌত ভাল, লম্বিত গলে মুণ্ডমাল,
শ্রবণ পরশি দৃগ্ বিশাল—কটিতে নৃকরকিঙ্কিনী ॥ ৩ ॥
তরুণ-অরুণ-কিরণ-দীপ্ত, চরণ সরোজে মধুপ মত্ত,
গলিত রুধিরে তনু বিলিপ্ত, সপ্ত-ভুবন-ভাসিনী ;
নেহারি ও-রূপসিন্ধু, ডুবিছে আবেশে অধীর ইন্দু
জেনেছি তুমি যে চরম বন্ধু,
(মম) জীবনে মরণে সঙ্গিনী ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত

গোপীমনোরঞ্জন অঞ্জনগঞ্জন, আঁখিযুগ খঞ্জন মঞ্জীর বাজে পায়।
নখরে চাঁদ ভাতি, চরণসরোজে মাতি,
ঝঙ্কারে পাঁতি পাঁতি মধুব্রত উভরায় ॥ ১ ॥
পিহিত পীতাম্বরে, নবীন মেঘাম্বরে,
দীপ্ত কামিনীকরে লিপ্ত শ্যামল কায়।

কক্ষে কামকলা, বক্ষসি বনমালা,
বলিত বলাহকে বলাকাবলির প্রায় ॥ ২ ॥
ফুল্ল বিম্বাধরে, মুরলী শোভা করে,
রাগরঙ্গ ভরে, রাধা রাধা গুণ গায়।
মূৰ্চ্ছিতা মধুপুরী; উছলে যমুনাবারি,
গোপবালা সারি সারি গৃহ ছাড়ি বাহিরায় ॥ ৩ ॥
মধুর বৃন্দাবনে বেষ্টিত বামাগণে,
রসময়ী রাধা সনে দাঁড়াইয়ে শ্যামরায়।
যুগল রূপ হেরে ইন্দু সিন্ধুনীরে,
জনমের মত ডুবি, "ভাগবতী তনু" চায় ॥ ৪ ॥

কবিতা

বাঙ্গালের বাক্য ধর

গোপনে আসিলে প্রভো! হরিতে ভবের ভার।
গোপনে চলিয়া গেলে ধরা করি অন্ধকার ॥
লীলা ছলে দেহ ধরি,
জীবের কল্যাণ স্মরি,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও তুমি দয়াময়।
যখনি ধর্মের গ্লানি হয় ভবে অতিশয় ॥ ১ ॥

গোপনে ডাকিলে তব সাঙ্গোপাঙ্গ ধরাধামে।
গোপনে সাধিছে তাঁরা—তব কার্য তব নামে ॥
বুঝিবা স্বরগ শূন্য
ধরা যে দেবতা পূর্ণ,
চক্ষুষ্মান্ নেহারিছে—তাঁহাদের গতিবিধি।
সুতীব্র-তেয়াগ-ব্রত—পবিত্রতা প্রতিনিধি ॥ ২ ॥

তুফানে আগুন যেন নিমেষে যোজন ধায়,
তেমনি তোমার লীলা—ব্যাপিয়াছে এ ধরায়।
কোথা কামারপুকুর,
কোথা আমেরিকা দূর,
তব নামে হইয়াছে—একদেশ-একাকার।
কোটী কণ্ঠ বিঘোষিছে—তোমার সুসমাচার ॥ ৩ ॥

শ্রীকর-পরশে কত মহাপাপী উদ্ধারিলে।
অমৃত দৃষ্টিতে কাম-কাঞ্চন হরিয়া নিলে।
অতুল্য সাধনা-ফলে,
রেখে গেছ ভূমণ্ডলে,
তাদের কল্যাণে—যারা শ্রীপদে শরণ লবে।
হেন দয়া কোন যুগে হয় নাই—নাহি হবে ॥ ৪ ॥

তুচ্ছ তার শ্রুতিশির বেদান্ত বিজ্ঞান ন্যায়।
বারেক যে কৃপানিধে! তব কৃপাদৃষ্টি পায় ॥
রামকৃষ্ণ নাম নিলে,
আপনা আপনি ফলে,
অনন্ত শাস্ত্রের মর্ম—ইথে নাহি সন্দ আর।
করুণা করহে দেব! পরব্রহ্ম-অবতার ॥ ৫ ॥

শাস্ত্র পড়ি কণ্ঠরোধ—পিপাসায় শুষ্ক প্রাণ।
তব পদে ভক্তি দাও—রামকৃষ্ণ ভগবান ॥
না চাহি পণ্ডিত নাম,
ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম,
তব পাদপদ্মে যদি মতি থাকে সর্বদায়।
রামকৃষ্ণ নামে যদি এ পরাণ বাহিরায় ॥ ৬ ॥

তুমি নাকি লিখেছিলে শুধু আঙ্ক আঙ্ক ফলা ॥
সর্ব শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য কিন্তু তব উক্তিমালা।

পঠনে পাঠনে তাই,
বুঝি বেশী ফল নাই,
যদি সে পঠিত তত্ত্ব অপরোক্ষ নাহি হয়।
এই ত সার সিদ্ধান্ত বুঝিয়াছি সুনিশ্চয়॥ ৭ ॥

সাধুক অষ্টাঙ্গ যোগ পড়ুক বেদান্ত ন্যায়।
যার যেবা ইচ্ছা হয় ক্ষতিবৃদ্ধি নাহি তায়।
কিন্তু জানিয়াছি মনে,
রামকৃষ্ণ কৃপা বিনে,
এ কালে সহজ পন্থা আর নাহি সাধনার।
"নবাবী কালের টাকা চলে না একালে আর" ॥ ৮ ॥

দ্বাদশ বৎসর ধরি কঠোর সাধনা করি,
(যে তত্ত্ব) ঘোষিলে প্রভো! সর্ব্ব শাস্ত্র শিরে ধরি,
সে সকল মিথ্যা হ'লে,
নাস্তিকতা ভূমণ্ডলে,
অবশ্য করিবে গ্রাস—ইহাতে সন্দেহ নাই।
হে জীব! বারেক তুমি কখনো কি ভাব তাই? ॥ ৯ ॥

তাঁর শ্রীমুখের বাণী "সেই রামকৃষ্ণ আমি,
যে রাম যে কৃষ্ণ লীলা করেছিল আপ্তকামী।"
এ উক্তিটী কেন তবে,
সন্দেহ বিষয় হবে,
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য যদি নিত্য উক্তি তাঁর।
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ী যদি সে মত উদার॥ ১০ ॥

অসভ্য সুসভ্য দেশ যদি শুনি তাঁর গাথা।
হয়ে থাকে তরঙ্গিত—কোটি প্রাণে শান্তিদাতা॥
মহামেধা দার্শনিক—
মহামানী বৈজ্ঞানিক

অবাক্ হয়েছে যদি শুনি উক্তি সারবান্।
কেন তবে মিথ্যা হবে "রামকৃষ্ণ ভগবান্" ॥ ১১ ॥

"পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণ" একথা শুনিয়ে ধরা
বিদ্বেষ-রহস্য-রঙ্গে হতে পারে তোলাপাড়া।
কিন্তু হে ভাবুক জন,
বারেক কর চিন্তন,
নিরক্ষর বঙ্গবাসী কালীপূজক ব্রাহ্মণ,
সমগ্র জগৎ কেন করিতেছে আন্দোলন ? ॥ ১২ ॥

যে ভাবে যাহার ইচ্ছা ভজ ইষ্ট ভগবান্
রামকৃষ্ণ বিনে শান্তি এ সময়ে নাহি আন্।
এখনো-তো সাঙ্গোপাঙ্গ
করে নাই লীলাসাঙ্গ
রামকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা তাঁহাদের সন্নিধান।
জানিবারে অবিলম্বে হও জীব আগুয়ান ॥ ১৩ ॥

হাট ভেঙ্গে গেলে কিন্তু কাঁদিয়া জনম যাবে।
কাঁদিছে যেমন লোক স্মরি রামকৃষ্ণে এবে!
গাও রামকৃষ্ণ নাম,
ভাব তাঁয় অবিরাম,
পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণ—ইথে না সন্দেহ কর।
শান্তি পাবে—প্রাণ পাবে—
"বাঙ্গালের বাক্য ধর" ॥ ১৪ ॥

"কে তুমি"

উদ্বোধন ১৪শ বর্ষ ১৩১৮ সাল

কে তুমি দয়ার অবতার ?
দেখি নাই এ নয়নে লোকমুখে নাম শুনে
পরাণ শ্রীপদে কেন ধায় অনিবার ?

নামে আছে কি সুধা তোমার।
কে তুমি নিখিল গুণাধার? (১)

সরল বালক-মতি মায়া মুক্ত মহাযতি
কামারপুকুরে দেহ ধরিয়ে আবার
নরলীলা করিলে বিস্তার ॥
কে তুমি হে সাধনের ধন? (২)

শ্রীদক্ষিণেশ্বরে বসি ভূমানন্দ রসেরসি
ভাসালে প্রেমের স্রোতে আব্রহ্ম-ভুবন ;
কে তুমি হে পরশ রতন? (৩)

কে তুমি হে সাধক প্রবর?
পূজক ব্রাহ্মণ বেশে ভবতারিণী আবেশে
অমানুষী লীলা খেলা করিলে বিস্তার ;
দীনবেশে-রাজরাজেশ্বর। (৪)

কে তুমি পুরুষ পুরাতন?
যুগে যুগে অবতীর্ণ ধরম স্থাপন জন্য
নর দেহে আবরিয়ে স্বরূপ আপন
"জাত-ইব" হও প্রকটন? (৫)

কে তুমি হে জনম সন্ন্যাসী?
স্ত্রী মাত্রে জননী জ্ঞান ধাতু স্পর্শে মুহ্যমান
জীব দুঃখে ঝরে আঁখি কেন অহর্নিশি?
কে তুমি হে অকলঙ্ক শশী? (৬)

কে তুমি করুণা ঘনকায়?
কটাক্ষে জীবের মন, পদে কর আকর্ষণ,
সাধন ভজন হীন তোমার কৃপায়
ভক্তি মুক্তি করতলে পায়। (৭)

কে তুমি জ্ঞান ভক্তিময় ?
যোগ-কর্ম্ম-সমুচ্চয় মহাধর্ম্ম সমন্বয়
করিবারে ধরাধামে হইলে উদয়
দশ দিশি ঘোষে তব জয় ॥ (৮)

কে তুমি হে জীবে দিতে জ্ঞান
জন্ম লভি ধরাতলে, জপমালা কেড়ে নিলে
আশ্রিতের অহেতুকী কৃপা মূর্ত্তিমান।
সন্দেহ তথাপি বিদ্যমান। (৯)

কে তুমি হে ভবে প্রচারিলে,
সর্ব্ব ধর্ম্মে সত্য আছে, একেশ্বর ধরামাঝে
সর্ব্বজীবে দেখা দেন একান্তে ডাকিলে।
অনুরাগ-উপলব্ধি মূলে ॥ (১০)

কে তুমি হে প্রেমিক উদাসী
শৈব-শাক্ত-গাণপত্য সৌরী কিম্বা বিষ্ণুভক্ত,
না জানি খৃষ্টান বৌদ্ধ কিবা দরবেশী ;
বহুরূপী কে তুমি সন্ন্যাসী। (১১)

কে তুমি হে সমাধি বিলীন ?
ভাব মুখে মধু ভাবি জ্ঞান ভক্তি পরকাশি
কলি-নিশা-অবসানে তপন নবীন
উদিলে হে ঘুচায়ে দুর্দ্দিন। (১২)

দেহধারী কে তুমি চিন্ময় ?
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ময়-বপু নির্বিজিত অজেয় রিপু,
"কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে ইষ্টলাভ হয়"—
এ তত্ত্ব ঘোষিলে ধরাময়। (১৩)

কে তুমি হে দর্পখর্ব্বকারী,
না চিনিয়া বর্ণমালা ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিলা
পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ অন্ধে যায় তরি।
তব তত্ত্ব বুঝিতে না পারি। (১৪)

কে তুমি ত্রিকালদর্শী নর ?
দেখা মাত্র নিলে চিনে স্বীয় সাঙ্গোপাঙ্গগণে,
লীলায় সহায় বিশ্বনরের নির্ভর
তবলীলা বুঝিতে বিস্তর। (১৫)

সাঙ্গোপাঙ্গকে তুমি বলিলে
যেই "রাম" সেই "কৃষ্ণ" সে অধুনা "রামকৃষ্ণ"
সম্রাট-ফকীর বেশে জগতে ভ্রমিলে।
ভাগ্যবান তোমারে চিনিলে॥ (১৬)

কেবা চিনে ধরা নাহি দিলে ?
করুণ কটাক্ষ বলে যার দৃষ্টি দিলে খুলে,
অতিগুপ্ত লীলা ব্যক্ত তার মর্মস্থলে।
যুক্তি তর্কেদ্বার নাহি খোলে॥ (১৭)

কেন তব নামে ধীরে ধীরে
উঠিয়াছে মহারোল যেন সিন্ধু সকল্লোল,
দিগঙ্গনা মুখরিতা সমুদ্রের পারে
তব মূর্তি কেন পূজা করে ? (১৮)

তব নামে কেন একমন
ভেদাভেদ ভাব ভুলি হইয়াছে সিংহ বলি
মাদ্রাজী পারসী ম্লেচ্ছ যবন ব্রাহ্মণ,
সবে প্রেমে করে আলিঙ্গন। (১৯)

হেন লীলা কোথা কোন্ কালে ?
দেশকাল ব্যবধান হয়ে গেছে অন্তর্ধান

মধুময় রামকৃষ্ণ নামের হিল্লোলে
সাগরান্ত ধরাপৃষ্ঠ টলে। (২০)
দেহধারী যতেক দেবতা
গুপ্তবেশে ধরাধামে ভ্রমিতেছে তব নামে ;
যুগে যুগে বাখানিতে তোমার বারতা
তুমি অবতার প্রেরয়িতা। (২১)
তব পুণ্য লীলার দোসর
অখণ্ডে আসন যাঁর বীরেশ্বর অবতার
শ্রীবিবেকানন্দ পদে বিক্রীত কিঙ্কর
কৃপা মাগে জুড়ি দুই কর ॥ (২২)

যতিরাজ

উদ্বোধন—২৫শ বর্ষ

জীব দুঃখে দ্রবমান কে তুমি যতি প্রধান্
বিবস্বান্ ভূতলে উদয়।
নয়নে অরুণ ভাতি হৃদয় করুণ অতি,
ভীতি শূন্য—মুরতি বিস্ময় ॥
রূপে জিনি রতি পতি রসনাগ্রে সরস্বতী
বেদ বিধি বদনে বিস্তার।
বিশ্ব-প্রেম-বিপ্লাবন ধৃত শাস্ত্র প্রহরণ
প্রাণার্পণ জীবের উদ্ধার ॥
গৈরিক বসনধারী উষ্ণীষ মস্তকোপরি
দণ্ড কমণ্ডলু পদ্ম করে।
মুক্তিরূপা মূর্ত্তি ধরি পদে ধরা তীর্থ করি
কে তুমি ফিরিলে দ্বারে দ্বারে ॥

চিরশান্তি পারাবার কটাক্ষে মোক্ষের দ্বার,
খুলে দেও পদাশ্রিত জনে।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু দয়াময় দীনবন্ধু
কৃপাবিন্দু মাণ্ডি শ্রীচরণে॥
মহাসিংহ পরাক্রম ভয়ে ধায় ইন্দ্র যম,
মহাতমো নিরস্ত মিহির।
বিবেক কৃপাণ কর বীরদর্পে অগ্রসর,
পদভরে টলে শেষশির॥
মহারুদ্র অবতার অভীরভী হুহুঙ্কার
দিগদেশ কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
আসমুদ্র ধরাতল পদভরে টলমল
"উত্তিষ্ঠত" গর্জ্জন গগনে॥
বিভূতি ভূষণ কান্তি জটায় জলদ ভ্রান্তি
তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্রাবন।
"হর হর বোম্ বোম্" স্তিমিত তিমির স্তোম্
রবি সোম নিস্তব্ধ কিরণ॥
অখণ্ড মণ্ডলে পুনঃ চমকিল জ্যোতিঃ ঘন
ভূর্লোকে সঞ্চারি মহাপ্রাণ।
স্মৃতি রাখি ধরাতলে চকিতে মিশিয়া গেলে,
কাঁদাইয়া অকৃতি সন্তান॥

দুই চিত্র।

উদ্বোধন—২৫শে বর্ষ

গর্জ্জে ভৈরব ফেনিল সিন্ধু
কল্লোল রোলে বধির কর্ণ।
পর্ব্বত চূড়া লঙ্ঘি ঊর্মি
দিক দেশকাল করিছে চূর্ণ॥ ১॥

উন্মাদ বায়ু যুঝিছে রঙ্গে,
কোটী বরজ গরজে তায়।
রুদ্র উরসি তাণ্ডবপরা,
মহাকালী যেন নগ্ন কায়॥ ২ ॥

জীমুত মন্দ্রে কম্পে মেদিনী,
স্তিমিত স্তোমে গরাসে সৃষ্টি।
অস্তি নাস্তি লুপ্ত সকলি
হস্তি শুণ্ডে বরষে বৃষ্টি॥ ৩ ॥

প্রেত রুদ্র ভৈরোঁ বিমানে,
নাচে-ব্যোম ব্যোম আকাশ গর্জ্জে।
ভীরু কাপুরুষ ভয়ে মূরছিত ;
দিশি নিশি কাঁপে ডমরু তূর্য্যে॥ ৪ ॥

ভ্রষ্ট কক্ষ সূর্য্য চন্দ্র
ছোটে গ্রহতারা বেগ প্রচণ্ড।
নিবোধে নিমিখে প্রলয় দৃশ্য
মহাকাল হাতে ত্রিশূল দণ্ড॥ ৫ ॥

অভীরভী নাদে ধ্বনিল বিশ্ব
মৃতদেহে পুনঃ উঠিল স্পন্দ।
তুঙ্গ লহরী শীর্ষে নাচিছে
সন্ন্যাসী গুরু বিবেকানন্দ॥ ৬ ॥

কমল গন্ধ অন্ধ ভ্রমরা
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জি ধায়।
পূর্ণ ইন্দু প্লাবী জোছনা,
তরঙ্গে তরঙ্গে উছলি যায়॥ ৭ ॥

পীক-পঞ্চ কুজিত কুঞ্জে
উঠিছে বংশী মধুর তান।

সম্ভঃ স্ফোট পদ্ম পরাগে
ধূসরিত কেলী-বন-বিতান ॥ ৮ ॥

স্নিগ্ধ-মধুর-কোটি কমল
গন্ধ মোদিত ধরণী তল।
শীকর সিক্ত মলয় বায়ু
বহিছে মুক্ত প্রেম বিহ্বল ॥ ৯ ॥

নাহি ভীতি জরা জন্ম মৃত্যু
প্রেম বিভোলা সবি বিকাম।
ঢল ঢল ঢল তরল অক্ষি
ঝরিছে অশ্রু মুকুতা দাম ॥ ১০ ॥

দ্বন্দ্বভাব নষ্ট সকলি
নিরমান-মোহ চরণভয়।
দেহ দানব মানব মিলিত
গাইছে উচ্চে প্রেমের জয় ॥ ১১ ॥

নষ্ট ধ্বান্ত ভ্রান্তি বিরহ
শান্তি রাজিত মিলন মঞ্চে।
দিশি নিশিকাল ভেদ ভগ্ন
মগ্ন বিশ্ব প্রেম প্রপঞ্চে॥ ১২ ॥

নিরবাধ স্রোত স্নাত কমলে
রঙ্গে ভঙ্গে ব্রজ রাখাল।
নাচিয়ে নাচিয়ে ভাসিয়ে যায়
দেব গন্ধর্ব্ব ধরিছে তাল ॥ ১৩ ॥

মধ্য কমলে ব্রজরাজ সনে
কে নাচিছে ওই সন্ন্যাসী সাজ।
ঝুম ঝুম ঝুম নূপুর চরণে,
মোদেরি বুঝি বা "রাখালরাজ" ॥ ১৪ ॥

স্বামিপাদ

উদ্বোধন—২৯শ বর্ষ

ধর্ম্মবীর-কর্ম্মবীর-বীর সাধকাগ্র গণ্য,
রামকৃষ্ণ-সংঘ-মাঝে উজ্জ্বল-যতি-বরেণ্য ;
স্বামিজীর দক্ষপাণি,
গুরু কার্যে প্রাণদানি,
গভীর সমাধি মুখে করিলে মহাপ্রয়াণ।
তোমার অভাবে আজি ধরা শোকে মুহ্যমান ॥ ১ ॥

প্রশান্ত-সাগর সম গভীর হৃদয়বান,
রাগদ্বেষ-লোভশূন্য—কঠোর-কর্মী মহান্।
অপার করুণা ধার
মহাদ্বন্দ্বে নির্বিকার,
বাহ্য আড়ম্বরহীন ছিল কত কর্ম্মগতি
সাধ্যে তাই সিদ্ধি তব শ্রীকরে করিত স্থিতি ॥ ২ ॥

দেখিনি জীবনে কভু বিরক্তি বা প্রতিবাদ,
গলিত-গঙ্গার ধারা বহমান আশীর্ব্বাদ ;
হেন ভক্তি ভাবুকতা,
হেন স্নেহ প্রবণতা,
কদাচিৎ মর-লোকে দৃষ্ট হয় ভাগ্যবশে।
দেবত্ব পাইল কত তোমার পদ পরশে ॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণ-সংঘ-মঠ-আশ্রম যত যথায়,
তব প্রেমে বদ্ধ ছিল সূত্রে মণিগণ প্রায়।
শত্রু মিত্র উদাসীন
সবে তব স্নেহাধীন,
ভাগ্যবান সেই যে বা আসিল তব পরশে,
ব্যাপিল আ-বঙ্গ ধরা তব শুভ্র জ্যোতি-যশে ॥ ৪ ॥

জয়রামবাটী-মঠ-মন্দির কীর্ত্তি মহতী
ঘোষিবে তোমার নাম যতদিন সংঘ স্থিতি।
মরুভূমি সমস্থলে,
সাজাইলে জলে ফলে,
কত বিদগত প্রাণে দিলে শান্তিশীলতা।
ভুবন ব্যাপিনী কীর্ত্তি তব যে রহিল গাথা ॥ ৫ ॥

যে উদার ভাবে সংঘ বাঁধা রবে ভবিষ্যতে,
করিবে অশেষ কর্ম্ম জগতে জীবের হিতে
সে ভাবের মর্ম্মবাণী
শুনালে হ'য়ে অগ্রণী
প্রথম সংঘ সভাতে—বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে
গতবর্ষে-ন্যাসি-গৃহী-ভক্ত-সম্মিলন-দিনে ॥৬॥

শ্রীহীন হয়েছে সংঘ আজি তব অপ্রকটে
তব পূত দীপ্ত মূর্ত্তি জাগিছে হৃদয়পটে।
'উদ্‌বোধন' মঠে আজ
পড়েছে নির্মম বাজ
শূন্য হেরি দশদিশি হে যাতি! তব বিহনে।
তব পূত স্মৃতি যেন জাগ্রত থাকে মননে ॥ ৭ ॥

গুরু কার্য সাঙ্গ করি—গিয়েছ চরণে তাঁর,
বহিয়া নিয়েছ শিরে—কত ভক্তজন ভার।
শ্রীচরণ শিরে ধরি
তব পুণ্য নাম স্মরি,
এ দীন নয়ন নীরে—রচিল-প্রয়াণ-গীতি।
আশীষ অন্তিমে পাই রামকৃষ্ণ লোকে স্থিতি ॥ ৮ ।

প্রশ্নোত্তর

উদ্বোধন—২য় বর্ষ ১৩০৬ সাল

সুনীল আকাশতলে শোভে চন্দ্র গ্রহ তারা।
নীরব নির্ম্মল শান্ত জ্যোতিতে অনন্তভরা॥
যে দিকে ফিরিয়া চাই,
আদি অন্ত নাহি পাই,
কীটাণুর মত বিশ্ব অনন্তে বিলীয়মান।
এ বিশ্ব রহস্য ভেদে তবু জীব আগুয়ান॥
এ ধৃষ্টতা জগজন যখন বুঝিতে পায়।
অজ্ঞতার অন্ধকারে মর্ম্মে সে মরিয়া যায়॥
আমি কে এ প্রশ্ন তার,
সে সময় বারম্বার,
উঠে হৃদে, কেঁদে কেঁদে মর্ম্মে সে মরিয়া যায়।
তীব্র-তৃষ্ণা-শুষ্ক কণ্ঠ, কি যেন কি প্রাণ চায়॥
যে তৃষ্ণার সম্পূরণে অসীম জলধিজল,
গণ্ডূষ বলিয়া জ্ঞান, তুচ্ছ উচ্চ হিমাচল॥
লোকলজ্জা ঘৃণা ভয়,
নিঃশেষ বিলুপ্ত হয়,
ভাবমত্ত একচিত্ত—অন্য নাহি থাকে জ্ঞান।
তবে সে এ প্রশ্ন জীব ক'রে থাকে সমাধান॥
স্থির চিত্ত তবে তার হেন উপলব্ধি হয়,
আমি সে অনন্তরূপ অখণ্ড আনন্দময়॥
কুটস্থ জগতাধার
মায়াতীত নির্ব্বিকার,
চন্দ্র সূর্য তারা যথা স্তিমিত কিরণরাশি।
আমি সেই, তুমি সেই "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি"॥

মুক্তি

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ ১৩০৭ সাল

এ জীবন সমস্যার কিবা হল সমাধান,
জন্মাবধি এ চিন্তায় তীব্র তৃষ্ণাশুষ্ক প্রাণ।
সসীম মানব মতি অসীম অখণ্ডে গতি
সান্তে কেন অনন্তের প্রতিচ্ছায়া বিদ্যমান,
সুখে কেন দুঃখাভাস, অজ্ঞানে কেন বা জ্ঞান ?

জন্ম সনে মৃত্যু কেন, হাসিতে কান্নার স্বর,
আলোতে আঁধার কেন, স্বরগে নরক ডর ?
উত্থানে পতন কেন, যৌবনে বার্দ্ধক্য পুন,
এ দ্বন্দ্ব তরঙ্গাঘাতে ত্রিভুবন বিচলিত ;
দেশকাল নিমিত্ততা চক্রে সবি নিষ্পেষিত।

এ দারুণ চিন্তাভারে, হতাশ্বাস জীবকুল,
হৃদয় ভেদিয়ে তাই উঠিছে বিলাপ রোল।
শান্তি কি নাহিক তবে আসিতে যাইতে হবে
এ ভাবে কি বার বার, কলের পুতুল ন্যায় ?
তবে কি সে মুক্তিবাদ নিশার স্বপন হায় ?

না-না-শুন, আর্য্যঋষি সদুত্তরে আগুয়ান,
"তুই ভেবে জীব। তুমি কেন ক্লেশে ম্রিয়মাণ ?
একি তত্ত্ব সুমহান, অদ্বিতীয় প্রাণবান্,
বিরূপী অলীক লীলা দেখাইছে চমৎকার,
কিছুমাত্র ভেদ নাই সে তত্ত্বে তোমাতে আর।"

এ সত্যে একান্ত নিষ্ঠ সেই জন ধরা মাঝে,
জনম মরণ দুঃখ সুখ তার ঘুচিয়াছে।
চিন্তাশূন্য নিরভয় সাক্ষীরূপে সদা রয়

দ্বৈতদৃশ্য তার কাছে মরুমরীচিকাময়।
অগ্নিদগ্ধ সূত্র সম জগৎ প্রতীত হয়।

না লভিল এ সত্য যে মানব শরীর ধরি,
বৃথা তার ধর্ম্ম কর্ম্ম জীবন্ত সে আছে মরি।
হউক বেদান্তবাদী ভজুক বা দেবতাদি
অথবা করুক কর্ম যত ইচ্ছা মনে লয়;
সোহমিতি জ্ঞান বিনে কদাচ না মুক্তি হয়।

শ্মশানকালী

উদ্বোধন—২য় বর্ষ

একি! পথে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্ধকার গভীর গহন।
অমানিশা, ঘোর বিভীষিকা, দিগ্‌দেশ আঁধারে মগন ॥১॥
থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকে, বজ্র নাদে দিগন্ত কম্পিত।
দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে জীব-পান্থ, অসহায়, ভয়ে সন্ত্রাসিত ॥২॥
ঝটিকার ঘোর হুহুঙ্কার, মিশি তাহে কর্ণে দেয় তালি।
লোল জিহি, হাসে হিহি হিহি, নাচে তাহে মৃত্যুরূপা কালী ॥৩॥
বিগলিত শব অগণিত, চারিদিকে বিকট দর্শন।
রক্ত মাংস অস্থিমেদ সঙ্গে দুর্নিরীক্ষ্য শ্মশান ভীষণ ॥৪॥
ভীমবলে, প্রলয় করা অগ্নিশিখা ব্যাপিছে আকাশ।
চিতাধূম আবরিছে ব্যোম-দেবতা-দানব মহাত্রাস ॥৫॥
কত কণ্ঠে থেই থেই নাচে, ভূত প্রেত ডাকিনী-যোগিনী।
মাঝে তার ঘোর দুর্নিবার, নাচে হরহৃদি বিলাসিনী ॥৬॥
বিকবাল দৈত্য মুণ্ডমাল কণ্ঠভূসা মুখে লোহ ঝরে।
দিগম্বরী কর কাঞ্চী পরি, ভাসে খর রুধির সাগরে ॥৭॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল নয়নে, শ্বাসে বহে প্রলয় পবন।
কেন্দ্র চ্যুত হুঙ্কারে চূর্ণিত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ অগণন ॥৮॥

ভিক্ষোভিত ভূলোক দ্যুলোক, তলাতল মুহুঃ কম্পমান।
ভীমরোল, বারিধি কল্লোল, তুঙ্গগিরি চূর্ণ খান খান ॥৯॥
মূর্তিমান জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, তাপ, নিরাশ, হুতাশ ।
চারিধারে ভ্রূকুটি বিস্তারে, বিশ্বত্রাসী অট্ট অট্ট হাস ॥১০॥
বিকরাল ভীমকরবাল, চণ্ডমুণ্ড—মুণ্ড বাম করে।
বরাভয়, ভকতে নির্ভয়, সৌম্য রৌদ্র শোভা একাধারে ॥১১॥
বীর বিনে, এ তিন ভুবনে, কে সাহসে সে মূর্তি-দর্শন।
কে কখন মৃত্যু-আলিঙ্গন চাহে, দেহ করিয়ে ধারণ ? ॥১২॥
মৃত্যুভয় করেছে যে জয়, শ্যামা তার নাচে হৃদিমাঝে।
সেই বীর, হৃদয়ে তাহার মুখ শান্তি সতত বিরাজে ॥১৩॥

কালী

(স্বামী বিবেকানন্দের Kali, The Mother-এর
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত অনুবাদ)
উদ্বোধন—৪র্থ বর্ষ, ১৩০৮ সাল।

নিবেছে নক্ষত্রপুঞ্জ,
ঘনাচ্ছন্ন ঘোর ঘন ;
তরঙ্গিত, শব্দমান,
জীবন্ত আঁধার যেন।
ভীম ঘূর্ণিবায়ু মাঝে
অযুত উন্মাদকুল
সদ্য কারামুক্ত, যেন
তুলিছে ভীষণ বোল।
উন্মূলিত মহীরুহ
ভীমবেগ ঝটিকায়

সম্মুখে যা পড়ে, তাই
নিমিষে উড়িয়া যায় ॥
সমুদ্র সে মহাযুদ্ধে
মিশিয়াছে ভীম বলে ;
ছোঁয় অধোলম্বী ব্যোম
পর্বত-তরঙ্গ তুলে।
মলিন আলোক প্রভা
চৌদিকেতে প্রকাশয়—
কৃষ্ণ ধুলি ধুসরতি
মৃত্যুর সহস্র ছায়'।
মড়ক বেয়াধি দুঃখ
ছড়ায়ে ফেলিয়ে—হায়,
আনন্দে নাচিছে মৃত্যু
ঘোর উন্মাদের প্রায়
এসো মাগো ডাকিছি তোমায়
ভীমা তব নাম মাগো,
শ্বাসে তোর মৃত্যু বয় ;
প্রতি পদক্ষেপে তোর
জগৎ বিচূর্ণ হয়।
তুমি "কাল" প্রলয়রূপিণী,
এস, এস, জগৎ জননী।
সম্ভাষে বিপদ যেই
ধ্বংসে যেন নাচে হাসে,
সুখে আলিঙ্গয়ে মৃত্যু
তার কাছে মা প্রকাশে।

পূর্ব্ব-স্মৃতি

উদ্বোধন—৫ম বর্ষ ১৩১০ সাল।

কেন স্মৃতি জাগাও আমারে
সে দুর্দিন স্মরণের তরে ?
হৃদয়ের সর্বস্ব আমার,
যেদিন করিয়ে অন্ধকার
ছাড়ি গেল মরপুর না জানি সে কতদূর,-
কোথায় সে দেব কায়, আমি বা কোথায়।
গুরুদেবে আর নাহি হেরিব ধরায় !!!

স্মরণে হৃদয় ফেটে যায়,
আষাঢ়ের সায়াহ্ন বেলায়,
সুস্থকায় মঠে ফিরি,
জপমালা করে ধরি
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি
সে ঘোর নিশায়।
কোথায় চলিয়া গেলে
কারে কিছু না বলিলে,
শুধু স্বর্গলোক ভেদী সে দৃষ্টি প্রভায়
বুঝা গিয়াছিল তুমি সমাধি শয্যায়॥

জেনেছিলে যাবে সেইদিন,
তাই শ্রীমন্দিরে সমাসীন—
ধ্যানে কি চকিতে হেরি, সুকণ্ঠে সুতান ছাড়ি,
"হৃদপদ্ম কোরে আলো মা কালী আমার"
বলি শেষ মধুবাণী করিলে ঝঙ্কার॥

জেনেছিলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে
লীলা শেষ করিবে জগতে,
প্রভাতে শিষ্যের প্রতি, যজুর খেলি অনুমতি,
তাইত "সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মি" ব্যাখ্যাছলে,
মরধাম ছাড়ি যাবে বুঝালে কৌশলে ॥

কালীপূজা হৃদয়ে মনন,
পূজার নাহিক আয়োজন,
শেষ পূজা না করিলে,
একদিনও না রহিলে,
এত প্রেম এত স্নেহ মুহূর্ত্তে কাটিলে ॥
তোমার সাধের মঠে শ্রীহীন করিলে ॥

নাহি পারি যেতে সেই বিল্বমূলে আর,
বান্ধাইলে মূলদেশ যতনে যাহার।
যথায় আনন্দে বসি,
পূর্ব্ব আস্য হাসি হাসি,
গিয়েছিলে "বিল্বমূলে দেবীর বোধন,"
সেদিনের স্মৃতি মোর জাগ্রত স্বপন ॥

কত মতে এ দীনের পক্ষ সমর্থন—
করিতে, স্মরিলে হয় হৃদি বিদারণ ;
বাঙ্গাল সন্তানে লয়ে,
আহ্লাদে মগন হয়ে,
কত কি বলিতে স্নেহপ্রবণ হৃদয়,
সে দীনে কি এস প্রভো ! আর মনে হয় ?

কত শাস্ত্র, কত বেদ, কত কি ব্যাখ্যান,
শুনিয়া ধিক্কার হোত স্বীয় শাস্ত্রজ্ঞান,

শুধু রহিতাম ধ্যানে,
মুখচন্দ্র সুধাপানে,
শ্রীপদ পরশে মোর জাগিত স্মৃতি।
চিনেছিনু একদিন কে তুমি—কোথায় গতি ॥

বলিব না সে বারতা কি কাজ বলিয়ে তায়,
প্রত্যক্ষানুভূতি দিতে, শিক্ষা না ছিল কথায়।
নিজে মানি ভাগ্যবান্
ধন্য সে জনম স্থান
বিবেক আনন্দ শিষ্য জনমে যথায়।
কোটীমতি মোর গুরুভ্রাতৃগণ পায় ॥

গুরুমন্ত্র কৃপাবলে ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর ;
"মা ভৈষ বিদ্বান" কানে অনাহত বাজে মোর।
ভাবিলে দর্শন পাই,
কেমন বলিব তাই
গুরু মোর নাহি ভবে ? মিথ্যা উক্তি অসংশয়।
বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয় ॥

স্বামিজীর প্রতি

উদ্বোধন —৫ম বর্ষ, ১৩০৯ সাল।

প্রাণের আরাধ্য দেব ! পাশরি মরত ধাম
যে দেশে গিয়েছ চলি সে দেশের কিবা নাম ?
তোমার বিহনে নাথ হৃদয়ে যে বজ্রাঘাত
পড়িয়াছে আষাঢ়ের বিংশতি দিনের পর,
যম যাতনার চেয়ে সে দুঃখ যে তীব্রতর ॥ ১ ॥

সমগ্র পৃথিবী জুড়ি যে রোল উঠিল হায়।
তোমার বিহনে প্রভো! ভাষায় কি কহা যায়?
পরের কথায় যাঁর ঝরিত নয়ন ধার,
সমগ্র ভূলোকবাসী কাঁদে এবে তব শোকে
তা শুনে কেমনে স্থির রয়েছ অজ্ঞাত লোকে?॥ ২ ॥

অথবা সে লোকে বুঝি পশে না মোদের কথা
পাপপুণ্য সংসারের মায়ামোহ শোক ব্যথা।
তা হলে কি দয়াধার! আসিতে না একবার,
সান্ত্বনা গেয়ান দিতে আমা সবে পুনরায়
যথায় গিয়েছ প্রভো! নিয়ে যাও মো-সবায়॥ ৩ ॥

দেহ মন প্রাণ তব পদে করি সমর্পণ
ক্রীতদাস হইয়াছি ওহে জীবনের ধন!
তুমি কি যত্নের ধন, নররূপী ত্রিলোচন!
বুঝেছিল রামকৃষ্ণ হেরি তোমা বাল্যকালে।
আর বুঝিয়াছে তারা যাদিগকে তুমি বুঝালে॥ ৪ ॥

কেনবা থাকিবে তুমি নশ্বর জগতী তলে?
কে বুঝিল বঙ্গদেশে যথায় জনম নিলে?
ঘোর দ্বেষ ঈর্ষানলে নিয়ত যে দেশ জ্বলে,
পরের উন্নতি দেখি যথা লোকে ম্রিয়মাণ।
সে দেশে কি হতে পারে তোমার আবাস স্থান?॥ ৫ ॥

ধন্য আমেরিকা, নমি সে দেশের নরনারী
যাঁহারা তোমার নামে ফেলে নয়নের বারি।
তাঁরাই সর্ব্ব প্রথমে, চিনাইল ভবধামে,
অতুল্য প্রতিভা-তব জ্ঞানভক্তি সমন্বয়।
দেশের রতন নাহি দেশেতে আদৃত হয়॥ ৬ ॥

রূপে গুণে প্রতিভায় তপস্যায় বাগ্মিতায়
তোমার তুলনা নাহি দুইটি মিলে এ ধরায়।
যাঁর কৃপা দৃষ্টি বলে, একবার ভুলাইলে,
সে যে ক্রীতদাস হ'য়ে চরণে বিকায়ে গেছে।
প্রাণ তার তব পদে, ভবে শুধু দেহ আছে ॥ ৭ ॥

মূর্খ-পণ্ডিতেব দল দাম্ভিকতা মূর্ত্তিমান
তারা কি বুঝিবে তোমা ওহে গুরু মতিমান ?
মোদের অঞ্জন দিতে এসেছিলে অবনীতে,
পরহিতে প্রাণ দিতে দেখি নাই এই ভবে।
বলেছিলে জীবহিতে আরো লক্ষ জন্ম নিবে ॥ ৮ ॥

দেখেছে মানব শুধু কিঞ্চিৎ প্রতিভা ছটা,
কঠোর তপস্যা তব ভূলোকে জেনেছে কটা ?
জীব হিতে এসেছিলে, তপস্যার ফল দিলে,
ধন্য ধন্য অহেতুক দয়াসিন্ধো ! হে স্বামিন্ !
তব পাদপদ্মে যেন থাকে মতি চিরদিন ॥ ৯ ॥

তোমার আদর্শ ভাব হয় নাই নাহি হবে
শপথ করিয়ে বলি একথা না মিথ্যে হবে।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি, এসেছিলে আপ্তকামী,
পূর্ণ করিবারে লীলা রামকৃষ্ণ অবতারে।
আসিতে হইল ভবে অনিচ্ছায় দেহ ধরে ॥ ১০ ॥

সপ্তর্ষি নিষ্প্রভ ছিল যতদিন ছিলে ভবে।
দ্যুলোক শ্রীহীন ছিল তোমার আলোকাভাবে ॥
পূর্ণ এবে নিত্যধাম, কাঁদে কিন্তু অবিরাম,
ভূলোক বিরহে এবে ওহে চিদ্‌ঘন কায় !
কোন্ লোকে এবে তুমি—বলে দাও মো-সবায় ॥ ১১ ॥

যাইব তথায় তোমা একবার দেখিবারে,
কিছু না কহিব কথা—শুধু পদ স্পর্শিবারে।
সে ফুল্ল কমল আঁখি, শুধু একবার দেখি,
ধেয়ানে থাকিব মগ্ন না ফিরিব ভবে আর,
করুণা করহ প্রভো! ওহে ভবকর্ণধার ॥ ১২ ॥

ঘোর ঘনাচ্ছন্নাকাশে চপলার উন্মেষণ,
হেরিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিনু ফুল্লমন।
দ্বিগুণিত অন্ধকার, হেরি এবে চারিধার,
নিরাশায় শুষ্ক প্রাণ, আশ্বস্ত কর সবারে
তুমি নাই ভবধামে—স্মরিলে হৃদি বিদরে ॥ ১৩ ॥

এ জন্ম বৃথায় গেল, না সেবিনু ও-চরণ।
কাচ বলি স্পর্শমণি করিলাম অযতন।
এবে অনুতাপানলে, নিয়ত হৃদয় জ্বলে।
কেন না শ্রীপদে সদা করিলাম অবস্থান
কেন কাটাইনু কাল লভিবারে ধনমান? ॥ ১৪ ॥

সেদিন

উদ্বোধন—৫ম বর্ষ, ১৩১০ সাল।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;—
যেদিন এ দেহ ছাড়ি,
শোক মোহ পরিহরি,
স্বরূপে মিলিব পুনরায়।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ;
যবে হবে শ্বাস রোধ
জড় জগতের বোধ
লুপ্ত হবে পড়িয়ে ধরায় ;
জায়া পুত্র সহোদর,
সেদিনে করিবে হায় হায় ।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

যবে কাটি মায়া ডুরি
গুরুপদ শিরে ধরি,
ব্রহ্মলোক ভেদ করি
উঠিব কোথায় ।
নাহি যথা দেশ কাল,
মৃত্যুঞ্জয় বিকরাল,
অস্তি নাস্তি বিলুপ্ত যথায় ।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়,
যবে গুরু অস্ত্রে করি
উন্মুক্ত গগনোপরি,
গ্রহতারা লোক ছাড়ি
উঠিব ত্বরায় ।
হোয়ে আরো অগ্রসর,
গুরু শিষ্যে পরস্পর,
যবে ভেদ মিলিবে আত্মায় ॥
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

যবে ছাড়ি ত্রিসীমা মায়ার
ভবসিন্ধু হ'য়ে যাব পার ।

দেশকাল ব্যবধান,
হবে ভূমানন্দ কায় ;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ;
যবে বন্ধু পরিজন,
স্কন্ধে করি আবোহণ,
চিতাভূমে শোয়াবে আমায় ;
ভস্ম করি নর দেহ,
ফিরিবে আপন গেহ ;
নামরূপ ধুইয়ে গঙ্গায় ;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

যবে রোগ শোকের আশ্রয়
দেহ হবে পঞ্চতত্ত্বে লয় ;
যবে চিতা পুতি ধূমে,
আচ্ছন্ন করিবে ব্যোমে
হাড় মাংস খসিবে চিতায়,
অথবা কুক্কুর ফেরু
চিবাবে পঞ্জর মেরু
মাঠে ঘাটে কে জানে কে'থায় ?
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

মরণ যে স্বরগের দ্বার,
এ সিদ্ধান্ত বুঝিয়াছি সার।
আত্মচক্ষু আছি জেগে,
আহিত সংস্কার বেগে,
সুখদুঃখ, অতি দুর্নিবার,

যা হবার হোক্ গে আমার ;
কিন্তু গুরু কৃপা বলে,
কালদণ্ড অবহেলে
ভেঙ্গেছি, ভেঙ্গেছি স্বর্গদ্বার ;
ত্রিকাল যে উন্মুক্ত আমার ॥
এবে শুধু সাবহিত,
জাতবেগ চক্রমত,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিন যায় ;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়,
যবে মুক্ত ব্যোম প্রায়,
লভি অবিনাশী কায়
থাকিব জ্যোতিষ্ক স্বপ্রভায়
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়
যেদিন গগনমত,
হেথা তথা বিরাজিত,
রাজিব—ঘুচিয়ে অন্তরায়,
না থাকিবে এক ভিন্ন,
আনন্দ অপরিছিন্ন,
অহমিদমেকত্ব যথায়
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥

———

মৃত্যু

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ, ১৩০৭ সাল

কোথা যাও দ্রুত পথে পথিক প্রবীণ
ছিন্নকন্থা, জঠর জ্বালায় তনু ক্ষীণ ?
বুঝি অর্থ অন্বেষণে, চলিয়াছ ক্ষুণ্ণ মনে,
যাও, যাও, সম্মুখেতে গভীর গহন ;
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

কুবেরের প্রতিনিধি কে তুমি রাজন্,
আসমুদ্র ক্ষিতিতল করিছ শাসন ?
ধনবল, জনবল, মরকত হর্ম্যস্থল
পেয়ে সুখে আছ বুঝি ? কর কি স্মরণ
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ?

হুঙ্কারি চলিছ রণে কে ও বীরবর,
পদভরে ধরাতল কাঁপে থরথর।
ভীম অসি প্রহরণে, বধিছ আরতিগণে,
দিগ্বিজয়ী বলি তোমা বাখানে ভুবন ;
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

নব-পাত শিশু তুমি প্রভাতের তারা
অনন্ত সুখের উৎসমুখে হাসিভরা
নাহি কপটতা ভান্, পুণ্যালোকে জ্যোতিষ্মান,
নিবিবে আঁধারে ওই সুবর্ণ বরণ—
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

কত আশা যুবা তুমি সম্মুখে তোমার,
বহু শ্রম বিদ্যালাভে, ফুল্ল পরিবার,
কত অর্থ কত মান, লভিতে তোমার প্রাণ,

উধাও উতলা ; ভ্রমে কর কি স্মরণ
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

রূপ-গৌরবিনী তুমি সুকোমল কায়া
কটাক্ষে জগৎ মুগ্ধ—মূর্ত্তিমতী মায়া
ভাল বিম্ব অলকায়, চন্দ্রিমা স্তিমিত প্রায়,
ভ্রূভঙ্গে বিলোল তব আব্রহ্ম ভুবন ;—
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

স্থির বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক তুমি অভিমানী,
পঞ্চভূত ক্রীড়নক,—হেন অনুমানি ;
বায়ু বহ্নি ব্যোম জলে, সসাগরী ভূমণ্ডলে,
প্রকৃতি নিয়ম লঙ্ঘি গড়িছ নূতন।
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

মহামেধা দার্শনিক তর্কচূড়ামণি,
বাগ্মিতায়, প্রতিভায় স্তম্ভিতা ধরণী।
প্রখর গভীর দৃষ্টি, তন্ন তন্ন করি সৃষ্টি
উদ্ভাবিলে কত তত্ত্ব জগদান্দোলনে
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ।

প্রেমেকি সুকবি কে হে উধাও পরান
প্রকৃতির উরে বসি তুলিছ সুতান,
সুরসিক নবরসে প্রকৃতির ভাবাবেশে
নানা রঙ্গ ভঙ্গ কর বিশ্ব বিলোড়ন,—
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

কে এ কঠোর কস্মিন, মানি ত্যাগীশ্বর,
তুচ্ছ মুক্তি, লক্ষ জন্ম, কারুণ্য-কাতর,
দূরিতে নরের দুখ, কর্ম্মত্যাগ-পরাঙ্মুখ ?

মৃত্যুঞ্জয় তুমি ? সম্মুখেতে, হে কপট,*—
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

হে কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, স্থাবর জঙ্গম,
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা কোথায় গমন ?
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করিতেছে কি চিন্তন ?
নেহার কালের আস্যে বিকট ব্যাদন।
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ !

কে ওই বসিয়ে শুভ্র হিমাচল শিরে,
"জন্মমৃত্যুহীন আমি"—কহে দম্ভভরে
মুখে শান্তি সরলতা, পরিপূর্ণ অমিয়তা,
তেয়াগের প্রতিমূর্ত্তি, নির্ভীক হৃদয়,
শান্তিরসে আত্মতত্ত্বময়।

ত্যাগ

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ, ১৩০৮ সাল

শান্তি কোথা, বলি যথাতথা ভ্রমে জীব আপন পাশরা।
দেহভগ্ন, মন চিন্তামগ্ন তবু কেহ নহে আশা ছাড়া ॥ ১ ॥
মৃত্যুজরা, আধি ব্যাধি পীড়া, হেরি জীব তবু দৃষ্টিহীন।
বর্ত্তমান হেরে জ্যোতিষ্মান্ কামিনী কাঞ্চন রসে লীন ॥ ২ ॥
জন্মি কেন, কেন বা মরণ, কোথা যাব ক'জন ভাবয় ?
যদি ভাবে, তখনি ত ডুবে, বিজুলী জলদে যথালয় ॥ ৩ ॥

---

* অনেকে মুক্তি স্বায়ত্ত না করিয়া, জন্মমৃত্যু জয় করিয়া মনে করেন ও বলেন "আমরা মহাত্যাগী, আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করিব, আমরা মুক্তি তুচ্ছ করি।" যে মহাপুরুষ মুক্তি প্রত্যক্ষ ও ইচ্ছা করিলে মুক্ত হইতে পারেন কেবল তাঁহারি এরূপ বলা সাজে। অন্যের পক্ষে এরূপ বলা হাসির কথা।

ছলে বলে, এ ভব মণ্ডলে, কামিনী-কাঞ্চন লাভ করি।
বুদ্ধিমান্ ব'লে অভিমান জীবের, না ব্যতিক্রম হেরি ॥ ৪ ॥
বাক্যজালে, জানায় সকলে মম সম কেবা ভবে আর ?
ক্ষুধাতুর বায়স চতুর—সদা তার পূরীষ আহার ॥ ৫ ॥
প্রতিজনে শুধালে বিজনে, "সুখলাভ করেছ কি ভাই"।
মর্ম্মভেদি উঠে সেই কাঁদি—"সুখশান্তি এ সংসারে নাই" ॥ ৬ ॥
বাহিরেতে কত রকমারি যেন সুখ শান্তি নিরবধি।
ভিতরেতে বহে দিনে রেতে, তপ্তধারা বৈতরণী নদী ॥ ৭ ॥
মানমদে, কিংবা উচ্চপদে বিদ্যালাভে অথবা সুযশে।
ধনজনে, প্রিয় আলিঙ্গনে, কিছুতেই শান্তি নাহি বাসে ॥ ৮ ॥
তবে শান্তিলাভ বুদ্ধিভ্রান্তি, আস্তিকের ছল বিজৃম্ভণ ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম পুরাণ কোরান সকলি কি নিশার স্বপন ? ॥ ৯ ॥
সর্ব্বত্যাগী পরহিতে রত, মহাজন মিছা নাহি বলে।
অনুক্ষণ তোমার মতন কামিনী-কাঞ্চনে নাহি টলে ॥ ১০ ॥
সাধুবাক্য শাস্ত্রের শাসন, তাই জীব শুন একবার।
সম্মুখেতে পাও কি দেখিতে জরামৃত্যু ঘোর অন্ধকার ? ১১ ॥
ভোগে সুখ নাহি চির দুঃখ – দিনে দিনে বাড়ায় বাসনা।
ত্যাগ-ত্যাগ-মন্ত্র মহাভাগ দিবানিশি করেন সাধনা ॥ ১২ ॥
ত্যাগ বিনে—এ তিন ভুবনে শান্তি লাভ দৈব বিড়ম্বন।
বীর হিয়া, সকলি ছাড়িয়া—ভগবানে করে অন্বেষণ ॥ ১৩ ॥

লীলা

উদ্বোধন—১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

প্রশান্ত সলিল অনন্ত বারিধি,
নিবাত নিষ্কম্প নীরবে রাজে।
দিক্ দেশ কাল উপাধি বর্জিত।
উদ্ভাসিত সদা স্বকীয় তেজে॥

সর্বনিষেধের সীমান্ত প্রদেশ,
কোন বিশেষণে বিশিষ্ট নয়।
নাহি রবি, শশী, গ্রহ, তারা যথা
নাহিক সৃজন, পালন, লয়॥

কোথা হ'তে মায়া ঝটিকা ছুটিয়া,
জলধি করিল তরঙ্গময়।
দেখিতে দেখিতে নামরূপাত্মক
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয়॥

মায়াতে ব্যোমের প্রথম অধ্যাস,
ব্যোমেতে অনিল ধাইল ছুটি।
বায়ুমাঝে তেজ, তেজেতে সলিল,
সলিলে পৃথিবী উঠিল ফুটি।

দেখিতে দেখিতে কোটি-রবি শশী
গ্রহতারাগণে ছাইল 'কাশ।
দশদিশি হল জ্যোতি নিমগন,
প্রকৃতির মুখে ফুটিল হাস॥

আঁখির পলকে বারিধি উছলে
পৃথিবী হইল সলিলময়।
তেজে বিশোষিত হইল সলিল
তেজ হ'ল ক্রমে মরুতে লয়॥

ক্রমে ক্রমে কাল বিভক্ত হইল,
দিনরাত্রি পক্ষ বৎসর মাসে।
ক্রমে ক্রমে রূপে পূর্ব্বকল্প মত
ভূলোকাদি সপ্ত ভুবন ভাসে॥

বায়ু মহাব্যোমে গ্রাসিল পলকে
ব্যোম হ'ল মহামায়াতে লয়।
মায়াঝড় শান্তে প্রশান্ত সাগর
আবার যেমন তেমন হয়॥

সপ্তদীপযুতা ভাসিল মেদিনী
অন্ন ফল ফুলে শোভিল ধরা।
আকীট মানব জনমি ছুটিল
পূর্ব্ব সংস্কারের পূরণে ত্বরা॥

আর নাহি দেখি শশাঙ্ক সুন্দর
আর নাহি সেই দিনেশ তারা।
স্তিমিত সলিল স্তবধ বারিধি
পুন দেখা দিল অনাদি ধারা॥

সুখ দুঃখ জরা জনম মরণে
ধরাতল হল দুর্গম অতি।
স্ব স্বরূপ ভুলি মহামোহে গলি
হইল সকলে ভরম মতি॥

তাই বুঝিলাম অলীক এ লীলা
অলীক সৃজন পালন লয়।
এক ব্রহ্ম আছে অনন্ত জুড়িয়া,
ভ্রমে যাহা লীলা আরোপ হয়॥

নাসদীয় সূক্ত

উদ্বোধন—১ম বর্ষ, ১৩০৬ সাল

ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটীকে "নাসদীয় সূক্ত" কহে। "নাসদাসীৎ" বাক্যটি এই সূক্তের প্রথমে উক্ত হওয়ায় সূক্তটীর নাম নাসদীয় সূক্ত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি ও দেবতা পরমাত্মা। কবিত্বের সংস্ফূর্তি ও দার্শনিক গভীরতায় এই সূক্তটী জগতে অতুলনীয়। প্রজাপতি ঋষি ইহাতে মহাপ্রলয়াবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। মনের নিঃশেষলয়ে বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় জীবের যে ভাব অনুভূত হয়, তাহাও ইঙ্গিতে এ সূক্তে সূচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কবিতায় ইহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ দিতে চেষ্টা করিলাম।

সদসৎ কিছু নাহি ছিল সে প্রলয় ঘোরে;
না ছিল পৃথিবী, ব্যোম, দিগ্, দেশ তদুপরে।
কি আকৃতি ছিল তার? অবস্থিতি কোথা কার?
ভোক্তা ভোগ্য প্রবিভাগ ছিল না সুস্থির।
তবে কি সলিল ছিল গহন গভীর? । ১ ॥

মৃত্যু অমরতা কিংবা দিন রাত্রি ভেদ জ্ঞান—
না ছিল সে মহালয়ে; চন্দ্র-সূর্য্য তিরোধান ॥
অদ্বিতীয় সে মহান্, বায়ুশূন্য প্রাণবান্,
মায়া সনে অভিন্ন ছিলেন অবস্থিত।
সে আত্মা ব্যতীত কিছু না ছিল বিদিত ॥ ২ ॥

সর্ব্ব অগ্রে গূঢ় ছিল অন্ধকারে অন্ধকার;
লুপ্ত চিহ্ন ছিল সবি; —জলে জলে জলাকার।
অসতে আচ্ছন্ন দিশি, ছিল সেই সর্ব্বগ্রাসী,
অদ্বিতীয় পরমাত্মা তপস্যার বলে,
প্রকটিত করিলেন মহিমা সকলে ॥ ৩ ॥

সবার প্রথমে ইচ্ছা হয়েছিল আবির্ভূত ;
মন জন্মিবার সেই হইল কারণীভূত।
অসতে সতের সৃষ্টি, ধ্যানেতে করিয়া দৃষ্টি,
ঋষিগণ জানিলেন রহস্য সৃষ্টির ;
নিগূঢ় বিচার তাহা করিয়া সুস্থির ॥ ৪ ॥

বিতত সে রশ্মিজাল বিকীর্ণ হইল ক্রমে,
পার্শ্বে, নিম্নে, ঊর্ধ্বদিকে, পূর্ব্বসৃষ্টি সুনিয়মে।
প্রজাপতি অগণন, মহিমার বিজৃম্ভণ—
হইল, সে তপস্যার দুর্লঙ্ঘ্য নিদেশে।
ভোক্তা রহিলেন ঊর্ধ্বে, ভোগ্য অধোদেশে ॥ ৫ ॥

কেবা জানে অবিতথ সৃজনের এ বৃত্তান্ত ;
কে পারে বর্ণিতে এর কোথা আদি কোথা অন্ত।
জন্মিল বা কোথা হতে, কেন বা নানাত্ব হ'তে,
তাঁর সৃষ্ট দেবতারা জানিবে কেমনে—
কোথা হতে হল সৃষ্টি ; অন্যে কেবা জানে ? ॥ ৬ ॥

উৎপত্তি হইল কোথা ? লীলা প্রকাশিল কেবা ?
কেহ কি করে'ছে সৃষ্টি ? অথবা করেনি কিবা ?
এ প্রশ্নের সদুত্তরে, তিনি শক্ত এ সংসারে ;
পরম আকাশে যিনি প্রভু ভগবান্।
তিনি না জানিলে সৃষ্টি কেবা জানে আন্ ॥ ৭ ॥

——

নাগমহাশয়

উদ্বোধন—১২শ বর্ষ, ১৩১৭ সাল

দীনের সুদীন, ছিন্ন মলিন বসনে
আবরি উজ্জ্বল কান্তি—প্রশান্ত মূরতি,
কে তুমি হে রামকৃষ্ণ লীলার সহায়
উদিলে পূরব বঙ্গ নিভৃত কুটীরে ?
কৃপামন্ত্রে মহামায়া বন্ধন ছেদিয়ে
অসংসারী সংসারের বিচিত্রতা মাঝে।
রাজর্ষি জনক সম—বিদেহ—নিষ্কাম,
লোভশূন্য, কামশূন্য, মায়ামুক্ত যতী ॥
নমিত নয়নে নাহি মায়াজন রেখা,
ইষ্ট-সমাবিষ্ট, তবু বিস্ফার নয়নে
জ্বলন্ত পাবক শিখা জ্বলে ধিকি ধিকি।
তিতিক্ষার জিত দ্বন্দ্ব, আনন্দ-আলয়,
রামকৃষ্ণ পদে প্রাণ দিলে বলিদান।
দীনতার অবতার অদৈন্য দয়ায়।
গৃহ ধর্মে স্থির, কিন্তু কামিনী কাঞ্চন
কাল ভুজঙ্গম জ্ঞান-সমনস্ক সদা।
সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা গৃহস্থ আশ্রমে
দেখাইতে জন্ম তব এ যুগাবতারে।
দেওভোগ পুণ্য ভূমে লভিয়ে জনম
পবিত্র করিলে ধরা, শ্রীপদ পরশে ॥

—০—

ভগ্নী নিবেদিতা

উদ্বোধন—১৩শ বর্ষ, ১৩১৮ সাল

গুরু মানসপুত্রী—পবিত্র প্রতিমা,
শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনী—বিদূষী কুমারী.
ভারতের নারীকুল উন্নত করিতে—
জন্মিলে ভগিনী ! মর্ত্তে শ্রীগুরু আদেশে।
প্রাণপাতী পরিশ্রম—দুর্ভিক্ষ, মড়কে—
বিদ্যাদানে তপস্যায়—অদম্য উদ্যমা।
ধনজন আভিজাত্য ছাড়ি অবহেলে
গুরুকার্য্যে দিলে প্রাণ—পরার্থতৎপরা
গুরুকৃপারুণ করে, হৃদয় তোমার—
প্রফুল্ল কমল সম—ফুটিল গৌরবে ;
পূজাযোগ্য তাই এবে দেহবৃন্তচ্যুতা ;
অনাঘ্রাত ফুল্ল ফুল—গুরুপদে শোভে।
"নিবেদিত" জীবহিতে "নিবেদিতা" নাম।
জ্ঞানে গার্গী—পূর্ণাহুতি জীবন নিষ্কাম ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

উদ্বোধন—১৪শ বর্ষ, ১৩১৯ সাল।

বিশ্বাসের তুঙ্গ গিরি—জ্ঞানে গুরু বৃহস্পতি-
পরা ভক্তি মূর্ত্তিমান—নাট্যকার মহারথি ;
গুরুপদ ধ্যান বলে, গৃহে করি অবস্থান,
সন্ন্যাসীর উচ্চাদর্শ লভিলে পদ নির্ব্বাণ ॥

সংসারীর কাছে তুমি—মহাবুদ্ধি মহাজন,
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তব গ্যারিকের উচ্চাসন।
সাহিত্য আকাশে তুমি প্রভাতী উজ্জল তারা
লেখনী তরঙ্গ ভঙ্গে বঙ্গভূমি মাতোয়ারা ॥

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তুমি গৃহীর আদর্শ স্থান
পূজনীয় দেবতার—গুরু কৃপা মূর্ত্তিমান।
রামকৃষ্ণ পদে করি "তনমন" সমর্পণ
বকল্মার সাক্ষীরূপে কাটাইলে আজীবন ॥

বিপরীত দ্বন্দ্বভাব দেখাইতে একাধারে
এনেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি তোমা সঙ্গে করে
"ভৈরবের অবতার" ভয়শূন্য কর্ম্মবীর
শত্রু-মিত্র—উদাসীন তব কাছে নতশির ॥

বিধি নিষেধের ভাব ছিল তব ভয়ঙ্কর,
তাই বকল্মার ভার নিয়ে গুরু দিল বর
"যাহা ইচ্ছা এ জীবনে ক'রে নে নির্ভয় মনে
বিশ্বাসে হইবে পার সাধন ভজন বিনে"
গুরুবাক্য সত্য করি দেখাইলে এ জীবনে ॥

ভগবান্ রামকৃষ্ণ শ্রীপদে বিক্রীত শির
মহাশক্তি কৃপালভি "অকৃপা" যাচিলে বীর।
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান গুণাতীত ভগবান্
রামকৃষ্ণরূপে এসে উদিত জগতী তলে
চিনেছিলে দৃষ্টি মাত্র "পাঁচসিকে" বুদ্ধিবলে ॥

সংসার তাপিত তব শুনিয়ে অভয় বাণী
আশায় বাঁধিল বুক—পঙ্গু লঙ্ঘিল ধরণী
"রামকৃষ্ণ দয়াবান্ হবে নাকো সন্দিহান্"

বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণে বলিয়াছ কতবার।
"জরা-মৃত্যু মাঝে দয়াহস্ত প্রসারিত তাঁর ॥"

"অরূপ" "রূপের ঘর" হেরিয়াছ কতবার
উপলব্ধি কণা ছলে রামকৃষ্ণে নমস্কার—
করিতে দেখিছি কত   "সন্তান আমি নিন্দিত
ছিপ্‌, ভাঙ্গা ছেলে ব'লে করিয়াছে অভিমান।"
রামকৃষ্ণপদ ভব চির অভিপ্সিত স্থান।।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির ভবতারিণীর স্থান
রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠানে যথা ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান
লোকাচার্য্য নরেন্দ্রাদি   বসে যথা নিরবধি
বলিয়াছ কতবার এই মত স্বর্গ স্থান
তুলনায় ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবলোক ছাড় জ্ঞান ॥

অটল বিশ্বাস তব ছিল গুরুভ্রাতৃগণে ;
দোষগুণ বিচারের অবসর নাহি মানে।
"নিত্য-সিদ্ধ দেবগণ,   নরদেহে আগমন
করিয়াছে"—বারবার বলিয়াছ দার্ঢ্য করি।
"রামকৃষ্ণ নামে মুক্ত কি সন্ন্যাসী-কি সংসারী ॥"

অপার করুণা তব হেরিয়াছি দীনজনে
একবার রামকৃষ্ণ নাম যে নিল বদনে
গৃহীর ভরসা স্থল   প্রেম উৎস নিরমল
পথ দেখাইয়া দিল কত ভ্রান্ত পান্থজনে
ত্রিতাপ-হরণ শান্তি বারি দিলে দগ্ধ প্রাণে ।।

"ধপথে কঠোরতা" "বড় বিঘ্ন অন্তরায়"
বলিতে শুনিনু মুখে —"সরলে অভিষ্ট পায়"
আনন্দে যে ভজে ইষ্ট,   তাহে ভগবান্ তুষ্ট

কঠোরীর কাছে তিনি বহুদূর বহুবক্র
বিধিনিষেধের গণ্ডী ভেঙ্গে পায় মধুচক্র ॥

"কোন্ পথে পাব শান্তি"—জিজ্ঞাসিলে তব স্থান
বলিতে "বসিয়ে ভাই, কর রামকৃষ্ণ নাম।
ইহাতে না পাইলে শান্তি, জানি ধর্ম্ম কর্ম্ম ভ্রান্তি
রামকৃষ্ণ নাম যদি অভিষ্ট না পূর্ণ হয়
কোটি কল্প যেন মোর নিরয়ে বসতি রয় ॥"

বিশ্বাস বিস্ফার নেত্র বদনে প্রশান্ত জ্যোতি
অযুত ভাবের উৎস হৃদয়ে ইষ্ট বসতি ;
স্থূল মূর্ত্তি দীপ্তিমান দয়াধর্ম্ম দ্রবমান
শতমুখে রামকৃষ্ণ মহাম্বোধি পানে ধায়
বঙ্গের গৌরব তুমি—কোটিপতি তব পায় ॥

প্রবন্ধ

গুরু কে ?

উদ্বোধন—৪র্থ বর্ষ, ১৩০৮ সাল

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রবৃত্তিবশতঃ মার্জ্জিত সংস্কার মানবের ব্রহ্মবিবিদিসা নিরতিশয় বেগবতী। বেগবতী অনুরাগ মন্দাকিনী অযুত অনন্ত পর্ব্বত মরুভুমিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনার বেগে আপনি মহাসমুদ্রে মিলিতা। অনুরাগী আপনার বেগে আপনি উন্মাদ, আপনার গন্তব্যপথের আপনি আবিষ্কারক। এজন্য তীব্র সংস্কার অনুরাগীর গুরুকরণে প্রয়োজনাভাব। কিন্তু এ হেন তীব্র অনুরাগী জগতে বড়ই বিরল। মন্দাধিকারী নিজ সামর্থ্যে অবিশ্বাসী, তমোভাবাপন্ন, অমার্জ্জিত সংস্কার; সুতরাং পরসাহায্যে আত্মলাভেচ্ছু মানব স্বতঃই গুরুকৃপা সাহায্যপ্রার্থী। পরমাত্মা বা ঈশ্বর লাভে আত্মসাক্ষাৎকারী মানব ভিন্ন অন্য কেহই সহায় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিত-পানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'। তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত উপায়নহস্তে শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। সুতরাং যে কেহ শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তিনিই গুরুপদবাচ্য। বিবেকচূড়ামণি মুখে ভগবান শঙ্কর স্বামী বলিতেছেন, "উপসীদেদ্ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎ বন্ধবিমোক্ষনম্। শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্ম বিত্তমঃ॥' যাঁহা দ্বারা ভববন্ধনমুক্তি হয়, যিনি প্রাজ্ঞ, বেদজ্ঞ, পাপাচারবিহীন, কামরহিত ও ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সেই গুরুর উপাসনা করিবে। ইহা দ্বারাও যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেই গুরু বুঝাইতেছে। পরমাত্মা বা ঈশ্বর দর্শন বড়ই কঠিন বিষয়, সুতরাং যে সে এ বিষয়ের উপদেষ্টা হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি জীবকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, "অন্ধেনৈব নীয়মান যথান্ধাঃ"—এক অন্ধ অপর অন্ধকে

পথ দেখাইতে গেলে যেমন উভয়েই বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানী গুরু এবং শিষ্যেরও সেই দশা হয়। কোন লোক গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না; এ বিষয় বিশিষ্টরূপে বলিবার জন্য অন্যত্র শ্রুতি বলিতেছেন, "ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এব সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ"। যেহেতু প্রকৃত বুদ্ধি অব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে বহু চিন্তিত হইয়াও আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয় না। সুতরাং প্রাকৃত মানব গুরুর আসন গ্রহণের একান্ত অযোগ্য।

বৈদিক যুগে গুরুর এরূপ ব্রহ্মজ্ঞতা জ্ঞাত হওয়া যায়। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও কুলগুরু প্রভৃতি অদ্ভুত ও অবৈদিক মত ভারতবর্ষের দেশবিদেশে প্রচলিত হইয়া অধুনাতন সমাজে তাহা এক কিম্ভূত-কিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে। গন্ধর্ব তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে "আস্তিকোহ শুচির্দ্দক্ষো" ইত্যাদি বাক্যে গুরুর যে লক্ষণ করা হইয়াছে, সেরূপ গুরু তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। হয়তো অধুনাতন কুলগুরুগণের কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনেক শিষ্য করিয়া গিয়া থাকিবেন; তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে নিরক্ষর হইয়া, কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া কিরূপে সেই গুরুর আসন গ্রহণ করিতে চান—বুঝিতে পারি না। অনেক অদ্ভূত তন্ত্রে কুলগুরু প্রথার অদ্ভূত মত লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই কুলগুরু প্রথা বঙ্গদেশে যেরূপ অধিকার বিস্তার করিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তেমন বিড়ম্বনা ঘটে নাই। যখন পূর্ব সিদ্ধিপুরুষগণের বংশ-তিলকগণ জ্ঞান বা যোগাদি উপদেশে অপারগ হইয়া উঠিলেন, তখনি এক অভিনব তন্ত্র রচিত হইল, বলা হইল আমরা দীক্ষাগুরু থাকিবই; কান ফুঁকার ভারটা পিতৃপুরুষগণের কৃপায় আমাদেরই রহিল; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিষ্য অন্যত্র শিক্ষাগুরু করিতে পারেন। গুরুভক্তির অদ্ভুত উপাখ্যান পুরাণতন্ত্র ও লোকমুখে রচিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ বুঝিয়া-শুঝিয়াও সমাজের ভয়ে কুলগুরুগণের বার্ষিকের

টাকা বন্ধ করিলেন না। কেহ কুলগুরুগণের ঘোর ব্যভিচার ও অজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া গুরু অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন; অধিকাংশ লোক নাস্তিকতা অবলম্বন করিলেন। ইহাই বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

শিষ্যের একান্ত নিষ্ঠা থাকিলে যে কোন গুরু হইতে বিদ্যালাভ হইতে না পারে, তাহা নয়। কিন্তু যে একান্তনিষ্ঠ, সে বড়ই দুর্লভ। কয়জন লোক জগতে আছেন, যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি সদর্পে ঘোষণা করিতে পারেন, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি ঘরে যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়?'

অবধূতের চব্বিশটি গুরু করিবার প্রস্তাব ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরমহংসদেব বুঝাইয়া দিয়াছেন, যাঁহার নিকট যে কিছু বিষয় শিক্ষা করা যায়, তিনিই প্রকারান্তরে গুরুপদবাচ্য। এইভাবে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, চলাচল সকলই এই প্রকারের গুরু। কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে সহায়কারী ব্যক্তিবিশেষকে গুরু স্বীকার করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা না থাকায় গুরুকরণ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে আবার সে কোনমতেই গুরুপদবাচ্য নহে। পরন্তু দৃঢ় অনুরাগীর গুরু খুঁজিতে হয় না। ধ্রুবের ন্যায় অনুরাগীর নিকটে ভগবান্ সর্বদাই নারদরূপী গুরুকে প্রেরণ করিয়া ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে সেরূপ অনুরাগী জগতে একান্ত দুর্লভ।

সাধনা দ্বারা ক্রমে যদি উচ্চ হইতে উচ্চতরজ্ঞানে পৌঁছান সম্ভবপর হয় তবে গুরু হইতে গুরুন্তরে গমন করা অন্যায় হইবে কেন? যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের গুর্ব্বন্তরে গমনের প্রয়োজনাভাব, কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে সমস্ত জ্ঞান সূর্য্যের মত প্রকাশমান। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এহেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গুরুরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা গুর্ব্বন্তরে গমন করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। তন্ত্রমুখে

ভগবান সদাশিব বলিতেছেন—"মধুলুব্ধোযথা ভৃঙ্গ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরো-গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।" মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায়; জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমনি গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করিবে।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ; তাই শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের অভয়পদ প্রাপ্তি হয়। "যথা দেবে তথা গুরৌ" বলিয়া শ্রুতি গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার ফল বলিয়াছেন। এই গুরুভক্তি লাভ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট করামলকবৎ প্রতীয়মান হয়. তখন শিষ্য বলিতে পারেন, "ন গুরুর্ণশিষ্যশ্চিদানন্দরূপ শিবোঽহং শিবোঽহং।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রেমোন্মত্ততা

উদ্বোধন—৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১১ সাল

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—যত মত, তত পথ। জগতের যত ধর্ম্মমত, সকলই ঈশ্বরানুভূতিকল্পে এক একটি পন্থা মাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। তাঁহার মতে সকল মতেই যে অল্পাধিক সত্য নিহিত আছে, তাহা নহে. কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মমতই দৃঢ় বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবানে পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব সকলগুলি সমভাবে সত্য। সুতরাং কোন ধর্ম্মমতই আমাদের রুচিকর না হইলেও অন্যের উন্নতির সহায় বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তবে আমার মতে আমি চলিব এবং অন্য মত বা পথকে হেয় মনে করিব না।

প্রত্যেক মতের সার কথা ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়,—তাঁহাতে একান্ত অনুরাগ। বৈধী ভক্তির ক্রমে ঐকান্তিকতায় পরিণমিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার তাহা হয় নাই, জানিব সে ধর্ম্মজীবনের অনেক নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে।

জপধ্যান হোমপূজা প্রভৃতিতে নিষ্ঠাদ্বারা যাহার হৃদয়ে উদ্দাম অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই তাহার জপ পূজাদি পণ্ডশ্রমে পরিগণিত। কিন্তু জপ হোমাদি বৈধী গণ্ডীর ভিতর অবস্থিত না হইয়াও যাহার মন ভগবান্ লাভে নিতান্ত ঐক্যতানবৃত্তি, তিনিই জগতে বহু ভাগ্যবান। বহু শাস্ত্রান্তদর্শী উদ্ভিন্ন প্রতিভা মনুষ্যাপেক্ষা অনুরাগরঞ্জিতনেত্র ভক্তই জগতের বহু কল্যাণদায়ী হয়েন। ভগবদনুরাগের প্রবল স্রোতে তিনি বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত অনুভূতি ও অবস্থাসকল অতি সহজেই লাভ করিয়া নিজে ধন্য হন এবং অপরকে কৃতার্থ করেন। যে অনুরাগে ভগবান বুদ্ধ, স্ত্রীপুত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া নৈশ তিমিরে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, যে অনুরাগে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে অনুরাগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাসৈকতে লুণ্ঠিত কলেবরে শিশুর ন্যায় মা—মা বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইতেন, সেই অনুরাগের শতাংশের একাংশ পাইলে জীব ধন্য হইয়া যায়। কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে সকলেই পারে, কিন্তু বহু জন্মার্জ্জিত মার্জ্জিত সংস্কারাপন্ন মানব ভিন্ন অনুরাগের উদ্দাম তরঙ্গে কেহ ঐ রূপে তরঙ্গিত হয় না। শুকপক্ষীবৎ বর্ণোচ্চারণের সামর্থ্য অনেক পণ্ডিতের থাকিতে পারে। অনন্ত শাস্ত্র অনেকের জিহ্বাগ্রে এমন স্ফূরিত হইতে পারে, যাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইবে। কিন্তু এতাবৎ সত্ত্বেও যাহার ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে নাই, তাহার সমস্ত পাণ্ডিত্য বৃথা অভিমানই আনিয়া দেয়। ধন-মান-যশ-প্রভুত্ব-বিদ্যাবত্তা যদি ঈশ্বর লাভে সহায় না হইল, তবে সে সকল মানবের বিপজ্জাল মাত্র। আর ইহারা যদি ঈশ্বর লাভে কথঞ্চিৎও সহায়কারী হয়, তবে সে ধন-মানাদি বহু মানার্হ।

একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—এ জগতে ধন-মানাদি সকলই জীবিত কাল পর্য্যন্ত; কিন্তু ধ্বংস যখন অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু যখন অপরিহার্য, দেহ যখন পঞ্চত্বগত হইবেই, তখন মৃত্যুর পর আমি থাকিব কিনা, একথা জানিতে চেষ্টা করা সকলেরই আবশ্যক।

এই সন্দেহেই নচিকেতা যম সদনে বিজিজ্ঞাসু হইয়া গমন করেন।

এই সন্দেহ নিরাকরণোদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই সন্দেহের ফলেই ধীরে ধীরে ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়। সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা একটু উন্নত মানব কেবলমাত্র বিশ্বাস করিয়াই স্থির থাকে না। নিজ বিশ্বাসের মত যাহাতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপে বিশ্বাসের পরিপক্কাবস্থাতে তাহার ঈশ্বরের দর্শনতৃষ্ণা বেগবতী হয়। সে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে চায় যে, যিনি আছেন বলিয়া এতকাল বিশ্বাস করিতেছি, তিনি নিশ্চয় আছেন কিনা। এই অপরোক্ষ তীব্র তৃষ্ণার নামই অনুরাগ। এইরূপে অনুরাগ মন্দাকিনী বিশ্বাস-হিমাচল ভেদ করিয়া নানামতরূপ অযুত অনন্ত পথে অখণ্ড চিদানন্দ সাগরোদ্দেশে স্যন্দমানা। দেশকাল সর্ব্ববাধা উল্লঙ্ঘিনী, ঘৃণা-লজ্জাভয়াদি অষ্টপাশছেদিনী, গোপীকুলোদ্দামানুরাগোল্লাস মন্দাকিনীতে একবার স্নান করিলে মানব কৃষ্ণময় নবীন জীবন লাভ করিয়া যাবতীয় বিধি-নিষেধের পারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার চেষ্টাদি কামকাঞ্চন-মোহিত জীবের নিকট উন্মত্তবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু সে উন্মত্ততা বড় সুকৃতিলভ্য। যে উন্মত্ততায় জগৎ ভুলাইয়া দেয়, দেহাত্মবোধ ছিন্ন করে, সে উন্মত্ততা কে না পাইতে ইচ্ছা করে? সে প্রেমোন্মত্তের পদতলে আশ্রয় লইয়া কত লোকই না সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া থাকে।

হে জীব! সেই উন্মত্ততার সাধক হও। ঐ তোমার সম্মুখে প্রেমোন্মাদের জ্বলন্ত ছবি শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অভয় দিয়া বলিতেছেন,—নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যক্ষীকৃত হইবে—কারণ, আমি নিজ জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে মানব! বৃথা তোমার বেদাদি পাঠে শ্রম; বৃথা বিধি-নিষেধ সীমার গণ্ডীতে অবস্থান; বৃথা ধন, মান, বিদ্যা, যশের গৌরব; যদি এই দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত না হইবে—যদি মৃত্যুর ভীষণ ছায়া মরিবার আগেই সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যু লাভ করিতে না পারিলে।

প্রেমোন্মত্ততা লাভ করিয়া যে মৃত্যুজয়ী—সে বলে, কাল সহায়

মৃত্যু। আমি কি তোমায় ভয় করি? ঐ দেখ, আমায় মা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; দেহ থাক বা যাক, আমি ঈশ্বর দর্শন-স্পর্শন করিয়াছি—আমার "জাত গিয়াছে।" প্রেমোন্মাদ জন্ম মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, আবার অহেতুক দয়ার প্রেরণায় জীবের পরিত্রাণে দেহ ক্ষয় করিতেছেন। তাঁহারই পদধূলিতে দেশ-প্রদেশ তীর্থীভূত হয়। এ প্রকার প্রেমোন্মাদ জগতে কয়টা দেখা যায়? যাঁহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হন—তাঁহারাই জগতের যথার্থ উপদেষ্ট —বেদাদি প্রকাশক ব্রহ্মভাবাপন্ন—ঈশ্বরকল্প অবতার।

বদ্ধজীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারেনা বা পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে। আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করায় তাঁহাদের আচরণ কাকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। কথায় বলে, কাক বেশী বুদ্ধিমান, তাই জঘন্য পদার্থ তাহার আহার। ঐরূপ বুদ্ধিজীবীরা সত্য সত্যই কৃপাপাত্র, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় প্রেমোন্মাদ পুরুষ গত চারশত বৎসরের মধ্যে আর কেহ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন নাই। যখনই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, সনাতন ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় নির্দ্দেশে তাদৃশ মহাপুরুষের আবার অভ্যুদয় হয়। ইদানীন্তন কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে যে অনুরাগের প্রবল বন্যা, যে প্রেমোন্মত্ততা, যে মহাসমন্বয়ভাব, যে ভাব ভক্তি-জ্ঞান-ধ্যানাদির অদ্ভুত একত্র সম্মিলন দেখা গিয়াছে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য সূচনা করে। যাঁহার নামে সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরা আজ প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—যিনি নিরক্ষর পূজক ব্রাহ্মণ হইয়াও আজ আম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণের নমস্য হইয়াছেন,—তাঁহার বিষয় অনুচিন্তন। তাঁহার পূত জীবনের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা দ্বারা ভারতে কেন, সমগ্র জগতে ব্রহ্ম বিবিদিষা এবং ঈশ্বরানুরাগ শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহা আমার স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ হইতেই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

অবতারবাদ

উদ্বোধন—২৫শ বর্ষ

বেদান্তের বিশিষ্ট মত এই যে, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য বস্তু—অনাদি-অনন্ত-অখণ্ড-অব্যয় ও দেশকাল নিমিত্ততায় অপরিচ্ছন্ন। তিনি নিজ শক্তিমায়া সহায়ে যেন বহুধা পরিণত হইয়াছেন। অতএব বস্তুতঃ তিনি অপরিণামী হইলেও তিনিই আবার বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সত্ত্বান্তর স্বীকার করিলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই এক পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বভাব এবং যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, প্রতি জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও অখণ্ড চিৎসত্ত্বায় অভেদ্যভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চিৎ বা চৈতন্যসত্ত্বা যদি এক ও অখণ্ডই হয়, তবে সেই সত্ত্বায় আকীট ব্রহ্ম অখণ্ড ভাবেই অবস্থান করিতেছে; ভেদভাব কেবল মায়াশক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে।

একই মৃত্তিকায় বিভিন্ন বীজ উপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রস প্রসব করিতেছে। বিভিন্ন বীজের পৃথকত্বই বিভিন্ন রস প্রসূতীর কারণ। সেইরূপ অনাদি কর্ম্মবশে, অখণ্ড ব্রহ্মে অবস্থান করিয়াও, জীব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে; মায়াশক্তিই এই অনাদি কর্ম্মপথের প্রবর্ত্তক। আপনার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বভাব অনুভব হওয়া মাত্র এই কর্ম্ম বা জগদিন্দ্রজাল ছিন্ন হয়। ইহাই বেদান্তের মুক্তিবাদ।

এইজন্য বেদান্তে মায়াশক্তি বশে উচ্চাবচ সৃষ্টি সমর্থন হয়। সৃষ্টির দিক দিয়া দৃষ্টি করিলে এই উচ্চাবচ সৃষ্টি সমর্থন না করিয়া থাকা যায় না। ব্রহ্মের বা স্বস্বরূপের দিক্ দিয়া দৃষ্টি করিলে সৃষ্টিভানই থাকেনা—উচ্চাবচ সৃষ্টি থাকিবে কিরূপে?

এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্র (১) পারমার্থিক এবং (২) ব্যবহারিকরূপ দুইটি আপাত বিরোধী সত্তা অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ পারমার্থিকই জীবের যথার্থ সত্তা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দই জীবের স্বভাব। আর সেই

সত্তা দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধ্যস্ত হইয়া—জীবের স্বস্বরূপ বিচ্যুতিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলই ব্যবহারিক সত্তা। এই দ্বিতীয় সত্তার স্বর্গ আছে, নরক আছে। দেব মানব গন্ধর্ব্ব স্বর্গাদি লোক আছে, তলাতলাদি সপ্ত পাতাল আছে। যোগী ভোগী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই ব্যবহারিক সত্তায় অবস্থিত। পুরাণাদি মুখে যে অবতার-তত্ত্বের সমর্থন দৃষ্ট হয় তাহাও এই ব্যবহারিক সত্তায়। সুতরাং বেদান্ত মতে, উহাও মিথ্যা নহে।

শক্তির তারতম্যেই উচ্চাবচ সৃষ্টি; একথা যদি সত্য হয়, তবে মুক্তি-বলেই বা অবতারবাদ সমর্থিত হইবে না কেন? আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আমাকে কোন সময়ে আলমোড়া হইতে একখানা চিঠি লিখেন, উহাই কালে "শিবস্তোত্র" রূপে ছাপা হইয়াছে। উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বামীজি "সর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরং" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্বামীজি আলমোড়া হইতে কলিকাতায় আসিলে অবতারতত্ত্বের বীজ স্বরূপ ঐ কথা লইয়া আমার সহিত তাঁহার বহুবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সকল কথার সারাংশ এইখানে লিপিবদ্ধ করিলে আমরা অবতারবাদ সম্বন্ধে স্বামীজির মত বুঝিতে পারিব।

স্বামীজি বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মলোকের আধিকারিক পুরুষ বলিয়া যাঁহাদিগকে বর্ণিত হয় তাঁহাদিগকে অবতার বলিবার বাধা বেদান্ত শাস্ত্রেও নাই। বেদান্তমতে সগুণোপাসনার চরম ফললাভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকবাসী সকলের মুক্তি বেদান্ত সমর্থন করে। ব্রহ্মলোক যখন "অনাবৃত্তি" স্থল—তাহা হইতে যখন স্খলনের আর সম্ভাবনা নাই—তখন ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে উহাই highest ideal (সর্ব্বোচ্চ আদর্শ)। ঐ লোকের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান, আপ্তকাম, অণিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন—ইহাও বেদান্ত শাস্ত্র সমর্থন করে। অতএব দেশকালভেদে সেই লোকের এক এক আধিকারিক পুরুষ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন এবং অবতার বলিয়া কথিত হন—একথাই বা বেদান্তমত বিরোধী হইবে কেন?

আবার দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তাঁহারই অংশকলায় অন্য অবতার পুরুষ সকলের জন্ম। "এতে চাংশ কলা-পুরুষঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", "অবতারাহ্যসংখ্যেয়া" ইত্যাদি বচনে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের উৎপত্তি স্থল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণই গীতামুখে বলিয়াছেন "আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।" ঐরূপে দশাবতারের মধ্যে নির্দিষ্ট না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে সিদ্ধান্বিত হইয়াছেন এবং তিনিই গীতামুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব। ইহা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তবে সেই পরব্রহ্ম নারায়ণ, যাঁহাকে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তিনিই বা আবার এখন অন্য রূপে আবির্ভূত না হইতে পারিবেন কেন? এইজন্য দশাবতার ভিন্ন অবতার নাই ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁরা পুরাণের মর্ম্ম অবগত নহেন। আমাদের ঠাকুরকেও এইরূপে সর্ব্ব ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করার কোন দোষ দেখি না। কারণ তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যে রাম যে কৃষ্ণ হইয়াছিল সেই ইদানীং এই শরীরে।" স্বামীজি বলিয়াছেন, জীব বহু জন্মব্যাপী তপস্যার সাধন ফলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ভাবঘন সমষ্টি ঠাকুরের সমসমান হওয়া তো দূরের কথা—তাঁহার সামীপ্যলাভও, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন, তাহার জীবনে হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অবতাররূপী দেবমানব যখন জগতে আবির্ভূত হন তখন অনেক লোক তাঁহাদের দর্শনে স্পর্শনে উচ্চগতি বিনা সাধনায় লাভ করিয়া থাকে। ধর্ম্মজগতে ইহা এক অদ্ভুত রহস্য—এখানে কোন যুক্তি তর্ক থই পায় না।

স্বামীজির উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া যুক্তিবাদী দার্শনিক হয়তো বলিবেন, বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র তো পুরাণ প্রচলিত অবতারবাদ প্রত্যক্ষ

সমর্থন করে না। ঐ বিষয়ে স্বামীজির সঙ্গে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে আমার যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। আমি সেদিন বলিয়াছিলাম "যিনি দেশকাল নিমিত্ত তার গণ্ডীতে শরীর ধরিয়া আসেন তিনি পূর্ণ হইবেন কি করিয়া—পূর্ণ তো সর্বব্যাপী নিরাধার।" উত্তরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, যিনি দেশকাল নিমিত্ততার অতীত, তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবসর কোথায়? কারণ সকল যুক্তিতর্কই দেশকাল নিমিত্ততার ভিতরে। আর যিনি কার্য্য কারণের অতীত তিনি যদি, আমরা যাকে কার্য্য কারণ বলি—তার মধ্য দিয়াই দেহ ধরিয়া আসেন তবে এ বিষয়ে কোন অসংগতি দেখা যায় না—কারণ তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন কখনো সর্ব্ব-প্রিয়লোক বিধারক সেতু, অচিন্ত্য, অব্যয়—আবার কখনো মায়াশ্রয়ে সর্ব্বৈশ্রয়—সর্ব্বশক্তিমান, এই চোদ্দপোয়া দেহে অবস্থান করিয়া আপনাকে আজন্ম স্বতন্ত্র ঈশ্বর জানিয়াও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ। ভাষ্যকার এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন—"জাত ইব"। অত বড় বেদান্তবিদ্‌ও শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে সন্দিহান হন নাই।

আর এক কথা, বেদান্ত মতে সচ্চিদানন্দ সত্তা তো অখণ্ড—জীবে জীবে এই অখণ্ড অনুভূতির অভাব—তাই ভিন্নত্ব বোধ। জন্ম হইতে যদি কাহারও এই অখণ্ড সত্তা অনুভব হয়—যেমন "বামদেব" ঋষির হইয়াছিল, তাহা হইলে অবতারবাদ যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ চিন্ময়, অখণ্ড চৈতন্যের দেহ ধারণরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইতে পারে না। যদিও বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রে অবতারবাদের তেমন স্পষ্ট উক্তি দৃষ্ট হয় না। তবু শত পথে মৎস্যাবতারের উল্লেখ আছে—দেবী সূক্তে অম্ভৃন্ ঋষির কন্যাতে দেবীর আবির্ভাব কথিত হইয়াছে। আর বেদের শতশাখা যে লুপ্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার সীমা নাই। তদুপরি বেদের উক্তিগুলি পুরাণাদিতে ঐ সাধারণ নিয়মগুলিই বিস্তৃত ভাবে উক্ত হইয়াছে। এইজন্য শাস্ত্র বা যুক্তিমতে অবতারবাদ অসঙ্গত হয় না।

স্বামীজির এই সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি ও শাস্ত্রবাদীর ভাবিবার বিষয়। তবে একথাও ঠিক যে অবতারবাদ সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক স্থলে অনেক সম্প্রদায় যুক্তিবিরোধী বেদমন্ত্রাদি উল্লেখ করিয়া বুদ্ধিমানের নিকট হাস্যাস্পদ হন। শেতাশ্বতর শ্রুতির "ত্বং হ কুমারো উত বা কুমারী" মন্ত্র দ্বারা কোন সম্প্রদায়কে অবতারবাদ সমর্থন করিতে দেখিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের "শুক্লরক্তস্তথাপীতঃ" শ্লোকের বৈয়র্থ সম্পাদন দ্বারা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার সমর্থন চেষ্টা বৈষ্ণব ভাষ্যে দর্শন করিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারগণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে আধুনিক সম্প্রদায় সকলেও ঈশ্বর অলীক কল্পনা দৃষ্ট হয়—যাহা যুক্তিবাদী স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন। স্বামীজির মতে ঈশ্বরকে "স্বতন্ত্র" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অবতারবাদ সমর্থনে আর কোন শাস্ত্র প্রমাণ উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন হয় না—সংযুক্তিই ঐ বিষয়ে যথেষ্ট প্রামাণ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

উক্ত প্রসঙ্গে স্বামীজি এক সময়ে আমাদিগকে আর একটি কথা নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন—

"কয়েকশত বৎসর পরে হয়তো একবার ভগবানের অবতার হয়—আজকাল কিন্তু শুনে এলেম একমাত্র ঢাকা অঞ্চলেই পাঁচটী অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। উহার কারণ কি জানিস্—ভগবান যখন জীবের প্রতি করুণায় নর-শরীর ধারণ ও অপূর্ব্ব লীলাবিলাস করিয়া অন্তর্হিত হন তখন অনেকে প্রতিষ্ঠা ও নাম যশাদির জন্য অবতার বলিয়া আপনা-দিগকে প্রচার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, যুগে যুগে ঐরূপ False prophet আসিয়াছে। এবার ভগবান যে সত্য সত্যই রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে তাঁর তিরোভাবের পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য প্রদেশে অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। অথচ এবার নিরক্ষর ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।"

৺কাশীতে অবস্থানকালে পূজনীয় তুরীয়ানন্দ স্বামীর সঙ্গে আমার

একদিন সান্ধ্যভ্রমণকালে অবতারবাদের কথাবার্ত্তা হয়,—উহা প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। তিনি অবতারবাদ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন—তাহা এই। বলিলেন, "দেখ একটি অণুপরিমাণ বটবীজে এত বড় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ থাকিতে পারে বা হইবে একথা হাজার যুক্তিতেও বুদ্ধিস্থ করা যায় না; কিন্তু এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে লাখো লাখো বীজ হয় ইহার ধারণা সহজ। চোদ্দপোয়া মানবদেহে তেমনি পূর্ণ ভগবান্ থাকিতে পারেন—বা অবতীর্ণ হন্ একথা সহজবোধ্য নহে—প্রভু যাহাকে কৃপা করিয়া বুঝান সে-ই বুঝিতে পারে। কিন্তু এই বিরাট সৃষ্টি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে বিশ্বাত্মা ভগবান অনুস্যূৎ হইয়া আছেন বা ইহার কারণরূপী কর্ত্তা হইয়া অবস্থান করেন ইহা সামান্য বুদ্ধি বালকও বুঝিতে পারে। সেইজন্য অবতারবাদ বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অপেক্ষাও কঠিন বিষয়। তবে ভারতবর্ষের লোকেরা এটা অনেকটা বুঝিতে পারে তাহার কারণ বহু পুরুষ হইতে হিন্দুরা এই অবতারবাদের মীমাংসা করিতে যাইয়া থই পান না।"

অবতারবাদ সম্বন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখের কতকগুলি উক্তি শুনা যায়। তিনি বলিতেন, "জ্যোতির্ম্ময় অপার ব্রহ্ম সাগরের তীরে কত শত জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষ আছে। তার এক একটি বৃক্ষে থলো থলো রাম, থলো থলো কৃষ্ণ ফলে আছে—তার এক একজন এসে জগতে এত কাণ্ড করে গেছেন।" আবার বলিতেন—"এক পুকুরে ডুব দিয়ে এক ঘাটে উঠে কৃষ্ণ হলেন। আবার ডুব দিয়ে ও-ঘাটে উঠে ক্রাইষ্ট হলেন।" কখন বলিতেন (নিজের শরীর দেখাইয়া), "এবার মা দেখাচ্ছেন এখানে পূর্ণ বিকাশ"—আবার কখনও বলিতেন—"যেই রাম যেই কৃষ্ণ—এবার সেই রামকৃষ্ণ।" এই সকল কথা আমরা ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদগণের প্রমুখাৎ অবগত আছি। যিনি সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ ছিলেন—ভ্রমেও যাঁহার শ্রীমুখে সত্য বই মিথ্যা কথা বাহির হয় নাই তাঁহার অবতার তত্ত্ব বিষয়ক উক্তিসকল আমরা নিঃসন্দেহ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে অবতার বলিয়া অনেকের নিকট বলিতেছেন

শুনিয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন—ও আর কি বেশী বলবে, আগে কত বিদ্বান সাধু ষড়দর্শনে সুপণ্ডিত এসে ও-কথা বলে গেছে। আবার কখন কখন বলিতেন—"এবার খুব গোপনে আসা জীবৎকালে অল্প-লোকে টের পাবে," আবার কখন বলিতেন "অবতার তাঁর কর্ম্মচারী, এবার সে খোদ এসেছে।"

স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীর তলায় যাইতে যাইতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। আর নিজদেহ দেখাইয়া উত্তর-পশ্চিমাস্যে অবস্থানপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, মা বলছেন এর বিষয় যে যত ভাববে—সে তত ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব শীগ্‌গির বুঝতে পারবে"—আর উত্তর-পশ্চিম কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—"আবার ঐদিকে আসতে হবে—তখন জ্ঞানলাভ করিতে কেউ বাকী থাকবে না।"

ঠাকুরের অবতারত্বে কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাহাতে আমাদের কিছু ইষ্টাপত্তি নাই। তবে একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় যে যদি অবতারবাদ—পুরাণ শাস্ত্র যাহা বহুধা সমর্থন করে—সত্য হয় তবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার না বলিয়া থাকিবার উপায় নাই। শাস্ত্র যুক্তি ও শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির উক্তি ইহার প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে।

স্বামীজি শরীরে অবস্থানকালীন ঠাকুরের ভক্তগণকেও ঠাকুরের উপর বিশ্বাস সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেন। এখানে একটি কথা স্মরণ হইতেছে। ইটালীর পূজনীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এই গল্পটি আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভক্তগণের আনন্দের হাট বসিয়াছে, তখন একদিন স্বামীজি, দেবেনবাবু ও আর দু' একটি ভক্ত সন্ধ্যার পর পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা যাইতেছিলেন। কার্ত্তিক মাস—আকাশ পরিষ্কার। মাথার উপর ছায়াপথ (Nebula) স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। স্বামীজি দেবেনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওহে, তোমরা যে মানুষকে ভগবান ভগবান

বলছো, সেই ভগবান কি, কেমন শক্তিসম্পন্ন তা জান কি? ঐ যে আকাশের গায়ে ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে, ও থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বেরুচ্ছে—আর মুহুর্মুহু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পেয়ে যাচ্ছে। এই অচিন্ত্য অপার শক্তির আধারে—যাহা কেহই বুদ্ধিতে ধারণা করতে পারে না, তাকেই শাস্ত্রে ভগবান বলছে। আর তোমরা কিনা এই চোদ্দপোয়া দেহী বিশেষে সেই ভগবান সত্তা আরোপ কচ্ছ?" দেবেনবাবু আমায় বলেছিলেন, যে নরেনের কথা শুনে তিনদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এমন অসোয়াস্তি বোধ হইয়াছিল যে আহার নিদ্রা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। চতুর্থ দিনে তিনি গিরীশবাবুর বাড়ী যান। গিরীশবাবু তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া ব্যাপার জানিতে চাহেন। দেবেনবাবুর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া গিরীশবাবু বলিলেন—"এই কথার জন্য তুমি এত বিষণ্ণ হ'লে কেন? তুমি এখনই নরেনকে বলে এসো যে, যে বিরাট শক্তি থেকে এই কোটি কোটি জগৎ বেরুচ্ছে ও লয় পাচ্ছে, সেই পূর্ণ বিরাট শক্তিই মানবদেহে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ন্যায় সংসারতপ্ত জীবকে উদ্ধার করেন—মানুষের মত হ'য়ে না এলে—আমাদের মত সুখ দুঃখ না বুঝলে—আমরা কেহ কোন কালেই ভগবৎ সত্তা অনুভব কর্ত্তে পাত্তুম না—বিশ্ব নিয়ন্তার ইহাই অপার করুণার নিদর্শন—এইরূপ করুণাময় মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন জগতে ধর্ম্মের বন্যা আসে, পাষাণ হৃদয় গলে যায়—ভক্তি মুক্তি সুগম হয়।" দেবেনবাবু আমায় বলেছিলেন, "গিরীশবাবুর কথায় যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল —আমি উন্মত্তের ন্যায় ছুটে সিমুলেয় স্বামীজির কাছে উপস্থিত হলাম।" গিরীশবাবুর সিদ্ধান্ত শুনে স্বামীজি অতিশয় আহ্লাদ অনুভব করে বলেছিলেন—"সাধে কি ঠাকুর জি, সির পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস বলেন?" যাহা হউক গল্পের সারাংশ ইহাই যে ভগবান্ "অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম—স্থূল হইতে ও স্থূল।

স্বামীজি ৺ঠাকুরকে কখন কখন "কপালমোচন" বলিয়া তাঁহার শিষ্য-

গণের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঐকথা প্রথমে আমরা তেমন বুঝিতে পারিতাম না। স্বামীজি বিভিন্ন সময়ে আমাকে ও স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিয়াছেন যে, "ঠাকুরের ইচ্ছায় ও কৃপা-দৃষ্টিতে জীবের জন্ম-জন্মান্তরের ভোগ অথবা তাহার কপালে অদৃষ্টে যাহা কিছু লেখা থাকে তাহা মুহূর্তে খণ্ডিত হইয়া যাইত। আহা! তোরা তখন এলিনি! এখন আমি তোদের কি কর্ত্তে পারি?" আমি ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তাহাতে জিদ করিয়া বলিয়াছিলাম, "এখন আপনিই আমাদের কপালমোচন।" তাহা শুনিয়া স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "আমার কিসে শক্তি আছেরে বাপু? তবে আমি তোদের আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—ঠাকুর তোদের কৃপা করুন—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।" ঠাকুরের সম্বন্ধে স্বামীজির ধারণা নিম্নে কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।

"এবার পূর্ণ ঐশীশক্তি কেন যে রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাদের পরবর্ত্তী ভক্ত ও দার্শনিকগণ তাহার বিচার করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বতোপূর্ণা মহাশক্তি আর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সর্ব্বমত সামঞ্জস্যকর পথই আধুনিক ভারতের কল্যাণকর। এতদ্‌ভিন্ন অন্য অন্য মতের অভ্যুদয় হইতেছে বা হইবে, তাহা এদেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।"

শ্রীভগবান এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে নরশরীরে আগমন করিয়া প্রধানতঃ কি কি বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বলিতেন প্রভু কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা ত্যাগের আদর্শ পুরুষরূপে অবস্থান করিয়া বুঝাইয়াছেন, "ত্যাগ ধর্ম্মই ভারতের আদর্শ ধর্ম্ম।" যেখানে ত্যাগ নাই সেখানে ধর্ম্মের স্থান নাই। "প্রেয়" পথে চলিলে ব্যক্তি ও স্বজাতি অধঃপাতে যাইবেই—এবং তদ্বিপরিত "শ্রেয় পথে" অথবা ত্যাগ পথে চলিলে ব্যক্তি ও জাতির ধ্বংস কখনই হইবার নয়। সেই জন্যই প্রভু কামকাঞ্চন বর্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া এবার নরদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বামীজি বলিতেন, ঠাকুর "ত্যাগীর বাদশা" ছিলেন।

ইদানীন্তনকালে ভারতে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে—তাহাদের পশ্চাতে দুই-একজন ত্যাগী-পুরুষ আছেন বলিয়াই যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যাইতেছে। যেখানে ত্যাগ নাই ভোগ আছে—সেখানে না আছে ঐহিক, না আছে পারত্রিক উন্নতি। প্রভু এই অবতারে কায়মনবাক্যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, "হে ভারত! তুমি ত্যাগধর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। পাশ্চাত্ত্যের প্রেয় প্রলোভনের আদর্শে জীবন ও জাতি গঠনে চেষ্টা করিয়া প্রাচ্যভাব ধ্বংস করিও না। ত্যাগ ও তপস্যা সহায়ে যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হও; ইহপরকালে তোমার সর্ব্বথা উন্নতি হইবে।"

সাধন বিষয়েও ঠাকুরের জীবনের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, "অনুরাগই ইহযুগে প্রধান সাধন—যে মত বা পথ ধরিয়াই তুমি অগ্রসর হও না কেন।" ঠাকুরের জীবনের যে উদ্দাম অনুরাগের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার কোটী ভাগের এক ভাগ পাইলে মানুষ ধন্য হইয়া যায়। তিনি শরীরপাতী অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন দ্বারা ভারতকে বুঝাইলেন, "হে ভারত! অগ্রে ঈশ্বরকে অনুরাগপথে সাক্ষাৎ করো, তারপর সাধনভজন যে মতে যে পথে ইচ্ছা করিতে পারো।" আরও বুঝাইলেন—"সকল মত সকল পথই ঈশ্বরে পহুঁছিবার বিভিন্ন রাস্তা মাত্র—বাদ-বিসম্বাদের অবসার নাই—মত পথ পাইয়া কেহ কখনো কাহারো সঙ্গে বিবাদ করিও না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলে নিজ নিজ আদর্শ পথে চলিয়া বুঝিয়া লও যে তোমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান। বাদ-বিসম্বাদ করিয়া "মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না।"

ঠাকুরের জীবনাদর্শে বুঝা যায়, ইহযুগে মাতৃভাবে উপাসনা দ্বারাই প্রবল আত্মরিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—অন্য কোন সাধন সহায়ে প্রশমিত হইবার নহে। মাতৃভাবের এমন আদর্শ জগতের ইতিহাস পুরাণের কুত্রাপি আর দৃষ্ট হয় না। ঠাকুরের জীবন দেখিয়া তাই মনে হয় মাতৃভাবের উপাসনাই ইহযুগের প্রধান সাধন।

আর এক কথা, ঠাকুর যেন নিজ জীবন আমাদের সম্মুখে ধরিয়া

বলিতেছেন, "হে ভারত! তুমি ভাবের ঘরে চুরি করিয়া চালাকী দ্বারা কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা করিও না—তাহা হইলে লক্ষ্যে পৌঁছান দূরে থাকুক বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে। আর যদি মনমুখ এক করিয়া কার্য্য করিয়া যাও তাহা হইলে সিদ্ধি তোমার করামলকবৎ অবস্থান করিবে।

এক্ষণে আর একটি কথার আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথাটি ইহাই, এক যুগাবতারের নামে ভারতে একটি বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে কিনা? এই বিষয়ে লাহোরে অবস্থানকালে স্বামীজির একটি উক্তি, যাহা আমি আমার গুরুভাই স্বামী শুদ্ধানন্দের মুখে অবগত হইয়াছি, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। তদানীন্তন আর্য্য-সমাজের নেতা লালা হংসরাজের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামীজির নানা প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এবং কথায় কথায় স্বামীজি তাঁহাকে বলেন, "দেখুন আমার হাতে এমন শক্তি আছে যাহা দ্বারা আমি জগতের এক-তৃতীয়াংশ নরনারীকে এক পতাকার নীচে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারি। কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহা আমার করিবার ইচ্ছা নাই, কারণ তাহা হইলে আমার গুরুদেব প্রবর্ত্তিত "যত মত তত পথ" এই মহা সমন্বয় বাক্য খণ্ডিত হইয়া ভারতে একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে।" ঠাকুরের নামে পাছে কালে কোন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে এইজন্য স্বামীজি বেলুড় মঠ নির্ম্মিত হবার পর ঠাকুরের বর্ত্তমান আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া পূজা করিতে দেন নাই। তখন রেশমী রুমালে অঙ্কিত একটি ওঙ্কার টাঙাইয়া রাখা হইত এবং তাহারই পূজা হইত। পরে স্বামীজি একদিন রাত্রে কি একটা vision দেখিয়া পরদিন নিজ হস্তে আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া দেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সেই ছবিই পূজা হইতেছে। এই ঘটনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামীজিও ভয় করিতেন পাছে সম্প্রদায়হীন ঠাকুরের নামে কালে আবার ভারতে একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়া ওঠে। কিন্তু একথা বলিতে হয় যে, আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ঠাকুরের ভক্ত সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বুঝিতে

পারিয়াছি ঠাকুরের মহাসমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক ভাব এখনও পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছে। কিন্তু কে বলিবে, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের তিরোভাবের পরে ঐ উদার সমন্বয়ভাব ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিবে কিনা! এবং কালে ঠাকুরের নামে ভারতে এক সম্প্রদায় বিশেষ গড়িয়া উঠিবে কিনা।—প্রকৃতির নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য। সময়ে মত-পথাদি সংকীর্ণ হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম; এরূপ না হইলে দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের পুনঃঅবতরণের আবশ্যকতাও আর থাকে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, রাম ও কৃষ্ণাবতারে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল—পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বুদ্ধাবতারের আবির্ভাবে ভারতবর্ষেও জ্ঞেয় জগতের সর্ব্বত্র যে তুমুল ধর্ম্ম আন্দোলন উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সঙ্ঘ গঠন ও শিল্প স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ ও চৈত্য-বিহারাদি স্থাপিত হইয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; ভগবান শ্রীচৈতন্যাবতারে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া যে উদ্বেল প্রেমের বন্যা উঠিয়াছিল তাহা সমগ্র ভারতবর্ষকে অল্পাধিক ভাসাইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারে যে মহাসমন্বয়বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে—যে জাগরণের বার্ত্তা দেশদেশান্তরে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে এরূপ আর কোন সময়ে হয় নাই—একথা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এমন জ্ঞান ভক্তি-যোগ-কর্ম্মের সমন্বয়, যাহা গীতা মুখে শ্রীভগবান্ একদা অর্জ্জুনকে উপদেশ করেন—পরন্তু, যাহা কালে এক মানব কর্ত্তৃক কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা এই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গীতা শাস্ত্রোক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ গীতা শাস্ত্র কেন—ঘোর গহন তন্ত্র-শাস্ত্র সাধন সমূহ ভগবান এই অবতারে স্বয়ং সাধনা করিয়া ইহাদেরও প্রত্যক্ষ সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় কোন সাধনাই এবার প্রভু নিজ শরীরে না করিয়া যান নাই। যদি ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধাদি মতবাদীগণ কখনো এক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া ভাই ভাই বলিয়া একে অন্যকে

আলিঙ্গন করিবার সুযোগ পায় তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত দ্বারাই তাহা সুসিদ্ধ হইবে, নতুবা বুদ্ধিভেদী "শুদ্ধি", ক্ষণিক উত্তেজনামূলক "স্বরাজ্যনীতি", বা সাধনহীন "সভ্যগণ" দ্বারা সহৃদয়মূলক একতা সংসাধিত কখনই হইবার নহে। এইজন্য আমরা ভারতের জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ী মতের আলোচনা করিতে এবং তাঁহার দিব্যাদর্শে জীবন গঠন করিতে আহ্বান করিতেছি। প্রভুর জীবন অনুধাবন করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি— এইজন্য আমরা জগতের যাবতীয় নরনারীকে তাঁহার সুসমাচার প্রদান করিয়া তাঁহাদের জীবনকেও ধন্য ও সফল করিতে পরামর্শ প্রদান করিতেছি। যাঁহার কর্ণ আছে তিনি শ্রবণ করুন—যাঁহার হৃদয় আছে তিনিই এই যুগাবতারে বিষয় অনুভব করুন।

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাপনমস্তু।

পাপ-পুণ্য

উদ্বোধন—২য় বর্ষ

পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব লইয়া জগতে বড়ই বিবাদ-বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে যাহা পুণ্য বা ধর্ম্ম, দেশান্তরে কালান্তরে এবং পাত্রান্তরে তাহাই আবার পাপ বা অধর্ম্ম। অনাদি কাল হইতে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগী মত চলিয়া আসিতেছে; নিঃশেষ বিলয় পর্য্যন্ত এ বিবাদের মীমাংসা হইবে কি না বলিতে পারি না।

আমাদের ধর্ম্ম-ভিত্তি শ্রুতিতেও বিধি নিষেধাজ্ঞা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৈদিক ঋষিগণকেও সংহিতা ভাগে অনুতাপ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যজ্ঞভাগে তো কথাই নাই, নিগম শীর্ষে বেদান্ত শাস্ত্রেও বিধি নিষেধাদেশ রহিয়াছে। জৈমিনি দর্শনের প্রতিছত্র বিধি-নিষেধের আজ্ঞানুবর্ত্তী। বস্তুতঃ কি বৈদিক যুগ কি দার্শনিক যুগ, কি পৌরানিক বা তান্ত্রিক যুগ, সর্ব্বকালেই বিধি-নিষেধ বিচারিত

হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতেই পাপ-পুণ্য বা ধর্মাধর্ম অল্পাধিক বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে যাহা বিধ্যর্থক তাহা করাই পুণ্য; যাহা নিষেধার্থক, তাহা করাই প্রত্যবায় বা পাপ। পূর্ব মীমাংসা দর্শনে, যাহা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের পরিস্ফুট ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এই বিষয় বিশেষ রূপে বিচারিত হইয়াছে। বৈদিক পণ্ডিত বলিতেছেন, উদাত্ত স্বরের স্থানে অনুদাত্ত বা স্বরিত পাঠ হইলেই তোমার মুণ্ডপাত হইবে; যেহেতু জিজ্ঞাসা করিলেই বলিবে "যথেন্দ্রশত্রু স্বরতোপরাৎ"। মীমাংসক বলিবেন, উডুম্বুর শাখা বস্ত্রে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ষোড়শীযাগ করিলে নরকে যাইয়া অশীতি সহস্র বৎসর বাস করিতে হইবে। নৈয়ায়িক বলিবেন, আমার ষোড়শ পদার্থ জ্ঞান না হইলে তোমার দুঃখ নিবৃত্তি হইবে না; এইরূপ সাংখ্য, বৈশেষিক পাতঞ্জল, বৌদ্ধ, আর্হত, পাণিনীয় ও অন্যান্য দার্শনিক নানা বিধান ও নিষেধের দুই রাজ্য স্থাপন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি চঞ্চল করিয়া দিতেছেন। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত খৃষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মমত, খুঁটিনাটি বিষয়ে অনৈক্যে ঘোরতর স্বর্গনরকের দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই এক একটি অদ্ভুত মত দৃষ্ট হইতেছে; হয়তো একটা অনাচার করিয়া অদ্য তোমার ধর্মমতে তুমি চতুর্দ্দশ পুরুষ সহিত নরকাগ্নিতে পড়িয়া গেলে; কিন্তু কল্য যদি তুমি একবার তুলসী গাছ ছোঁও, বা একবার ঈশা বা হরি নাম কর, তোমার সকল পাপ চলিয়া যাইবে। স্বর্গের দূত তোমাকে খৃষ্ট বা বিষ্ণুলোকে লইয়া যাইবে। পতনও যেমন চক্ষের নিমিষে সাধিত হয়, উত্থানও তেমনি। তাই সময় সময় মনে হয় ধর্ম্মরাজ্যে এ সকলের গূঢ় রহস্য কি! ভাবিয়া ভাবিয়া এ বিষয়ে দুই একটি কথা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যাক্, পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সার্বভৌমিক কোন সংজ্ঞা হইতে পারে কিনা। যদি পারে, তবে তাহার প্রতিকূলে কোন

দোষ স্থাপন করা যাইতে পারে কিনা এবং অবশেষে সে দোষ পরিহার করিয়া, আমাদের সংজ্ঞা দোষলেশশূন্য মনে করা যাইতে পারে কিনা। ইহাই এ প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়।

পাঠকগণ সকলেই জানেন যে এ সংসারে পাপের (তাহা যে পদার্থই হোক না কেন) তুলনায়ই পুণ্য শব্দ বোধগম্য হয়। পুণ্যের তুলনায় আবার পাপ বুঝা যায়। জগতে কেবল পুণ্য থাকিলে আমাদের পাপের ভার আসিত না। তেমনি কেবল পাপ থাকিলে পুণ্য বলিয়া কোন পদার্থের আভাস থাকিত না। সুতরাং পাপ পুণ্য উভয়ের আপেক্ষিক (Relative)।

বেদান্তবাদী বলেন, পাপ-পুণ্য উভয়ই অধ্যাসিক; আত্মজ্ঞানে এ উভয়েরই অন্ত হয়। তিনি গীতা প্রমাণ দেখাইয়া বলেন,—"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"—তাই বলিয়া তিনি পাপ-পুণ্যের বিচার না করেন নাই। তিনি বলেন, আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে ইহাদের অধ্যাসিক বন্ধনে থাকিতেই হইবে। তবে বেদান্তবাদী একথা বলিয়াছেন, পুণ্য পাপ যখন আপেক্ষিক তুলনা ভিন্ন বুঝা যায় না, তখন ইহার কোনটিকেই আদি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। উভয়ই অনাদি; কিন্তু সান্ত, "ন পুণ্যং ন পাপং" ইত্যাদি। আমাদের দেশীয় স্মৃতিতে, পুরাণ শাস্ত্রে এবং ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্মগ্রন্থে যে অনবচ্ছিন্ন সুখ-স্থান-স্বর্গের বর্ণনা বা অনবচ্ছিন্ন দুঃখ-স্থান নরকাদি বর্ণনা আছে, বৈদান্তিক তাহা যুক্তির ক্ষুরধারে শতধা কর্ত্তন করেন। তিনি বলেন, কেবল সুখের বা কেবল দুঃখের কল্পনাই হইতে পারে না। কারণ উভয় স্থানেই আপেক্ষিক তুলনার অভাব। বেদান্ত মতে সেজন্য পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম বা সুখ দুঃখের সমষ্টি চিরকাল একই আছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তাহাদের অল্পাধিক স্ফুরণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

খৃষ্টানরা বলেন, আদম ইভ প্রথমে মহাপবিত্র ছিলেন। সর্বরূপী শয়তান (মূর্তিমান পাপ) তাহাদিগকে ছলনা করিয়া জগতে পাপ

আনিল। সে অবধি জগতে পাপের প্রসার হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে, খৃষ্টানদিগের—ঈশ্বর এবং শয়তান অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান আছেন। তবে আদম ইভের বেলায় তাহাদিগকে কেবল পবিত্র বলিয়া বর্ণনাটা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বুঝা যাইতেছে না। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মমতে পাপ-পুণ্যের দুই দেবতা (ঈশ্বর ও শয়তান বা ইলীবিশ) অনাদিকাল হইতেই ঘোর যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেবাসুর যুদ্ধও এই পাপ-পুণ্য যুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া কিনা, পাঠকগণ বিবেচনা করিতে পারেন। বুদ্ধজীবনে মায়ের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধও এই পাপ পুণ্যের প্রভুত্ব মূলক যুদ্ধ কিনা বলিতে পারি না। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, সকল মতেই এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাপ-পুণ্য অনাদিকাল হইতে সংগ্রামে অবতীর্ণ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি জীবনে এই ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এ উভয়ই অনাদি।

গুরুমুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, "পুণ্যং পরোপকারোতঃ পাপং চ পরপীড়নং।" কথাটা একদিন একটু তলাইয়া ভাবিয়াছিলাম। পরের উপকার করিতে হইলেই স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর পীড়া দিয়া নিজের স্বার্থ বাড়াইতে হয়। ইহাই তো জগতের নিয়ম। সুতরাং সেদিন মনে হইল নিঃস্বার্থ কার্য্যই পুণ্য, স্বার্থপর কার্য্য মাত্রই পাপ। পরের জন্য ভাবিলে ক্রমে ক্রমে স্বার্থ বিস্মৃতি ঘটে, অবশেষে দেহাত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। গীতা মুখে নারায়ণ এ তত্ত্বই বোধ হয় শিক্ষা দিয়াছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমি পরের জন্য স্বার্থ বিসর্জন দিব কেন? বেদান্তী উত্তরে বলিতেছেন, তাহা তোমারই উপকারের জন্য—নিজের মুক্তি সাধন জন্য; ক্ষুদ্র আমিত্বের বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য। উপযোগবাদী (utilitarian) বলিবেন, সমাজস্থিত লোকের অন্যান্য সহায়তা দ্বারা তুমি তোমারই সুখ বাড়াইতেছ। তবে সে পরার্থ-ব্রতকেই ত সুখ বা পুণ্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাহার বিপরীত ভাব বা স্বার্থ-তৎপরতাকেই পাপ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

গুরুমুখে আর একদিন শুনিলাম, "দুর্ব্বলতাই পাপ, পুরুষতাই পুণ্য।" সেদিন এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। যেদিনই হৃদয়ের দুর্বলতা অনুভব হয়, সেদিনই তো নানা প্রলোভনের নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া পড়িতে উন্মুখ হই। শরীরের শক্তি কমিলে, আবার মনের শক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসে। সেইজন্য ভাবিলাম, শারীরিক দুর্ব্বলতাও প্রকারান্তরে পাপের পরিপোষক। হৃদয়ে বল থাকিলে সহস্রবর্ণ বাসনার নিকটেও সদর্পে দণ্ডায়মান থাকা যায়; পাপের প্রলোভনে আত্মরক্ষা করা যায়। দুর্ব্বলচিত্ত লোক কাম-ক্রোধাদি ব্যসনের লীলাভূমি। দুর্বল লোক ব্যসনের বেগ ধারণে অক্ষম। এখানে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা যাইতে পারে; পুরাণোক্ত বান, বলি, রাবণাদি মহাশক্তিসম্পন্ন হইয়াও ঈশ্বরে যুদ্ধে পরাজিত নরক পাতিত শয়তান, ভীষণ অগ্নিজ্বালায় পীড়িত হইয়াও, তবে পাপী বলিয়া গণ্য হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে যখন বান, বলি, রাবণাদি ইহ জগতেই সর্ব্বভোগ করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের ভোগাবস্থায় তাহাদিগকে পাপী বলা যাইবে কেন? ভোগাদিলাভও তপস্যালব্ধ পুণ্যেরই বিপরিণাম। মহাপুণ্যবলেই তাহারা সময় সময় দেবতাদিগের উপরেও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু সময়ক্রমে তাহারা যখনই দুর্বল ও শ্লথবিশ্বাসী হইলেন, তখনই তাহাদের পতন, তখনি তাহারা পাপী বলিয়া গণ্য হইলেন। নরক পতিত হইবার পূর্বে শয়তানকে. কে শয়তান বলিয়া জানিয়াছিল? ঈশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইবার পরই সে শয়তান আখ্যা পাইল। তখন অবধিই সে দুর্বলতা ও ক্লীবতা রাজ্যের রাজা হইল।

গুরুমুখে আর এক দিন শুনিলাম. স্বাধীনতাই পুণ্য; অধীনতাই পাপ। তখন বুঝিলাম, ইহা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়-পক্ষেই প্রযুজ্য হইতে পারে। যিনি মনদ্বারা কামক্রোধাদির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইহাদের অনধীন হইয়াছেন, তিনি পুণ্যবান বই কি! আর যিনি ইহাদের দ্বারা নির্জ্জিত হইয়াছেন, তিনিই পাপাচারের হস্তে কাষ্ঠ পুত্তলিকা হইয়া পড়িয়াছেন। যিনি কোন বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী নন্ তাঁহার

ন্যায় সুখী আর এ জগতে কে হইতে পারে? প্রতিপদে যিনি পরাধীন, তাঁহার আত্মস্বরূপ লাভের আর উপায় আছে কি? প্রতিপদে সে পাপী। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্যক্তিগত বা জাতিগত অধীনতাও কি পাপের ফল? অল্পাধিক পাপের ফল বই কি। তবে যে রাজা দেশ জয় করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁহার অধীনে অনেকটা সুবিধা আছে বটে—এই উপকার। নতুবা ধর্ম্ম-বিষয়েও পরাধীন হইতে হয়। সুতরাং পাপের সীমান্ত দেশে পহুঁছিতে হয়। এই জন্যই দেখা যাইতেছে কি ভৌতিক, কি আধ্যত্মিক সকল বিষয়েই অধীনতা পাপ; স্বাধীনতাই পুণ্য।

আর একদিন গুরুমুখে শোনা গেল, "প্রেমই পুণ্য, দ্বেষই পাপ।" প্রেম অর্থ তখন বুঝিলাম, পরকে ভালোবাসা, হেতুশূন্য প্রীতি করা। আর দ্বেষ অর্থে বুঝিলাম, পরকে ঘৃণা করা। বস্তুতঃ যিনি ক্রমেই প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, তিনিই পুণ্যবান। পরকে ঘৃণা করিতে করিতে অবশেষে সকলেরই ঘৃণ্য হইয়া উঠে; ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বিষয় এই যে সংসারী জীবনে প্রেম দ্বেষ উভয় না হইলে চলে না। সম্পূর্ণ পুণ্য বা সম্পূর্ণ দ্বেষ সম্ভবে না। উত্তরে আমি বলিব যে, এ জগতে পূর্ণ পাপ বা পূর্ণ পুণ্য সম্ভবে না।

গুরুমুখে আর একদিন শোনা গেল, "ঈশ্বরে বিশ্বাসই পুণ্য। সংশয়ে পাপ।" কথা শুনিয়া অমনি গীতার কথা মনে পড়িল, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সংশয়িত চিত্ত লোক নিতান্ত চঞ্চল। নানা ভাব তরঙ্গে আন্দোলিত। পূর্ব পক্ষ হইল বিশ্বাস করিব কেন? নৈসর্গিক নানাত্বের তরঙ্গে সংশয়িত চিত্ত হওয়া স্বাভাবিক—দৃষ্টান্ত নানাত্ব আছে বটে; কিন্তু সেই নানাত্ব বিচারের ক্ষমতা যখন তোমার নাই, তখন তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশ্বাসেই শান্তি পাইবে। শান্তিলাভই যদি পুণ্যের পরিচয় হয়, তবে বিশ্বাসে তাহা আছে, সংশয়ে নাই। অতএব বিশ্বাসই পুণ্য; সংশয়ই পাপ।

অবশেষে গুরুদেব একদিন বলিলেন, "একত্ব জ্ঞান লাভই পুণ্য,

নানাত্ব জ্ঞানই পাপ।" কথা শুনিয়া ভাবিলাম, নানাত্ব যখন স্বাভাবিক তখন পাপও জীবের স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে; গুরুদেব অমনি বলিলেন, "তোমার ভ্রম-বুদ্ধিতে নানাত্ব আছে বলিয়া তাহাই যে সত্য হইবে কে বলিল? জগতে নানাত্ব নাই। শ্রুতিতে তাহার প্রতিহার আছে। নানাত্বে জীবের কষ্ট হয়, সুতরাং তাহা পাপের ফল বই কি? একত্ব জ্ঞানে মন বিক্ষুব্ধ হয় না। সুতরাং তাহাতে অক্ষয় সুখ আছে; তাহাই পুণ্য।"

গুরুদেব বলিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক প্রেম, সেই স্বাধীনতা লাভ, সেই পুরুষকার এবং সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ভাব লাভ করাইবার জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র বিভিন্ন উপায় (means) দেখাইয়া দিতেছে। সাধারণ লোক সেই সাধ্য (end) বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল সেই উপায়গুলি পাপ পুণ্য লইয়াই বিতণ্ডা করিয়া মরিতেছে। প্রত্যেক উপায়ই অল্পাধিক সহায়কারী, তবে "সর্ব্বারম্ভাহি দোষেন—ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ", সেই উপায়গুলি আবার যে অল্পাধিক দোষদষ্ট হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু সেগুলি ধরিয়াই যখন পূরাপুণ্য লাভ করিতে হইবে তখন স্বীয়াস্বীয় ধর্ম্মানুশাসন অবহেলা না করিয়া সেগুলিও যতদূর সাধ্য মানিয়া চলা উচিৎ। তাহাও আবার যুক্তি বিচারে অল্পতাপে শোধিত করিয়া লইবে। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে পাপ-পুণ্যের প্রহেলিকা আপনি মীমাংসিত হইয়া পড়িবে, এই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আশ্চর্য্য সমন্বয়

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ, ১৩০৮ সাল

জগতের অধিকাংশ মানবই ভাবপ্রধান। জ্ঞানপ্রধান জীবের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ভাবপ্রধান লোকেও অল্পাধিক বুদ্ধিমত্তা, আবার জ্ঞানপ্রধান মানবেও তেমনি অল্পাধিক ভাবপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান ও ভাবের পূর্ণ বিকাশ যাহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহারা মরভূমে অমর বলিয়া পরিগণিত।

জ্ঞানপ্রধান জীব স্বতঃই আত্মবিশ্বাসী ও পুরুষকারবাদী। ভাবপ্রধান লোক আপনা হইতে স্বতন্ত্র, দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কৃপাপ্রার্থী ও দৈববাদী। জ্ঞানী তর্কবিচারে, সত্যস্থাপনে প্রয়াসী। ভাবপ্রধান মানব জটিল তর্ক প্রচার পন্থাবলম্বনে কুণ্ঠিত, এমনকি ভীত। জ্ঞানপ্রধান মানব কুসংস্কারশূন্য, নির্ভীক ব্যবহারিক আচারবিচারে নিষ্ঠাহীন। প্রকৃতির সুনিয়ম রহস্যভেদে ব্যগ্র; ভাবপ্রধান মানব অনেক স্থলেই কুসংস্কারপন্ন ভয়শীল নিষ্ঠাবান ও সৃষ্টিরহস্য প্রকটনে উদাসীন। জ্ঞানী, তর্কনিষ্ঠ সত্যে অবস্থিত—হিমাদ্রির মত অচল অটল। ভক্ত নিজ নিজ বিশ্বাসে অন্ধ—সেও আপনার ইষ্টে একান্ত অটল। জ্ঞানপ্রধান জীবের আত্মনিষ্ঠা ও আত্মার স্থিতি বা স্ব স্ব রূপদর্শনই সাধনার চরম ফল; ভাবপ্রধান লোক ইষ্ট বা ঈশ্বরভাবে তন্ময়—ভাববিভোর; চরম ফলাফলেও উদাসীন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে জ্ঞানীর কর্ম্মতৎপরতা; ভাবপ্রাবল্য ভক্তের কর্ম্মোদ্দীপক। ভক্ত পরদুঃখ কাতর, সুতরাং দয়াপরবশ. জ্ঞানীও সকলকে আত্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া পরসাহায্যকারী দয়াপরবশ না হইয়া সেবাপরবশ।

ভাবের স্থান হৃদয়। জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্ক। ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর দর্শন পায়েন; জ্ঞানী সহস্রারে পরাজ্যোতি দর্শন করেন। প্রকৃতির নিয়ম রহস্য ভেদ করিয়া জ্ঞানী সময়ে সময়ে যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, ভাবপ্রধান ভক্ত তাহাতে নানা রঙ, বেরঙ ফলাইয়া জগতে Occult Scienceএর প্রচার করেন। যেমন গণিত-জ্যোতিষ জ্ঞানীর

আবিষ্কার, ফলিত-জ্যোতিষ, ভাবপ্রধান লোকের গুহ্যশাস্ত্র। অথবা যেমন আত্মার ক্রমোন্নতি বিষয়ক যুক্তিসিদ্ধ পরলোকবাদ জ্ঞানীর আবিষ্কার; তাহারই উপরে ভূত-প্রেতঃ প্রসঙ্গ এবং যমলোক স্বর্গলোকাদির পৌরাণিকী বর্ণনা, আবার ভাবপ্রবণ মানবের অদ্ভুত সংযোজনা। চক্ষে সকলি অদ্ভুত—সে সকল দেখিয়াই অবাক। জ্ঞানীর চক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না; সে স্থির, শান্ত, সমনস্ক। ভাবের গতিরোধে একজন অপারগ; অন্যজন আত্মসংযমী; সুতরাং কঠোর হৃদয় বলিয়া অনুমিত। ভক্ত সুখ দুঃখে অভিভূত; জ্ঞানীর সর্বদা একভাব—একটানা জোয়ারে তার সুখ-দুঃখ ভেসে যায়। একজন চিরনীহারাবৃত হিমাচল; অন্যজন সময়ে নীহারাবৃত, সময়ে সাধারণ পাহাড়।

প্রকৃত জ্ঞানী ত্যাগী। জগদুপেক্ষাশীল, বাসনা-বিলাসে প্রবল দোষদর্শী। ভক্ত প্রায়ই গৃহী, জগদস্তিত্বে একান্ত বিশ্বাসী এবং সাধারণতঃ ভোগশীল। ভক্ত নির্বাণ চাহে না; কাজেই একটু ভোগবাসনা অলক্ষ্যে তাহাকে জড়াইয়া থাকে। জ্ঞানী চাহেন অনন্তে মিলন—পরম নির্বাণ; তাহা একটু বাসনা থাকিতেও ইহার সম্ভাবনা নাই।

ভক্ত নিরীহ, তথাপি সময়ে সময়ে সিংহবলী। জ্ঞানী উগ্র; কিন্তু সে উগ্রতায় মধুরতা আছে। ভক্তের নম্র দৃষ্টি মাটির দিকে, জ্ঞানীর তীব্র দৃষ্টি ঊর্ধ্বে আকাশগামিনী, সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী। জ্ঞানীর সাধনস্থল মহাশ্মশান, বিভূতি চিতাভস্ম; ভক্তের সাধনস্থল সম্মার্জিত দেবমন্দির; বিভূতি চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য। একজন লয়দর্শী, অপরজন স্থিতিদর্শী। ভক্ত অম্বরীষ রাজার নিকটে মহাজ্ঞানী দূর্বাসার লাঞ্ছনা ভক্তিভাব প্রধানা পৌরাণিকী কল্পনা মাত্র। জ্ঞানশাস্ত্র সকলের প্রতিই স্নেহদৃষ্টি করে; সেজন্য তাহাতে ভক্তাদির লাঞ্ছনা ব্যঞ্জক অলীক উপাখ্যানাদি রচিত দৃষ্ট হয় না। ভক্ত নানা দল বা সম্প্রদায় গঠন করে; জ্ঞানীর কার্য্য হইতেছে সে সকল ভেঙ্গে দেওয়া। ভক্ত নামরূপে উন্মাদ; জ্ঞানী "নামরূপে বিহায়" ভূমাসমুদ্রে

স্যন্দমান। গৌণজ্ঞান মায়ের অন্দরমহলে ঢুকিতে পায় না বটে; কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে তাহাই আবার মায়ের অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও জন্মে জন্মে ত্রিবৃৎমায়ার চিরসঙ্গিনী, কারণ ভক্ত সে সঙ্গী হইতে জন্মে জন্মে সাধ রাখে।

উক্তরূপ গৌণভাবে উভয়ে উভয়ের বিরোধী হইয়াও মুখ্যরূপে উভয়েই আবার এক ফলপ্রসূ। সুতরাং মুখ্যরূপে উভয়ই অনিন্দনীয়। বাদ-বিসম্বাদ কেবল গৌণভক্ত ও গৌণজ্ঞানীর মধ্যে। প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানী একই তত্ত্বে অবস্থিত। গৌণ উপায় লইয়া ভূত ও বানরের বিবাদ কখনও এ জগতে থাকিবে না।

গুরুদেব বলেন বিচারে তত্ত্ববুদ্ধিস্থ হইলে তাহার অনুভূতি হইবে ভাবধারার হৃদয়ে। সুতরাং সেই মুহূর্তে মস্তিষ্ক ও হৃদয় যুগপৎ সব বলে প্রস্ফুটিত হয়। তখনই "ভিদ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থিঃ", হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায় ইত্যাদি। গুরুদেব আরও বলেন, যখন প্রাচীন কালে এই জ্ঞান ও ভাব যুগপৎ ঋষি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব কবিত্বে পরিণত হইয়াছিল তখনই বেদাদি রচিত হয়। কারণ বেদাদি পড়িলে মনে হয় যেন ভাব ও জ্ঞানের দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা অবশেষে বেদভূমে একত্র সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে।

আজিও যেখানে জ্ঞান ও ভাব পূর্ণভাবে যুগপৎ প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়, সেখানে জগতের লোক অবনত হইয়া পড়ে। সেখানে শত সহস্র জ্ঞানী ও ভক্ত আত্মোৎসর্গ করে। অধুনাতন জগতে গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান ভক্তির এক আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। যে মহাসমন্বয়াচার্য্যের নাম আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সমভাবে পূজিত ও ঘোষিত হইতেছে, তিনিই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

———

বেদান্তে কাহার অধিকার ?

উদ্বোধন—৫৯তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৬৪ সাল

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে নিখিল ধর্মমতের সমন্বয় পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীগণের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সনাতন ধর্মে নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে ; বিবেক-বৈরাগ্যবান্ মেধাবী প্রচারকগণ বেদান্তবিজ্ঞান বিস্তারকল্পে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই শুভমুহূর্তে বঙ্গদেশও বেদান্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্যই যত্ন করিবে। এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে—বঙ্গবাসীর মোহনিদ্রার অবসান করিতে—ভগবান্ শঙ্কর যেন বেদান্তের মহিমা পুনঃ প্রচার করিতে নরশরীরে স্বামী বিবেকানন্দরূপে আবার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যদি এই শুভ মুহূর্তে আমরা শ্রীস্বামীজী প্রচারিত বেদান্ত-ধর্মের নবীনত্ব উপলব্ধি করিতে না পারি—তবে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সর্ববিধ অকল্যাণ আসন্ন। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের সারমর্ম আত্মবিশ্বাস। আত্মসংবিৎহারা ভারতবাসী—আমরা আমাদের স্বাভাবিক আত্মশ্রদ্ধা হারাইয়া বহুকাল যাবৎ জগতে ধিকৃত ও ঘৃণিতপ্রায় দাসজীবন অতিবাহিত করিয়াছি। দাসসুলভ হিংসা-দ্বেষ সমাজের মেরুমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ী পাশ্চাত্যদেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদান্ত-শাস্ত্র যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে ক্লীবতা গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই মহামোহ ও ক্লীবতার নিধন-সাধনে বেদান্তমূর্তি ভগবান আবার নরদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। আত্মপ্রত্যয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—জড়তা ও ক্লীবতা দূরীকরণ—সত্য, সংযম ও তপস্যা-সাধন—ইহাই নবযুগ যজ্ঞের বিধি-বিধান। জীবন ক্ষণস্থায়ী, মহাকালের তুলনায় এক নিমেষও নহে। ব্যক্তিগত, সমাজগত, দেশগত ও জগদ্ব্যাপী ওজঃশক্তিসঞ্চারে বেদান্ত শাস্ত্রের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন আর কোন শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের বিবেক বৈরাগ্য উৎপাদন দ্বারা—স্বার্থে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও

পরার্থে যে নিষ্কাম কর্মপ্রবণতা উৎপন্ন হয় তাহা জীবহিত-চিকীর্ষায় অমৃত নিস্যন্দিনী গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় কেবলি পরার্থে প্রবাহিতা। আমরা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইলেও আনুষঙ্গিক যোগকর্ম ভক্তি-তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নশীল।

বেদান্ত বুঝিবার পূর্বে অন্যান্য দার্শনিক মতেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগ্রহ আবশ্যক। এইজন্য উপক্রমণিকায় আমরা এই মূলতত্ত্বগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঋগাদি ভেদে ত্রিধা এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধা সংকলিত বেদ আবার দুই প্রস্থানে প্রবিভক্ত। সংহিতা-ভাগে স্তোত্রমন্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ-ভাগে তাহাদেরই প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ অধ্যায়গুলি যাহা আরণ্যক বা উপনিষদ্ বলিয়া কথিত হয় তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ও উপাসনার উপদেশাদি বর্ণিত আছে। প্রতি বেদের অন্তভাগে ব্রহ্মজ্ঞানমূলক উপদেশ থাকায় উহা বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়া কথিত। উপনিষদই বেদান্ত।

ব্রহ্ম ও আত্মা এতদুভয়ের ঐক্য-সাক্ষাৎকার বিষয়ক প্রমাণাত্মক শাস্ত্রের নাম 'উপনিষদ্'। যাহার অনুশীলন দ্বারা অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিরূপিত হয়, তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। উল্লিখিত প্রমাণের অনুকূল বলিয়া শারীরক সূত্রাদিও বেদান্ত বলিয়া কীর্তিত।

যে সকল উপনিষদ্ অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে দশোপনিষদই প্রধান। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ থাকিলেও নিম্নলিখিত দশখানি উপনিষদ্‌ই প্রধান বলিয়া অবলম্বিত হয়ঃ (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাণ্ডুক্য (৭) তৈত্তিরীয় (৮) ঐতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১০) বৃহদারণ্যক—এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ ভিত্তিস্থাপন করিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদান্ত-সূত্রের পরিপাটি উত্তুঙ্গ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন, শঙ্করভাষ্য পড়িলে ইহাই বোধ হয়। এই বেদান্তসূত্রে

উপনিষদ্-উপবনে সংগৃহীত ফুটন্ত কুসুমের মালিকা—মহর্ষি বেদব্যাস যেন অতি সন্তর্পণে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্য, টীকা; বৃত্তি, বার্তিক টিপ্পনীতে ইহা সমাবৃত হইলেও ব্রহ্মসূত্রমালায় চমৎকার রচনানৈপুণ্য ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগুলি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্যের পূর্বেও উপবর্ষ ও বোধায়ন মুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বোধায়ন মুনির মত উদ্ধৃত করিয়া তৎকথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাণিনির গুরু বলিয়া কথিত হন; এবং তিনিও দ্বৈতাদ্বৈতমতের সমর্থক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের পরবর্ত্তী রামানুজ, মধবাচার্য বল্লভাচার্য নিম্বার্ক এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শুনা যায় ইদানীন্তন কালে রাজা রামমোহন রায়ও ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করাচার্য এই ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহা 'শারীরক' ভাষ্য বলিয়া কথিত। শরীর শব্দ 'শৄ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'শৄ' ধাতুর অর্থ শীর্ণ হওয়া। যাহা ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তে শীর্ণ হইয়া যায়, তাহার নাম শরীর; তদুত্তর তুচ্ছার্থে 'ক' প্রত্যয় যোগে 'শারীরক' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'তত্রভব' ইত্যর্থে 'শারীরক' ইহার দ্বারা ভাষ্যকার এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে জীব! যে দেহ অবলম্বনে তুমি 'আমি আমি' করিয়া বেড়াইতেছ—ইহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ-জ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে; এইজন্য এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ। এই মানব-শরীর লাভ করিয়া তুমি আত্মজ্ঞান লাভে কৃতপ্রযত্ন হও; নতুবা জন্মমৃত্যুর দুঃখময় পথে তোমাকে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হইবে।

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অনুবন্ধ দৃষ্ট হয়। সে অনুবন্ধ-গুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষয় (৩) সম্বন্ধ (৪) এবং

প্রয়োজন। কঠোপনিষদ্ ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ঃ—"এবমুপনিষন্নির্বচনেনৈব বিশিষ্টোঽধিকারী বিদ্যায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যাগাত্মভূতম্। প্রয়োজনঞ্চাস্যা উপনিষদ্ আত্যন্তিকী সংসার নিবৃত্তির্ব্রহ্ম প্রাপ্তিলক্ষণা! সম্বন্ধশ্চৈবম্ভূত প্রয়োজনেনোক্তঃ।" অর্থাৎ মুমুক্ষুই এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। সর্বভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই উপনিষদের বিষয়। অত্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার প্রয়োজন; আর ঐ প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকত্বই সম্বন্ধ।

অতি দুরবগাহ্য ব্রহ্মতত্ত্বে যে সে লোক প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রবেশ করিতে হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মপুরঃসর সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়া চাই; মুক্তির তীব্র ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্ত সাধনার অধিকারী। সে যে জাতি, যে সমাজ, যে শাস্ত্রানুশাসন ও বিভিন্ন আচারাদিসম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুযায়ী অনুশাসন মানিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম করিয়া চলিলে প্রত্যেকেই সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে পারেন; এবং তারপরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়। বেদান্তে দেখা যায় ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদবিদ্যাধিকার আছে। সমাজ ও স্মৃতিশাসন কালচক্রে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

গীতামুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।" পরাগতি অর্থে ব্রহ্মজ্ঞতা। ভাষ্যকারের অভ্যুদয়কালে সমাজে শূদ্রাদির অনধিকারিত্ব সূচিত হইলেও তাহা ইদানীন্তন সমাজে প্রযোজ্য কিনা বিবেচনার বিষয়। ইতিহাস পুরাণ ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সকল জাতির মধ্যেই মহা মহা ধর্মবীর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে। যদি এরূপই হয়, তবে বলিতে হইবে—গণ্ডীবদ্ধ অধিকারবাদ সর্বকালে সমান ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় নিতান্ত নির্মল স্বভাব হইলেই তাহার ব্রহ্মবিবিদিষা জন্মে। নির্মল স্বভাবত্ব লাভ নানাপথে

জন্মাইতে পারে। একদিন স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "অধিকারীবাদের বিতণ্ডায় অনর্থক শক্তিক্ষয় না করে এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাতে লেগে যা। দেখবি, হয়তো সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকেও মহা মহা বীরের অভ্যুত্থান হবে!"

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী

(নাটক)

উদ্বোধন—১ম বর্ষ, ১৩০৬ সাল

রামদাস নামক পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বহুদিন গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া নিশ্চিন্তমনে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহ যেন সদাচারের লীলাভূমি, অতিথিজনের পান্থশালা ও দীনদুঃখীর পিত্রালয় বলিয়া অনুমিত হইত। রামদাস কপটতার ধার ধারিতেন না; স্পষ্টবক্তা বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গৃহিণী যেন সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, স্বামীভক্তির সর্ব্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়া। রামদাসের বদান্যতা, সহৃদয়তা, মিষ্টালাপ, অতিথিসৎকার ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ বলিয়া অনুমান করিতেন। হিন্দু শাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া রামদাস বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় গুরু, পুরোহিত, তিন চারিটা গ্রামিক বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শন উপলক্ষে একদা তিনি বারাণসী যাত্রা করেন। চির কাশীবাসী হইবার জন্য তিনি এবার তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি; তবে যাত্রাকালে স্বীয় সুযোগ্য পুত্রকে সংসারের বিষয়-সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামিক লোক মনে করিয়াছিল, রামদাস আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না।

যথাকালে বারাণসী উপস্থিত হইয়া রামদাস দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরে বাঙ্গালিটোলায় বাসা লইয়াছিলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুরধুনীর অনুপম শোভা, বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচূড় মন্দির, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া রামদাস মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া রামদাস সকলকেই নারায়ণ-জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া রামদাস দুই ঘণ্টাকাল জপধ্যানে নিরত থাকিতেন।

একদিন রামদাস জপধ্যান-সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় অমিততেজা কোন এক যুবক সন্ন্যাসীকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন; সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় দীপ্তি, চক্ষুতে উদাসীনতা, হৃদয়ে নির্ভীকতা ও প্রশান্তি অবলোকন করিয়া রামদাস পথপ্রান্তে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, প্রভো! অনেক ভাগ্যবশে আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শন লাভ আজ ঘটিল। অনুগ্রহ করিয়া যদি এ দাসের অবস্থান-গৃহ একবার পবিত্র করেন, আমি কৃতার্থ হই। দেখিয়া বোধ হইল, যেন সন্ন্যাসীটি পথশ্রমে পরিক্লান্ত, অনশনে ক্লান্তমুখ; তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। রামদাসের ভক্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে চলিলেন; কিন্তু বলিলেন ভিক্ষা গ্রহণান্তে পুনরায় তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রি যাপন করিবেন।

রামদাস গৃহে সমাগত হইয়া পাদ্যাদিদানে সন্ন্যাসীকে যথাবিধি পূজা করতঃ গৃহিণীকে সাধু-সেবার আয়োজন করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার ফলমূল ও মিষ্টাদি দ্রব্যে সন্ন্যাসীকে জলযোগ করানো হইল। অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করিবেন বলিয়া, পরে তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর নামধাম জিজ্ঞাসা করিতে নাই, একথা রামদাস অবগত ছিলেন। সুতরাং কি উপায়ে ইঁহার প্রকৃত

পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, রামদাস প্রথমতঃ তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে সেইজন্য প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভৌতিক দেহ কোন্ দেশের পবিত্র মৃত্তিকায় গঠিত হইয়াছিল ?" সন্ন্যাসী প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ; বলিলেন, "কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাণিহাটীর।" রামদাস তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী অবগত হইয়া যেন একটু সাহস পাইলেন ; বলিলেন, আমিও বঙ্গদেশী ; তবে একটু পূর্ব্ব-দেশীয "বাঙ্গাল।" সন্ন্যাসী রামদাসের সরলতা দেখিয়া একটু অস্ফুট হাস্য করিলেন। স্বদেশীয় লোকের নিকট যেমন অসঙ্কুচিত চিত্তে কথা বলিতে পারা যায়, ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট তেমনটি হয় না। তাই নবাগত সন্ন্যাসীকে সাহস করিয়া এবার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তাঁহার নাম ধীরানন্দ।

রামদাস ও ধীরানন্দের যে কথোপকথন হইতেছিল, রামদাসের সহ-যাত্রী জনৈক গ্রামবাসীর নিকট তাহা অবগত হইয়া পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

রামদাস। মহাশয়, সন্ন্যাসীর নান ধাম জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, শাস্ত্র মুখে ইহা অবগত হইয়াও আপনার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ধীরানন্দ। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনি যাহা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; কিন্তু আপনাকে সাবহিত করিয়া দিতেছি, সন্ন্যাসীকে কখনও আর নামধাম জিজ্ঞাসা করিবেন না। অভ্যাগত অতিথি, কি সন্ন্যাসীর সেবা হইয়াছে কিনা, গৃহস্থের ইহাই জিজ্ঞাসা করা উচিৎ।

রামদাস। যদি অভয় দেন, দুই একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে আমার বড় উপকার হইবে ; পরহিতকল্পেই আপনাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়।

ধীরানন্দ। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

রামদাস। আপনার নবীন বয়স, শরীর সুগঠিত, অথচ আকৃতি প্রতিভাব্যঞ্জক, অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং জ্ঞানী। আপনি তো সংসারা-

শ্রমের যুদ্ধে বেশ সফল হইতে পারিতেন। এ অবস্থায় গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন কেন? সত্য কি তবে, গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্ম লাভ হয় না?

ধীরানন্দ। গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ করা অতীব সুকঠিন। চতুর্দ্দিকে প্রলোভনের জিনিষ, কামকাঞ্চনের লেলীহমতী জিহ্বা বিজ্ঞ গৃহস্থকেও ভীতি দেখায় এবং অবশেষে হয়ত বিনাশ সাধনও করিতে পারে।

রামদাস। সন্ন্যাসী হইলেই কি কামকাঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

ধীরানন্দ। প্রলোভনের জিনিষ দূরে অবস্থান করিলে, শীঘ্র কি কামকাঞ্চনে প্রলুব্ধ হইতে পারে?

রামদাস। সন্ন্যাসীকেও প্রতিনিয়তই গৃহস্থের সঙ্গ করিতে হয়। পরন্তু কামকাঞ্চনের রাজ্য কোথায় নাই?—বিশ্বামিত্র ঘোর অরণ্যে অবস্থান করিয়াও শকুন্তলার জন্মদাতা হইয়াছিলেন।

ধীরানন্দ। আপনি যাহা বলিলেন সত্য বটে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রলোভনের ও পতনের যত সম্ভাবনা, সন্ন্যাসাশ্রমে তত নয়।

রামদাস। সেকথা আমি ত স্বীকার করি। কিন্তু কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, প্রকৃত ত্যাগ মনের; গীতাও বলিয়াছেন "কাম্যাণাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"; কাম্য কর্ম্মের ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তাঁহাদের বিবেচনায় গৃহে থাকিয়াও তাহা সাধিত হইতে পারে। জনকাদি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

ধীরানন্দ। জনক হওয়া কি সহজ কথা! অনেক তপশ্চর্য্যা করিলে 'জনক' হওয়া যায়। 'জনক' অর্থে তো আমরা 'পরমহংস' বুঝি। পরমহংস হওয়া কি মুখের কথা! অনেক সাধনার পর আগে পরমহংস হউন, তবে 'জনক' উপাধি লইবেন। কেবল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলে কি ত্যাগী হইতে পারে? ত্যাগী পুরুষের প্রকৃতিই পৃথক। জনক ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী অন্য কোন গৃহস্থের নাম অবগত হইয়াছেন কি?

রামদাস। আচ্ছা,—স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া প্রতিবারেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বন কেন করিয়াছিলেন ?

ধীরানন্দ। ভগবানের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানবের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। আরও, বুদ্ধগৌরাঙ্গাবতারে ত তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

রামদাস। আচ্ছা,—প্রথমাবস্থায় সকলেই গৃহী, তৎপর সন্ন্যাস; ইহাই ত ধর্ম্মের ক্রমনিয়ম ও শাস্ত্রানুমোদিত ?

ধীরানন্দ। তীব্র বিবেকীর পক্ষে দৃষ্টান্তও প্রযুজ্য নয়, শাস্ত্রানুশাসনও প্রযুজ্য নয়। তাঁহার বিধিনিষেধ নাই। সাধারণ লোকের ক্রমোন্নতি পন্থা। তীব্র বৈরাগ্যবানের এক লম্ফেই সাগর পার। এই শ্রেণীর লোকই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা হইতে একেবারে সন্ন্যাস লয়েন। শাস্ত্রেও তাহার বিধান আছে। "যদহরের বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" শ্রুতিও সে মত সমর্থন করিতেছেন।

রামদাস। তবে মন্বাদি শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যাদির পর গৃহধর্ম্ম; তৎপর বানপ্রস্থ, তারপর সন্ন্যাস। ইহাই ত শাস্ত্রাদিষ্ট পন্থা। জীবনের অন্তকালেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয়।

ধীরানন্দ। এ সকল নিয়ম নিম্নাধিকারীর পক্ষে। মন্বাদি শাস্ত্র বেদের পরে রচিত; ইহা সত্য হইলেই শ্রুতিমতে "যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনি সন্ন্যাস লইবে" একথার সার্থকতা থাকে। সন্ন্যাস অবলম্বনের কালাকাল নাই; জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল জানিবে। আর ভারতবর্ষে বর্ত্তমানকালে দুইটি মাত্র আশ্রম দৃষ্ট হয়। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রম। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচলন দৃষ্ট হয় না। আর হয় গৃহী নয় সন্ন্যাসী এই দুয়ের একেতর অবলম্বন করাই বর্ত্তমান যুগে এক্ষণে ধর্ম্ম বা জ্ঞান লাভের উপায়।

রামদাস। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম এক্ষণে ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমের বিধান নাই। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য এই দুইয়ের একেতর অবলম্বন

ধর্ম্মলাভের উপায় হইলেও, গৃহস্থের জ্ঞান হইবে না, একথা আপনি বলিতে পারেন না।

ধীরানন্দ। আমি অবশ্য সেকথা বলিতে পারি না। তবে গৃহস্থের জ্ঞান হওয়া বর্ত্তমানকালে বড়ই দুরূহ।

রামদাস। সন্ন্যাসীর পক্ষেও সেকথা। আজকাল কত গেরুয়াধারী দেখা যায়; বলুন দেখি, কয়জনের জ্ঞান হইয়া থাকে?

ধীরানন্দ। যদি কাহাদেরও ভিতরে বেশী জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেই হয়। গৃহস্থদের মধ্যে যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। তবে, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ নীচসংসর্গ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা ও পরদোষান্বেষণই গৃহীদের প্রধান সাধন।

রামদাস। তেমন, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর মধ্যেও ঘোরতর ভণ্ডামী ও মূর্খতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে, তাহাদের বাহ্যিক ত্যাগ-ব্রত গৃহস্থের শিক্ষার বিষয় বটে, এইমাত্র যা উপকার।

ধীরানন্দ। যে সকল সন্ন্যাসী ভণ্ড বা মূর্খ তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। কেন?—ভাল সন্ন্যাসী ভাল সাধু কি কখনও কোথাও দেখ নাই? এত ত বেড়ালে।

রামদাস—হাঁ, তা বটে। তবে যে সকল গৃহী কুটিল স্বার্থপর ও পরদোষান্বেষী তাহারাও প্রকৃত গৃহী নহে। গৃহীদের মধ্যেও অনেকে ভাল আছেন।

ধীরানন্দ। তার সন্দেহ কি? কিন্তু দেখুন, ত্যাগ না হইলে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ না করিলে অপরোক্ষানুভূতি বা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

রামদাস। সন্ন্যাস অর্থ যদি গেরুয়া কাপড় পরা হয়, তবে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি না। মনুও বলিয়াছেন "ন লিঙ্গং ধর্ম্ম কারণং"। আর সন্ন্যাস অর্থ যদি বাসনাত্যাগ হয়, তবে গৃহীও সে সাধনার অধিকারী।

ধীরানন্দ। লিঙ্গ (অর্থাৎ ত্যাগের কোন রূপ চিহ্ন) ধারণ

করিলে অনেকে ত্যাগের পথে বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।" অলিঙ্গ বা সন্ন্যাসের কিছু চিহ্ন রহিত তপস্যায় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং লিঙ্গ ধারণেরও আবশ্যকতা আছে। মনু হইতে বেদের প্রমাণ অধিক।

রামদাস। বেদে ইহাও আছে "বিদ্বান্ লিঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।" আমার মতে বাসনা ত্যাগই সন্ন্যাস। তা গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। শিলোহন মিশ্রও বলিয়াছেন, "গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ" "নিরস্ত-রাগস্য গৃহং তপোবনং"। গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপস্যা করা যাইতে পারে। নিরস্তবাসনা লোকের পক্ষে গৃহই তপোবন।

ধীরানন্দ। "বিদ্বান্" মানে—যাঁর জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞান হইলে ত সন্ন্যাসাশ্রমেরও পারে যাওয়া হইল। তখন আর 'লিঙ্গ'ই বা কি, আর 'অলিঙ্গ'ই বা কি?—সন্ন্যাসের প্রথমাবস্থায় লিঙ্গাদি বড়ই উপকার দেয়। আর দেখুন, কামকাঞ্চনের ঘরে বাস করিয়া নিবৃত্তি পথে যাওয়া সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। কালো ঘরে থাকিলে কোন সময়ে বুঁদ লাগিবেই লাগিবে।

রামদাস। সাবধানীর কাছে অসম্ভব কিছুই নাই। অনেক গৃহীও সন্ন্যাসীর অনুকরণীয় আছেন।

ধীরানন্দ। যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। তাঁহারা যে প্রকৃত বীর সাধক, সে কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

রামদাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে তো যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা আমাদের আদর্শ। কিন্তু নামমাত্র সন্ন্যাসী, ভণ্ড গেরুয়াধারী, আমাদের গৃহী অপেক্ষাও অধম। আর দেখুন বেদের উপনিষদ্ ভাগের বক্তা অনেকেই ক্ষত্রিয় রাজা। পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাস গৃহী ছিলেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণও গৃহী ছিলেন। তবে আমি একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, সন্ন্যাসীরাই হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর্শ স্থানীয় হইয়া আছেন।

ধীরানন্দ। গৃহস্থ যদি ঠিক ঠিক গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার জ্ঞান হইতে না পারে এমন নয়। কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন। লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে যদি একটি প্রকৃত গৃহস্থরূপে উতরাইয়া যায় ত ঢের; কিন্তু লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে কম বেশী একশ'টা সাধু নিশ্চয়ই উতরাইবে।

এইরূপে রামদাস ও ধীরানন্দ কথোপকথন করিতেছিলেন। রামদাসের গ্রামবাসী সহযাত্রী তাঁহাদের কথা শুনিতে শুনিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের কথোপকথন আমরা এই পর্য্যন্তই জানিতে পারিয়াছি।

—০—

আমার কথা

উদ্বোধন—৯ম বর্ষ—১৩১৪ সাল

বহুদিন হইল, যখন হিন্দু শাস্ত্রাদি আলোচনায় মন প্রথম নিবিষ্ট হয়, তখন শাস্ত্রমুখে জানা গেল—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।" গুরুই সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আবার গুরুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়াও বর্ণিত দৃষ্ট হইল। গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন তত্ত্ব নাই, ইহাও "ন গুরোরধিকং তত্ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূচিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান-গর্বিত মন মানুষকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবিতে কুণ্ঠিত হইল। অনাদি অনন্ত ভাবনাতীত ভাব চোদ্দপোয়া মানুষে আরোপ করিতে মন স্বীকৃত হইল না। মনে হইল, ইষ্ট নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন মাত্র। মনে হইল, মানুষ বিশ্বাসে ঐরূপ ভাবপ্রবণ হইয়া নিজের স্বাধীন চিন্তা হারায়। মনে হইল, দেশকাল নিমিত্তের সীমার অতীত তত্ত্ব মানুষে আরোপ করা পাগলের প্রলাপ বিজৃম্ভনা। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। বহু পুণ্য লাভের পরিণাম ফলে গুরুলাভ হইল। তত্রাপি "ন গুরোরধিকং তত্ত্ব" হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইল না। কিন্তু গুরুকৃপার কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! আজকাল অনেক সাধন ভজনের পরিণামে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, সত্য সত্যই "ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ"—গুরুর পর আর জানিবার

তত্ত্ব নাই, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আমার ন্যায়-সাধনের প্রথম অবস্থায় যাঁহাদের এই গুরুবাদে প্রবল সন্দেহ আছে এই প্রবন্ধে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে বিধায় ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

শাস্ত্র বলেন, জ্ঞানদাতার নাম গুরু। ইষ্টলাভের কৌশল যিনি শিক্ষা দেন, যিনি ত্রিতাপ ক্লিষ্ট জীবের অজ্ঞানান্ধতা দূর করিয়া মায়াপাব নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত; যাঁহার অমোঘ কৃপাদৃষ্টিতে কামিনীকাঞ্চনের ঘোর আকর্ষণ শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যাঁহার চরণাম্বুজ আশ্রয় করিলে ভবসমুদ্র অবহেলে পার হওয়া যায়, তিনিই গুরু। শিক্ষা দীক্ষাদাতা ভেদে গুরু দ্বিবিধ। কিন্তু আমার মত এই যে, প্রকৃত গুরু শিক্ষাদাতা বা দীক্ষাদাতা গুরু নহেন। যিনি অন্বেষ্টবা, যিনি বিজিজ্ঞাবিতব্য, যিনি শ্রেষ্ঠ প্রাপনীয়, তিনিই গুরু। শিক্ষা দেয় অন্য বস্তু লাভের জন্য, দীক্ষা দেয় অন্য বস্তু দেখিবার জন্য। কিন্তু গুরু ভিন্ন অন্য শিক্ষিতব্য বা জ্ঞাতব্য বস্তু যদি না থাক, তবে গুরু কাহার শিক্ষা দিবেন? কি বস্তু লাভের জন্য দীক্ষা দিবেন? গুরুকে চিনিবার জন্য, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা, তাহাই প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা। মানুষ সব বুঝিয়া ঐটুকু ভুল করে। গুরুকে জানিলেই সব জানা হইল; জপ তপস্যার পরিণাম গুরুকে জানা। গুরু তাঁহারই স্বরূপ জানাইবার জন্য শিক্ষাদীক্ষা দেন। সাধক প্রথমে তাহা টের পায় না। সাধনার পরিপক্কাবস্থায় ক্রমে তাহা অনুভূত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য মধ্যে অনেকেই বিদিত আছেন যে, তাঁহাকে জানাই তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার চরম ফল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইষ্টরূপে লাভ করিয়া থাকিলেই তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাদের ইষ্টরূপে প্রাপনীয়। যদি তিনি শিক্ষাদীক্ষা দিয়া থাকেন, তবে শুধু তাঁহাকেই বুঝাইবার জন্য, নতুবা অন্য শিক্ষা-দীক্ষার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না।

মদীয় আচার্য্য পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামিপাদ যদিও শাস্ত্রীয় মতে আমাকে ও গুরু ভ্রাতাগণকে দীক্ষিত করিয়া থাকুন, এখন আমি কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহার সেই শিক্ষাদীক্ষা কেবল তাঁহার সেই স্বাত্মস্বরূপ প্রকটন করিবার জন্য। অন্য ইষ্ট আমার আদর্শ নহে। যাঁহার সম্মোহন মূর্ত্তিতে কোটী কোটী দেবদেবী নিমজ্জিত হইয়া যায়, যাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমে অযুত অনন্ত জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে, যাঁহার পর অন্য উচ্চাদর্শ আমার কল্পনার অবিষয়, তিনি ভিন্ন ইষ্ট আমার আর নাই। তাঁহারই শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি, তিনিই আমার একমাত্র অন্বেষ্টব্য ইষ্টমূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীস্বামিপাদ সমস্ত দেবদেবী মূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া কেন আমার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। কেন তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, কেন তাঁহার পাদপদ্মে আমি চিরজীবনের মত বিক্রীত হইয়া গেলাম, কেন যে তিনি-ভিন্ন জীবনে শান্তি হারা হই তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততোই বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার আর ইষ্ট নাই। তিনি ভিন্ন আমার সুখ নাই, শান্তি নাই ও আশ্রয় নাই। আমি সেই শ্রীপাদপদ্মে ক্রীতদাস হইয়া গিয়াছি। তাঁহার স্মরণ মনন ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় তপস্যা নাই। তিনি আমায় যে এরূপ পাগল করিয়া যাইবেন, অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে সেই মনোনদ শান্তিময়, জ্যোতির্ম্ময়, চিদ্‌ঘন প্রেমের জমাট-বাঁধা মূর্ত্তি জাগ্রত স্বপনে আমার পানে যেন উঁকি-ঝুঁকি মারে—আমাকে পাগলপারা করিয়া দেয়। আমি তিনি ভিন্ন আর এ দেহে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমি তাঁহাতে যেন Dilute হইয়া যাইতেছি। আমার জ্ঞান, ধ্যান, জপ, তপস্যা সেই স্বামিপাদে পর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি আমিত্বহারা হইতেছি। তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি তিনি যেন ক্রমেই পূরণ করিয়া দিতেছেন। যত যত অদ্ভুত দর্শন হইতেছে, তাহাতে তিনিই

বিরাজিত। অনন্ত নীল গগন, যেখানে সৃষ্টি বিসৃষ্টির কল্পনা স্থান পায় না, সেখানেও তাঁহাকে কোটীসূর্য উদ্ভাসিত চিদ্‌ঘন মূর্ত্তিতে ভাসমান দর্শন করিয়াছি। ইহা ক্ষীণ মস্তিষ্কের কল্পনা নহে, সত্য সত্যই দেখিয়াছি। শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, কালী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যখনি যাঁহার ধ্যান করি, দেখিতে পাই, আমার সেই প্রাণারাম, স্বামিপাদ সেই সেই মূর্ত্তিতে বিরাজিত। সে রূপচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া যায়। কল্পনার সহায়তায় সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক যথায় যাই, সেখানেই সেই দিব্যমূর্ত্তি বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহা ত্রিশপথান্বিত সত্য। হইতে পারি আমি উন্মত্ত—হইতে পারি আমি বাচাল—হইতে পারি আমি যা তা—কিন্তু পাঠকগণ, আশীর্বাদ করুন, আমি এই ভাব নিয়া যেন মরিতে পারি—যেন মৃত্যুকালে এই বলিতে পারি, "গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ," যেন "স্বামিন্ স্বামিন্" বলিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়—যেন আমার গুরু ভ্রাতৃগণের মুখে শেষকালে শুনিতে পাই—"বিবেক আনন্দ নামে হোক্ ভবে জয় জয়"।

—*—

আদান প্রদান

উদ্বোধন—২০শ বর্ষ

পৃথিবীর চিন্তা আজ পাশ্চাত্য দেশগামিনী—যেখানে লোকক্ষয়কারী মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দেশকালকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে যে দেশ ভোগ ও সভ্যতার লীলাভূমি এবং বিদ্যার আদর্শ নিকেতন বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ চারি বৎসরের যুদ্ধে সে আদর্শ কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। জড় শক্তির উদ্দাম নৃত্যে পাশ্চাত্য ভূমি "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ খণ্ড প্রলয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রতি শতাব্দীতেই সঙ্ঘর্ষিত হইতে দেখা যায়। ঐহিক ভোগেচ্ছায় পরিচালিত সঙ্ঘ ও জাতি মাত্রেরই এই ভয়াবহ পরিণাম,—ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান।

পাশ্চাত্য বীরগণ বলেন, যুদ্ধই দেশের সঞ্চিত বল অপহরণ করিয়া জাতিকে নবীন জীবন প্রদান করে, সুতরাং ইহা প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, অবশ্যম্ভাবী। যে দেশের চিন্তা শুধু ইহ ভোগ-সমুখ আকাঙ্ক্ষার আপূরণে ধাবমানা মানবজীবন যথায় সংগ্রামময় বলিয়া পরিগণিত—সংগ্রামক্ষমতা যথায় জীবন ধারণের মুখ্য শক্তি বলিয়া বিবেচিত, সে দেশের পণ্ডিতগণ যে উক্তরূপ সিদ্ধান্তবাদী হইবেন, ইহা বিচিত্র কি ? অখণ্ড রাজ্যলিপ্সা, বাণিজ্যের অবাধ সম্প্রসারণ—অজস্র ধনাগমের অযুত পন্থা আবিষ্করণ—পার্থিব সুখের অনন্ত উৎস প্রকটন যে দেশের উচ্চাদর্শ বলিয়া পরিগণিত, সে দেশে হিংসা-দ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমুখ শারীরিক ও যান্ত্রিক বলের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য জাতির আদর্শই এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী।

ভগবান যীশুর সাম্যবাদ—দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া, অগ্রে ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য দূর করিয়া পরে ঈশ্বরোদ্দেশে বলি আহরণ ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ আদর্শবাক্য পাশ্চাত্য দেশের জন্যই যথার্থ কথিত হইয়াছে। যে দেশে রজস্তম শক্তির প্রবল অভ্যুদয়, সে দেশে তথাকথিত সাম্যভাবের আদর্শ স্থাপন ও গ্রহণ না করিলে জাতি ও সঙ্ঘের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য দেশ সেই সাম্যবাদ গ্রহণ না করিয়া ধ্বংস মুখে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের আদর্শ অন্যরূপ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বন্দ্বময় জীবনের সমর সংঘর্ষই এই দেশের প্রকৃত আদর্শ নহে। ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের মধ্যেও শান্তির প্রতিষ্ঠা আছে। স্বামীজী যেমন বলতেন—"ভারতের জাতি মাত্রই বাস্তব জীবনকে আদর্শ জীবন বলিয়া গ্রহণ করে ; একমাত্র ভারতবর্ষই আদর্শ জীবনকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। (We take ideal for the real ; other nations, the real for ideal.) ভারতের উচ্চ আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ—জীবন রহস্যের উদ্ঘাটন—ঐহিক জীবনে অনাসক্তি,

মোক্ষার্থে ও পরহিতার্থে সর্ব ত্যাগ। এই দেশের ত্যাগধর্ম অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বেদ বোধিত এই আত্মজ্ঞানলাভ দ্যোতক ত্যাগধর্ম কালক্রমে কর্মহীনতায়, জড়তায় পরিণত হওয়ায় এবং কর্মহীনতায় সামান্য জীবনসংস্থানেরও সম্ভাবনা না থাকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে অর্জুনকে অকর্মরূপ কাপুরুষতাকে নিন্দাকরতঃ বলিয়াছেন, "ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ"—হে পার্থ, ক্লীবতা পরিত্যাগ কর। মীমাংসাশাস্ত্রের পূর্ব ও উত্তর কাণ্ডে কর্মপরতা ও কর্মত্যাগরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য কল্পে গীতোক্ত ধর্ম কথিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কর্মহীনতা রূপ ক্লীবতার বিরুদ্ধেই উহার ইঙ্গিত। গীতাশাস্ত্রও ত্যাগকেই সর্বোচ্চাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবকুলকে অগ্রে কর্মতৎপর হইতে বলিয়া পরে কর্ম ত্যাগরূপ জ্ঞান নিষ্ঠায় উপস্থাপিত করাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়াস বলিয়া অনুমিত হয়। কর্মহীনতায় জীবকুল পাছে জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে—যাহাতে লোকহিতকর সত্ত্বকর্ম সহায়ে জীবকুল ত্যাগের উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; গীতাশাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অভিপ্রায়। অনেকে মনে করেন সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী পাইলেই আত্মজ্ঞান লাভে চরিতার্থ হওয়া যায়। কিন্তু গীতার সামঞ্জস্য-নীতি এইরূপ কর্মহীনতাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে উপহাস করিয়াছেন। সত্ত্বমাত্র ভান, তমোগ্রস্ত জনগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—"নিয়তং কুরুকর্ম ত্বং"—সর্বদা কর্ম কর। কর্মহীনতার চেয়ে কর্ম করাই ভাল। একেবারে কর্মহীন হইলে জীব জড়ত্বে পরিণত হয়—সত্ত্বপ্রধান ত্যাগের আদর্শ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ত্যাগের উচ্চাদর্শের সম্যক প্রতিষ্ঠাকল্পে এইজন্য ভগবান্ কর্মনিষ্ঠায় প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে কর্মে বদ্ধ হইয়া জীবকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়—জন্মমৃত্যু প্রবাহে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। এইজন্য ভগবচ্চরণে কর্মের ফলাফল অর্পণ করিয়া কর্ম করিবার উপদেশ। স্বার্থজড়িত থাকিলে হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না—

বাদ-বিসম্বাদে জীবন উদ্বেলিত হয়। ত্যাগের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত কর্মফলে জীব কদাপি বদ্ধ হইতে পারে না। ত্যাগের উচ্চাদর্শে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এইজন্যই নিষ্কাম কর্ম দ্বারা ত্যাগের আদর্শ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বামীজী একদা বলিয়াছেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে গীতোক্ত সকাম ধর্মের উদ্বেল প্রবাহে ইদানিং পাশ্চাত্য দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। আর প্রভু যীশুর সাম্যবাদ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়াই ইদানিং প্রয়োজন হইয়াছে। কর্মহীনতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত জনগণকে এদেশে গীতার ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যদেশবাসী জনগণকে যীশুর সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই জগৎ উন্নতির পথে—ত্যাগের আদর্শ পন্থায় অগ্রসর হইতে পারিবে।

স্বামীজীর কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। ব্যবহারিক জগতে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের পরিমাণ সমভাবেই বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। দেশকাল বিশেষে কোথায় কখনও বা এই সকল দ্বন্দ্বভাবের উচ্চাবচ ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোথাও রজস্তমের আধিক্য। কোথাও বা সত্ত্বরজের প্রাবল্য ইত্যাদি। সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম রক্ষার্থ দেশ ও কাল বিশেষে মহাপুরুষগণের অভ্যুদয় হয় যাঁহারা প্রকৃতির সাম্য বজায় করিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জীব ও জগতের হিতার্থে কর্ম করেন। যে দেশে ঘোর রজস্তমোভাবের দিগ্‌দেশগ্রাসী ব্যাদান, সে দেশে সত্ত্বপ্রধান সাম্যবাদের প্রকটনকল্পে প্রভু যীশুর অভ্যুদয়। যেখানে সত্ত্বভানে আচ্ছাদিত, পরন্তু জড়তার ক্রোড়ে নিদ্রিত জীবকুলে ঘোরতামস ভাবাপন্ন, সে দেশ ক্লীবতা নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণের গীতা নির্ঘোষে মুখরিত। এই সকল মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবকুল ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

ঘোর তামসাচ্ছন্ন, দাসসুলভ হিংসাদ্বেষে জর্জরিত এদেশবাসীকে

কথঞ্চিৎ রজোভাবে অনুপ্রাণিত করিতে যথাশক্তির ইচ্ছায় পাশ্চাত্যগণ এদেশের ভাগ্য বিধাতারূপে বর্তমান। পরন্তু তাঁহারা আবার প্রবল রজস্তমোভাবের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। অযুত শতাব্দী সঞ্চিত ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অনুপ্রাণিত হইবে বলিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন। এ দেশবাসীগণ রজঃপ্রধান রাজন্যবর্গ কর্তৃক সহজাত তামসভাব অতিক্রম করিবে বলিয়া তাঁহাদের শাসনাধীন রহিয়াছে। এই আদান-প্রদান পরিসমাপ্তি হইলেই হিংসা-দ্বেষ, শাস্য শাসক-ভাব জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহাই প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়। এই আদান-প্রদানে পরস্পরের সহানুভূতি অপেক্ষা করিতেছে। সুক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞলোক বুঝিয়াছেন, এই ত্রিলোক সংক্ষোভী সংগ্রামাবসানে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবল বন্যায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ড প্লাবিত হইবে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ভূখণ্ড ও রজঃশক্তি সহায়ে জীবন সংগ্রামোপযোগী প্রভাব বিস্তারে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে। এই আদান-প্রদানে জীবকুল ধন্য হইবে—জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে রজঃ প্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ, তোমরা রজোভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া জড়ভাবাপন্ন ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। কথঞ্চিৎ কর্মপ্রবণ সংঘ ও জাতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাহাদের উৎসাহের বাধা দিও না। আমাদিগকে তোমাদের প্রবল রজঃশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। দেশে শান্তির বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে তোমরাও ভারতের প্রবল আধ্যাত্মিকতা লাভে প্রস্তুত হও; তোমাদের লোকক্ষয়কারী তাণ্ডব-লীলার অবসান হইবে। আমরা সত্ত্বপ্রবল ত্যাগের আদর্শ লইয়া তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। উভয়ের আদান-প্রদানে উভয় ভূখণ্ড উপকৃত হইবার দিন আসিয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, প্রকৃতি জড় কিন্তু চলৎ স্বভাবা। পুরুষ অচল কিন্তু চক্ষুষ্মান। ইহাকেই অন্ধ পঙ্গু ন্যায় বলে। এই উভয়ের

অপূর্ব সংযোগেই সৃষ্টি প্রবাহ চলিতেছে। প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে। প্রাচ্য দেশেও তেমনি পুরুষস্থানীয় চক্ষুষ্মান—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবলে বলিয়ান। পাশ্চাত্য দেশ আবার প্রকৃতিস্থানীয়—কেবলই চলৎ স্বভাব। জগতের শান্তি সংস্থাপন কল্পে প্রকৃতিস্থানীয় পাশ্চাত্য দেশকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির আধ্যাত্মিকতার সাহায্য লইতে হইবে! পক্ষান্তরে প্রকৃতি স্থানীয় পাশ্চাত্য দেশের চলৎ স্বভাব, পুরুষ স্থানীয় আমাদিগকে কর্মপথে পরিচালিত করিবে—ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। এই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে। চিরশান্তির রক্তিমাভা পূর্বাকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে তো চাহিয়া দেখ, এই মহাসমন্বয় দর্শন জন্য দেবগণ আকাশে সমবেত হইয়াছেন। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

একত্ব ও বহুত্ব

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ (১৩০৮ সাল)

নানা তত্ত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই জ্ঞানের উৎকর্ষ অবস্থা। এ জ্ঞান বলিতে বিচার সিদ্ধ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। যেমন এক খণ্ড মৃত্তিকা বিচার করিয়া মৃত্তিকা নির্মিত ঘট শরাবাদিকে মৃত্তিকা হইতে অভেদ মনে করা। ঘট শরাবাদি নানাত্বে মৃদ্রূপ। একত্ব জ্ঞান বিচার সিদ্ধ জ্ঞান। এই বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে আমাদিগকে আপাতবিরুদ্ধ বস্তু-বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের ছায়া আনিয়া দেয়। বিচারপ্রণালীতে এইরূপ একত্ব জ্ঞান লাভ পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানে মৃত্তিকার অস্তিত্ব ভিন্ন মৃদ্ বা ঘটশরাবাদি বলিয়া পৃথক কোন জ্ঞান থাকে না।

জাগতিক জ্ঞান মাত্রই দ্বৈত সংঘাতোৎপন্ন বা বস্তন্তর সাপেক্ষী। তুলনা ভিন্ন বাহ্যিক বা আন্তরিক জগতের বস্তুজ্ঞান জন্মিতে পারে না।

যেখানে তুলনা সেখানেই দ্বৈত কল্পনা। নতুবা তুলনা করিবে কাহার সহিত? অতএব যেখানে বাহ্যিক বা আন্তরিক ভাব (Ideas) সেখানেই দ্বৈত ভাব। আলো আছে, তাই আঁধার জ্ঞান। সুখ আছে, তাই দুঃখ জ্ঞান। অথবা আঁধার আছে, তাই আলো জ্ঞান; দুঃখ আছে, তাই সুখ জ্ঞান। এই দ্বন্দ্বভাব বীজাঙ্কুর ন্যায়ে অনাদিকাল প্রবহমান। দ্বন্দ্বভাব যদি অনাদি-সিদ্ধ হয়, তবে বেদান্তবেদ্য একত্বজ্ঞান কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? ইহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পূর্বকথিত মৃত্তিকা ও ঘটাদি দৃষ্টান্ত অবশ্যই বলিতে হইবে যে, নাম-রূপাদি উপাধিবশতঃ মৃত্তিকা ও ঘটাদি বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ই এক পদার্থ। ঘটশরাবাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার কর; দেখিবে "মৃত্তিকেত্যের সত্যম্"। এইরূপ যাহাকে তুমি দ্বন্দ্বভাবাপন্ন মনে করিতেছ সূক্ষ্ম বিচারে তাহা একেরই বিভিন্ন পরিমাণমাত্র প্রতীত হইবে। স্থূল দৃষ্টিতে আলো-আঁধারে নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে তাহা একই পদার্থ। এক স্থলে আলো পরমাণুর পরিস্পন্দনাভাব, অন্যত্র পূর্ণ পরিস্পন্দন। তীব্র আলোক গোলকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধকার দেখিতে পাইবে; অন্ধকারে অন্ধকারজ্ঞান তো স্বতঃসিদ্ধ। ফলে একই দাঁড়াইতেছে। কারণ ভাবিয়া দেখ—"ভাবরাজ্যে নিরপেক্ষ সত্তা ও অসত্তা একই পদার্থ"। সুখ যাকে মনে কর তা অবশ্যই আপেক্ষিক দুঃখের তুলনায়। সে সুখ পদার্থকে বুদ্ধির অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাতে অনন্ত দুঃখের কীটাণু দেখিতে পাইবে। দুঃখেও সেরূপ অনন্ত সুখকীটাণু দৃষ্ট হইবে। সুতরাং ফল যখন একই দাঁড়াইতেছে, তখন সুখ দুঃখকে আর বিভিন্ন বলিয়া মনে কর কেন? উপকারের সঙ্গে সঙ্গেই অপকারের বীজ অঙ্কুরিত; আবার অপকারের সঙ্গে সঙ্গেই পরোপকারের অযুত উৎস উন্মুক্ত হইতেছে। ভালতে মন্দের বীজ, মন্দে ভালর বীজ সমপরিমাণে উপ্ত হইতেছে। সুতরাং ভালমন্দ বা সুখদুঃখের নির্দোষ সংজ্ঞা হইতে পারে কি? সরলরেখাকে বাড়াইয়া দাও; ক্রমে বক্র

হইয়া আসিবে ; বক্র রেখাতে আবার অনন্ত সরলরেখার সমষ্টি দেখিতে পাইবে। তবে আর সরল ও বক্র রেখার ভিন্নতা কোথায় ? ভালবাসা ও বিরহে সমসুখ। একথা ভুক্তভোগী প্রেমিক ও বিরহীর অভিমত। স্বর্গে নরকভীতি, নরকে আবার স্বর্গ লাভেচ্ছা সমভাবে মনের শান্তি বিনষ্ট করিতেছে। অতি নিম্ন ও অত্যুচ্চ দেশ বিভিন্ন দিক হইতে এক পদার্থ নয় কী ? পূর্ণ শক্তি বিকাশে নিস্পন্দতা আনয়ন করে ; আবার নিস্পন্দনাবস্থা পূর্ণ শক্তির বিকাশভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—এক সাপেরই চল ও অচল ভাব মায়াশক্তি ও ব্রহ্মের ভাব প্রকাশ করে। পূর্ণ বাগ্মিতা মৌনভাবের পরিচায়ক ; পক্ষান্তরে মৌনভাব বাচালতার উন্মেষক। জড় পদার্থ (Matter) এবং মন (mind) একেরই স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। একটি পদার্থের মাত্র প্রান্তদ্বয় দেখিয়া তাহাকে দুই মনে করা ত অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। তড়িদণুপ্রাণিত কোন লৌহদণ্ডের দুই প্রান্তে পজেটিভ (positive) এবং নেগেটিভ (negative) তড়িচ্ছক্তি দেখিয়া লৌহদণ্ডকে দুই মনে করা নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন। পণ্ডিত বলিতেছেন একেরই এক মহাশক্তি দ্বিধা স্ফুরিত হইয়া positive ও negative আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ জগতের যে কোন দ্বন্দ্বভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখ না কেন, দেখিতে পাইবে, একই অবস্থার পরিচায়ক। অত্যন্ত শৈত্য এবং অত্যন্ত তাপে জল ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও বিজ্ঞান নিষ্পাদিত তত্ত্ব। অত্যান্তাভাব পূর্ণভাবের উদ্ভাবক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আপাতসত্য জীবজগদাদি জ্ঞানীর চক্ষে ইন্দ্রজালবৎ অলীক ; জ্ঞানীর জগদিন্দ্রজাল জ্ঞান, অজ্ঞের উপহাস্যপদ বিষয়। কাহারও মতে জন্ম কাহারও মতে মৃত্যু ভাবী সুখসোপান বলিয়া বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কেহ ক্রমোন্নতি (Evolution) কেহ বা ক্রমাবনতি (Involution) মতে এক ঘূর্ণিত চক্রেই অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকের বর্ণনা করিতেছে মাত্র। অত্যন্ত তাপ ভাবী জলধারা বর্ষণের এবং অত্যন্ত বর্ষণ ভাবী তীক্ষ্ণ তাপদ্যোতক প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্তিমিত বায়ুমণ্ডলে প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাস এবং প্রবল ঝড়ে বায়ুমণ্ডলের ভাবী নিস্পন্দতা সূচিত হয়। অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশা ভাবী সুখ সূর্যোদয়ের এবং অত্যন্ত সুখলাভ ভাবী দুঃখ দুর্দ্দশার স্পষ্ট পরিচায়ক। বৃক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বীজে এবং বীজ আবার বৃক্ষে পরিণত। জন্মে মৃত্যু এবং মৃত্যুতে ভাবী জন্ম বীজ প্রোথিত রহিয়াছে। পূর্ণ স্বাস্থ্যবান মৃত্যুপথে অগ্রসর; চিররোগী পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভে পুনর্জীবিত; জ্ঞানী মানবে মহা অজ্ঞতার চিহ্ন এবং অজ্ঞানী পশু-পক্ষী-কীট পতঙ্গকে অনন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কখনো বা ধর্মে অধর্মের, অধর্মে আবার ধর্মের ভাবী বীজ নিহিত দৃষ্ট হইতেছে। বর্তমান উন্নতি ও দিগোদ্ভাসী সভ্যতালোকে মৃত্যুর ছায়া এবং অনুন্নত অসভ্য অন্ধকারে ভাবী জীবন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক কলযন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া জগতের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বিপদাশঙ্কার সহস্রফণা বিস্তার করিতেছেন; পক্ষান্তরে বিপদাশঙ্কা দূরীকরণমানসে মানব নানা পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। দুর্ভিক্ষে সুভিক্ষ এবং সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষ সূচনা করিতেছে। দেশ বিশেষে কতিপয় ক্রোরপতির অভ্যুত্থান স্বদেশবাসী অপর সাধারণের দীন দরিদ্রতা সূচনা করিতেছে। আবার ইতর সাধারণের নিরুৎসাহ ও দৈন্য ভাবী ক্রোরপতির অভ্যুত্থান প্রকাশ করিতেছে। ধর্মগ্লানি ধর্মসংস্থাপক মহাপুরুষগণের আগমন বিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে দেশ বিদেশে মহাপুরুষ সংস্কারকগণের আগমন ধর্মনামধারী তত্তদ্দেশবাসীগণের উচ্ছেদ সাধক। রাজকার্যে উদাসীন বিলাসপরতন্ত্র নরপতি প্রজাবিদ্রোহানলে নিজ শোণিতদানে কর্তব্য অপালনরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। প্রজাতন্ত্রমতের বিজয় দুন্দুভি ঘোষণা আবার রাজার অকর্মণ্যতা ও অপারগতা সূচনা করিতেছে। সর্বদেশে নৌবল ও সৈন্য বৃদ্ধি ভাবী কুরুক্ষেত্রের যবনিকা উত্তোলন করিতেছে; আবার মহাযুদ্ধের আয়োজনে নৌবল ও সৈন্যবল বৃদ্ধি হইতেছে। রাজার রাজ্য বহু দেশকে একত্রিত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্যের

ভাবী সংস্থাপনা সূচনা করিতেছে, আবার বহুধা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাদি ভাবী সাম্রাজ্য সংস্থাপক দিগ্বিজয়ীর রাজ্যপিপাসা বলবতী করিতেছে। অত্যন্ত অবসাদ অতি উদ্দীপনার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অত্যন্ত কামকাঞ্চনাসক্তির অবক্ষেপে বিল্বমঙ্গলকে ঈশ্বরলাভ করিতে দেখা যাইতেছে, আবার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে সিদ্ধকল্প বিশ্বামিত্রকে মেনকায় রমণোন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত দৃষ্ট হইতেছে। তরঙ্গের প্রবলোচ্ছ্বাস গভীর পতনের এবং গভীর পতন আবার ভাবী অভ্যুত্থানের সূচনা করিতেছে। কখনো বা বৈরাগ্য ভূয়সী ভোগাশক্তির ও বহু ভোগাশক্তি বৈরাগ্যের সূচনা করিতেছে। এইরূপ একভাবই দুইরূপে স্ফুরিত হইয়া জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে।

একই বস্তু বা ভাব দর্শনে বিভিন্ন মানব বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত; একই স্ত্রীকে কেহ জননী, কেহ প্রণয়িনী, কেহ আবার নিরয়রূপিণী দর্শন করিতেছে। একই মানব সম্বন্ধ বিশেষে কখনও বা পিতা, কখন পুত্র, কখন ভ্রাতা, কখন বা মাতুলরূপে অভিহিত হইতেছে। ঘোর পুতিগন্ধ পরিপূর্ণ মহাশ্মশানে কেহ কালের বিকট ব্যাদান দর্শন করিয়া তাহা মহাদুর্নিরীক্ষতা ও অপবিত্র মনে করিতেছে; কেহ আবার সর্ব্বজন পরিত্যক্তাবস্থায় একমাত্র আশ্রয়দাতা জীবন্ত বৈরাগ্যভূমি শ্মশানকে মহাপবিত্র মনে করিতেছে। একই শক্তিতে কাহারো শুক্তিজ্ঞান কাহারো বা রজত ভ্রম উপস্থিত হইতেছে। একই জল বারি, পানি, ওয়াটার নাম ধারণ করিয়াছে। একই কাল জন্ম মৃত্যুরূপে অবস্থান করিতেছে। একই ভাবপ্রবণতা প্রেমপ্রীতি, সৌহার্দ্য ভক্তি, দ্বেষ, ঈর্ষারূপে স্ফুরিত হইতেছে। একই দেব তেত্রিশ কোটী দেবতারূপে, একই বায়ু পানাপানাদিরূপে, একই তেজ অগ্নি বিদ্যুৎ, সূর্য্যাদিরূপে স্ফুরিত হইয়া জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে। একই দেব সর্বভূতে গূঢ় অবস্থান করিতেছেন। একই গতি (Motion) শব্দ, আলো, বিদ্যুৎ ও আকর্ষণ শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই সকলের ভিত্তিমূল, একই আত্মা এইরূপে বহুধা বর্ণিত হইতেছে।

এই জগতের কোন বিষয় কেন পরীক্ষা করে দেখ না, দেখিবে একই পদার্থ ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়াতে এবং প্রতিক্রিয়ার পর পুনঃ ক্রিয়াতে পরিণত হইয়া দ্বৈতাভাসে জীবকে প্রতারিত করিতেছে। মূলে এক পদার্থই যেন দ্বৈত ও বহুত্বে পরিণত হইয়া জীবভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু শ্রুতি এই বহুত্বের মধ্য দিয়া একাত্বানুভব করিয়া বলিতেছেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" যখনই অলীক নানাত্বে জীবকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিতেছে আর্য্য ঋষি তখনই বলিতেছেন, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" এই একত্ব প্রথমতঃ বিচার প্রণালীতে বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে। পরে আত্মানুভব করিয়া পরম জ্ঞান পরম আনন্দে পরিমগ্ন হইবে। এই একত্বানুভূতিই জ্ঞান ও তপস্যার চরম ফল। এই একত্বই অনুভব করিলে জীব বলিতে পারে,—

"প্রত্যগেক রসং পূর্ণ মনন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ ন নাস্তি কিঞ্চন॥"

দুইটি বন্ধু

(গল্পাকারে লিখিত প্রবন্ধ)

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ—১৩০৮ সাল

দুই বন্ধু দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। যাইতে যাইতে একজন সাধুর সঙ্গে রাস্তায় উভয়েরই আলাপ হইল। তিনজনে একত্রিত হইয়া হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাত্রা করিলেন। সাধুসঙ্গে উভয় বন্ধু পরম আহ্লাদিত, ধর্ম ও দর্শনের নানা প্রসঙ্গে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হইতে লাগিল। বন্ধুদ্বয়ও নির্মলচিত্ত; সাধু সমাগমে তাহারা আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। একজন বন্ধুর তপস্যায় ভারী ঝোঁক; ঈশ্বর লাভে মহা অনুরাগী, ত্যাগশীল ও প্রশান্তচিত্ত। অন্য জনের শরীরে অসীম বল, বুকে অসীম সাহস, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবোপকার করণেচ্ছু। সাধুসঙ্গে উভয়ের ভাবই স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতে লাগিল। হরিদ্বার

পঁহুছিয়া এক বন্ধু সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া, সাধন ভজনায় মনোনিবেশ করিলেন। অন্যজনের ঐ সকল ভাল লাগিত না। তিনি হরিদ্বারে সেই সাধুর ভিড়ে গিয়া দেখিতেন, কাহারাও ধুনিতে কাঠ বা কয়লা নাই, কাহার এখনও খাওয়া হয় নাই এবং তৎক্ষণাৎ ঐসকল অভাব যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়া দিতেন। প্রথম বন্ধুর ক্রমে বিবেক বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি দ্বিতীয় বন্ধুকে বলিলেন, "ভাই, আমি আর দেশে যাইব না ; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর লাভের চেষ্টায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব।" দ্বিতীয় বন্ধু তাহাকে কত বুঝাইলেন, বলিলেন—"অনির্দেশ্য, কাল্পনিক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ জগৎ উপেক্ষা করা তোমার ন্যায় জ্ঞানীর পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয়। চল, ভাই, দেশে ফিরিয়া যাই। তোমার মা-বাপ তোমার জন্য শোকে অস্থির হইবেন।" কিন্তু প্রথম বন্ধু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ঘোর তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়া ইষ্ট উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন তাহার আর সংবাদ পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় বন্ধুটি বন্ধুবিচ্ছেদে শোকাভিভূত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া সন্ন্যাসী বন্ধুর মা-বাপের কি অবস্থা হইল, সংসারী মাত্রে তাহা বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয় বন্ধুটি একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন ; স্বচ্ছল আয়ে পারিবারিক অবস্থা উন্নত হইল ; কিন্তু তিনি পরোপকার ব্রতটি এখনও ভুলিয়া যান নাই। উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা তিনি আশেপাশের গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করেন, অতিথি-অভ্যাগতকে নিরতিশয় যত্নে সেবা করেন। লোকের বিপদে নিজেকে বিপদান্বিত মনে করেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ; পরদুঃখে দয়ার্দ্র চিত্ত। এই বন্ধুর ব্যবহারে আশেপাশের লোক তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহার একটা রোগ এই যে ঈশ্বরের কথা যেখানে হয়, সেখানে তাঁহার গতিবিধি নাই ; যেন হিরণ্যকশিপু ; ঈশ্বর নামে তাঁহার বড়ই অশ্রদ্ধা। অথচ কাহারও বয়স্থা কন্যার বিবাহের সাহায্য করেন, কাহারও উপনয়ন সংস্কার করাইয়া দেন, গাঁয়ের শব দাহ করিতে যান, দুঃখী জানিয়া অজ্ঞাতসারে জানালা দিয়া

হয়তো কখনো টাকা-পয়সা ফেলিয়া দিয়া আসেন, যেখানে যাহার কোন বিপদ শোনেন তখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া যান। অপমান নাই, লোকের কথা গ্রাহ্য করেন না। যাহা ভাল মনে হয় তাহাই করেন; এ জীবনে তিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। এইরূপ কার্য করিয়া আমাদের বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন।

আমাদের প্রথম বন্ধু যোগ-ধ্যান-তপস্যার প্রভাবে অতীব শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; অনামাদি সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। তাঁহার সেই সংসারী বন্ধু মুমূর্ষুদশাপন্ন; ধ্যানে এ বিষয় অবগত হইয়া গগন পথে মুহূর্তে তিনি বন্ধুর পাশে উপনীত হইলেন। বলিলেন, "ভাই আমায় চেন?" দ্বিতীয় বন্ধু সজল নয়নে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছি, কোথায় যাইব জানি না; আমি এখনও বিশ্বাস করি না।" বলিতে বলিতে তাহার মহাশ্বাস উপস্থিত হইল। যোগসিদ্ধ বন্ধু দেখিতে লাগিলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, বলিতেছেন—মুখে বা আমায় নাই মানিয়াছিলি; চল অদ্য হইতে আমার পার্শ্বগ হইয়া থাকবি, আয়।

কাল ও কালী

উদ্বোধন—৯ম বর্ষ—১৩১৪ সাল

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত আমরা শাস্ত্রমুখে অবগত আছি, সেই বিচারিত মতগুলি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই,—আমাদের জন্মস্থিতি মৃত্যুদৃষ্টেই উক্তরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তবাদ প্রচারিত হইয়াছে। মানুষ জন্মিতেছে, বাল্য-যৌবন-জরার মধ্য দিয়া মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে। সুতরাং মানুষ ভাবে—এ জগতেরও একদিন জন্ম হইয়াছে, পঞ্চভূত সংঘাতে নানারূপ তরঙ্গিত হইয়াছে, আবার অন্তিমে আমাদের মতই লয় হইয়া যাইবে। কেহ জগৎ জন্মিতে দেখে নাই, কেহ ইহার নিঃশেষে লয়ও দেখিবে না। "ব্যক্ত

মধ্যানি ভারত” বলিয়া ভগবান গীতামুখে অর্জ্জুনকে আদি ও অন্ত “অব্যক্ত” বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। ইহা সমষ্টি জগৎ বা বিরাটে এবং ব্যষ্টি জগৎ বা প্রতি জীবে সমভাবে প্রযুজ্য।

সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহা প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিষয়। ভারতবর্ষীয় দর্শনকারগণ যদিও প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি-রহস্য ভেদে নানারূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি আস্তিক দর্শন মাত্রেই মুখ্যভাবে অধ্যাত্মপর—“আমি কে?” এই প্রশ্নের সমাধানে যত্নশীল। চিরদিন মানুষ ইহার বিচার করিয়া আসিতেছে; চিরদিনই মানুষ ইহার বিচার করিবে।

অনেক লোক অতীতের স্মৃতি ভালবাসে। কিন্তু আপাতমোহন জগৎ দৃশ্যে অধিকাংশ মানব বিমুগ্ধচিত্ত—অতীত বা ভাবী পরিণাম ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। শৈশবের স্মৃতি সকলেই ভালবাসে। বর্ত্তমান ভোগেচ্ছা মানুষকে উন্মাদ করে। ভবিষ্যতের বিশাল রাজ্যে চাহিতে সকলেই ভীত হয়। যাহারা অতীত বিষয় লইয়া আলোচনা করে, তাহারা প্রায়ই অতীত গৌরববাদী (Pessimist)। যাহারা বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, তাহারা কর্ম্মপ্রবণ ও জগন্নিত্যবাদী (Positivist) এবং যাহারা ভবিষ্যত জীবন চিন্তামগ্ন, তাহারা প্রায়ই ভাবীউন্নতিবাদী (optimist)

প্রাচীন আচার পদ্ধতি রীতি-নীতি অনুসরণে একান্ত-নিষ্ঠ জনগণ ভবিষ্যৎ চিন্তামগ্ন দার্শনিকদিগের প্রতি সর্বদাই কটাক্ষ করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজে আমরা তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ প্রায় সকলকেই আচারহীন বলিয়া উপহাস করেন। আমি শুনিয়াছি এতদ্দেশীয় বড় বড় দার্শনিকগণ এই আচারনিষ্ঠ আর্য্য সন্তানগণের নিকট নাস্তিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যাহারা বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত তাহারা প্রয়োজন মত কতকটা প্রাচীনবাদীর আবার কতকটা ভাবী চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের মত অবলম্বন করিয়া উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে বিচারশীল দার্শনিকগণ, যাঁহারা

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রহেলিকা ভেদে নিয়ত চিন্তান্বিত, তাঁহারা প্রাচীন আচারাদিকে অথবা বর্ত্তমান জীবনের উদ্দাম উন্মত্ততাকে উদাসীন ভাবেই অবলোকন করিয়া থাকেন।

আদিম অবস্থায় মানুষ মৃগমাংসে উদর পূর্তি করিত; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিত; কুশ ছড়াইয়া আসন করিত। এখন ওইগুলি মহাপবিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা প্রাচীন সুতরাং আচারাঙ্গ। প্রাচীনকালে বালকদিগকে গুরুগৃহে বেদপাঠ জন্য "উপনীত" করা হইত। এখনও সে আচারের জীর্ণ কঙ্কাল বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনয়ন ক্রিয়া এখন "যজ্ঞসূত্রে" পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দু বলিতেছেন—ইহাই যথার্থ "ধর্ম্ম"। ইহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় করিলেই তুমি অনার্য্য, অহিন্দু। কাশীতে অবস্থান কালে উপাধ্যায় একদিন বলিলেন, গোক্ষুর পরিমিত শিখা না রাখিলে সে ব্রাহ্মণ নহে। তখন বুঝিলাম আদিম পূর্বপুরুষগণ সকলেই দীর্ঘ বেণী রাখিতেন, তাহার পরিণতি এখন গোক্ষুর শিখায় পর্য্যাপ্ত। তিলকাদির ছিটাফোঁটার চিহ্ন প্রাচীন সর্ব্বাঙ্গলিপ্ত বিভিন্ন বর্ণাদির পরিণতি কিনা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। এবম্বিধ দৃষ্টান্তে পাঠকগণ বুঝিয়াছেন, অতীত গৌরবাদী জনগণ, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মাচার বলিয়া তদনুসারেই জীবন গঠন করিতে যত্নপর হন। হিন্দু পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রাদি ইহাঁদের মত-পোষক যন্ত্র। এই সকল শাস্ত্রোক্ত পন্থায় একান্ত নিষ্ঠ হইয়া চলিলে যে যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ হয়, তাহাতে আমাদের সন্দেহ না থাকিলেও ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, যে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন আচার রীতি-নীতি বর্ত্তমান থাকায় একমাত্র আত্মজ্ঞান যাহাতে সর্ব্বজীবের সমানাধিকার—তাহাই জীবনের একমাত্র অন্বেষ্টব্য! দেশকালপাত্র অনুসারে আচার-ব্যবহার ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু "আমি কে" এই বিচার চিরদিন একরূপ চলিতেছে ও চলিবে। সুতরাং যাহারা অতীত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জীবনকে তদনুরূপ আদর্শে

গঠিত করিতে চায়, তাহারা তদনুরূপ চেষ্টাপর হউক, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সে যেন আমার বিচারের পরিপন্থী না হয়। "আমার পূর্বপুরুষ বড় মানুষ ছিলেন, আমি এখন পরমুখাপেক্ষী ভিখারী"— এ অভিনানে বিশেষ কিছু ফল আছে বলিয়া আমার বোধগম্য হয় না।

প্রাচীন গৌরব মত-পোষকগণ প্রায়ই তামসিক প্রকৃতি। ঐহিক বা ভাবী জীবন সমস্যার সমাধানে তাঁহাদের আগ্রহ দেখা যায় না। পাড়াগাঁয়ে দেখিয়াছি এই আর্য্য-ধর্ম্মের ধ্বজাধারীগণ "অগ্রে বাঁ পায়ে কি ডান পায়ে জল দিতে হইবে" এই তর্কে দিবসের অর্দ্ধেক কাটাইতেন। কতকগুলি স্মৃতির আচার, কতকগুলি দেশাচার বা স্ত্রী আচার ইঁহাদের ধর্ম্মের সূত্র স্বরূপ। ইঁহাদের কথায় প্রাণ নাই। আচারে অনুরাগ নাই, মুখে প্রতিভা নাই, জীবনে উদ্যম নাই—প্রাচীন গৌরব স্তম্ভের ভগ্নস্তূপ স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ইঁহারা যেন মৃত্যুর ছায়ায় দণ্ডায়মান। যেন প্রদীপের ক্ষীণালোকে প্রাণশূন্য জীর্ণ কংকালগুলি অর্ধনিদ্রিত। ইঁহারা জগতের ইতিহাস জানেন না, বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের খবর রাখেন না—আহার, নিদ্রা, মৈথুন—ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রে পশ্বাচার বলিয়া বোধ হয় বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানদর্শী রাজসিক ভাবে অনুপ্রাণিত, কর্ম্মশীল ভোগের জন্য। এই দেহ-সর্ব্বস্ব জীবগণ স্ত্রী-অন্নাদি লাভে ব্যাকুল চিত্ত। সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত কথন বা দৈব কথন বা পুরুষকার বিশ্বাসী এই বর্ত্তমান-দর্শী জীবকুল, জীবনসংগ্রামের রহস্য কতকটা যেন বুঝিয়াছেন। বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজরীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য অপরাবিদ্যার উন্নতি, এই বর্ত্তমান দার্শনিকগণের উদ্দেশ্য। ইহারা পেছনের দিকে চাহে না, ভবিষ্যতের জন্যও ভাবে না। যেন সেনাপতির আদেশে যুদ্ধে চলিয়াছে, অগ্রপশ্চাৎ দেখিবার তাহার অবসর নাই। "আমি কে" ভাবিবার সময় নাই। কার্য্য করিয়া যাইতেছে, কিন্তু নিজ ভোগের জন্য—আত্মতৃপ্তির জন্য। ইহাদের চেষ্টা ও যত্নপ্রসুত তত্ত্বগুলি আধুনিক জগতে সভ্যতার কীর্ত্তি স্তম্ভ। ইহারা সামাজিক ও গৃহস্থাশ্রমী।

ভবিষ্যতের অন্তস্থলে যে সকল অনাদি সত্য রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাকুলচিত্ত জনগণ সত্ত্বপ্রধান, দার্শনিক, মহাকর্ম্মপ্রবণ আশ্রমত্যাগী। ইঁহারা ভূত ও বর্ত্তমান জীবন তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়াছেন। অসীম ভাবী জীবন ইঁহাদের চিন্তাক্ষেত্র। অসীম ভাবী রাজ্য, যাহাতে অনাদি কাল হইতে কত অযুতাযুত প্রাণী প্রবেশ করিয়া আর কোনও সংবাদ দিতে পারে না—তাহারই যবনিকা উত্তোলনে ইঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতো যত্নশীল। সে চিন্তাশীলতা তাঁহাদিগকে ও জগতের জনগণকে ক্রমন্নোতি পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে। যাঁহারা এই ভাবী জীবন রহস্য ভেদে সফল হইয়াছেন, তাঁহারাই জগতের নেতা—অবতার—Prophet। ইঁহারা অনাশ্রমী অসাম্প্রদায়িক, জগদ্ধিতাকারী, অন্ধকারে আলোকস্তম্ভ—অহেতুক দয়াসিন্ধু—পরহিতে জীবনধারণশীল। ইঁহাদেরই উড্ডীন পতাকার নিম্নে সহস্র সহস্র নরনারী একত্রিত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় সূচনা করে।

এই অন্নপানাদিবর্দ্ধিত শরীর, এই সংঘাত দেহপঞ্জর, যাহা প্রকৃতির নিয়মে অবশ্যম্ভাবী লয়মুখে অগ্রসর হইতেছে, ইহার আদি কোথায়, ইহার পরিণতি কোথায়! এ চিন্তা সকল জীবেই অন্ততঃ ক্ষণেকের তরেও স্ফুরিত হয়। জ্ঞানপ্রবণ জীবগণে এই চিন্তার স্ফুরণ অত্যধিক। এইজন্য ইঁহারা ভবিষ্যতের অন্তস্থলে কি আছে, জানিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত। এইজন্য ভবিষ্যদ্দর্শী জ্ঞানী, বর্ত্তমানদর্শী কর্ম্মী এবং অতীতদর্শী অধিকাংশ স্থলেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত। আমরা প্রত্যেক মনুষ্য জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই, বাল্য বা অতীত কাল অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, বর্ত্তমান জীবন উদ্দাম তাণ্ডবপূর্ণ, কর্ম্মবৈচিত্র্যে নিরতিশয় ব্যস্ততাপূর্ণ এবং ভাবীকাল, জীবন-সমস্যা সম্পূরণের অবসর প্রদান করে। বাল্যের এই অব্যক্তভাবে ব্রহ্মার, বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামে বিষ্ণুর এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অব্যক্ত রাজ্যে জ্ঞান শরীর মহাদেবের অধিকার। ইহাই Indian Trinity.

স্বীয় স্বীয় জীবনের আলোচনা করিয়া, এই শরীরের ক্রম পরিবর্ত্তন

দেখিয়া, মানুষ আপনাতে যে বাল্য, যৌবনত্ব ও বৃদ্ধত্বাদির আরোপ করে, তাহাই ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কাল বলিয়া উক্ত হয়। এই ব্যক্তিগত কালত্বই সমষ্টি জগতে অতীত, বর্ত্তমান, অনাগত কল্পাদি কল্পনার সহায়কারী হয়।

সূর্য্যের উদয়াস্ত রূপ কল্পনাকালের জন্মদাতা, তাই কাল "রবিসুত" বলিয়া কথিত হয়। রবিসুত সূর্য্য হইতে জাত। যদিও সুদূরস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবীর গতি হইতে কালের আংশিক আভাস পাওয়া যায়, তথাপি সূর্য্যের অধ্যাসিক গতাগতি হইতেই জগতে কালের জন্ম হইয়াছে। এই বহিঃস্থকাল আবার জীবের জন্ম স্থিতি-লয় রূপ পরিবর্ত্তনে মিশ্রিত হইয়া—অন্যোন্যাধ্যস্ত হইয়া মানুষকে "কালের" বিষয় বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। এই কাল পুরাণাদিতে মহাকাল, মৃত্যু, যম, রুদ্র, বৈবস্বত, কল্প ও অন্যান্য নামে অভিহিত হয়। মানুষের অজ্ঞতা বা অল্পজ্ঞত্বই কালকে এত ভয়ংকর করিয়া তুলিয়াছে। নতুবা যাহার অস্তিত্ব অধ্যাসিক, দৃঢ় মনঃসংযোগে যাহার আভাস পাওয়া যায় না, তাহার নামে মানুষ ভীত হয় কেন? অতীতদর্শী কালের নামে শিহরিয়া উঠে। কর্ম্মসংগ্রামে ব্যস্ত বর্ত্তমানবাদী জীবনের অযুত সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভে ও কালের নামে অবসন্ন হয়। ভবিষ্যদ্দর্শীর কাছে কাল করজোড়ে দণ্ডায়মান—থরহরি কম্পমান—"মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" শ্রুতির নির্দ্দেশ।

মানুষের চেষ্টা—সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে এই কালের হস্ত হইতে—কালের শাসন হইতে—মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযুক্ত। ষষ্ঠী, মাকালের পূজা হইতে বেদান্তের "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি জলদনির্ঘোষ সকলই এই কালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। দণ্ডোত্মকর মহাকালও বিচলিত হইবার নহে। সর্ব্বগ্রাসী কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। তাই গীতায় অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"—আমি লোক-ক্ষয়কারী মহাকাল। এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাসূচক কাল, সর্ব্বব্যাপী অনাদি ব্রহ্মজ্ঞপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ইহা

নিত্য পদার্থ। বেদান্ত মতে অধ্যাসিক বা মিথ্যা। ইহা অজ্ঞতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; স্বস্বরূপাবাপ্তির তীব্র আলোকে কালের ছায়াও থাকে না।

এই "Idea of time" বা কাল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া মৃত্যুভয়ে ভীত হয়; শরীর পঞ্জর ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ করে; কারণ এই ভূতবিকার শরীরটাকেই জীব আপন বলিয়া জানে। এই পঞ্চকোষাতীত আত্মার স্বরূপ না জানিতে পারায় জীবের কালভয়-মৃত্যুভয়। আত্মজ্ঞানে জীব অভয়ের পার প্রাপ্ত হয়। কালের কণ্ঠে অসিপ্রহারে আত্মজ্ঞ জীব কালের হনন করিয়া নির্ভয়ে বলে "জয় কালী, জয় কালী"। এই আত্মজ্ঞানই কালের নির্হন্ত্রী।

এই আত্মজ্ঞান বা স্বস্বরূপ প্রাপ্তি হওয়া মাত্র কাল মুহ্যমান হইয়া পড়েন—জ্ঞানশক্তি—শাণিত খড়্গহস্তা তাহার বুকে নৃত্য করেন। ভৈরবের মহাভৈরবী, ভীতির মহাভীতি মহাকালী দিক্‌দেশ নিমিত্ততার উপর নৃত্য করিয়া উহাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কোথায় বা চন্দ্র সূর্য্য—কোথায় বা গ্রহ নক্ষত্র! মহাকালীর ভীম তাণ্ডবে সৃষ্টি পরমাণুগত—দৃশ্য নাই—দ্রষ্টা নাই—দৃষ্টিও নাই। সব একাকার—শিব শবরূপে পরিণত—সংসার শ্মশান—আমিত্ব, তুমিত্ব সকলি একত্বে পর্য্যাপ্ত। এই মহালয়ে কে কার খবর রাখে? মহাকালীতে সকলই লয়গত।

অতীত বা বর্ত্তমানদর্শী এই লীলাতাণ্ডবে ভীত হইয়া মহাকালীর দক্ষ হস্তদ্বয় দেখিতে চায়। বলে "রক্ষ রক্ষ"। ভবিষ্যদ্দর্শী মহামায়ের সর্ব হস্তের উত্তোলিত অসির দিকে কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয়া বলে "এই নে মা, আমি তোর জগদিন্দ্রজাল ভেদ করিয়া তোর চরণে জন্মের মত বলি হইতে আসিয়াছি। আমি অভয়ের পারে আসিয়াছি। আমার দেহাত্মবুদ্ধির উচ্ছেদ হইয়াছে। আমার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া তুই করে ধারণ কর।"

মহালয়—মহাশ্মশান—চিত্তাবিভূতি—ইহাই ভবিষ্যদ্দর্শীর সাধন

সহায়। ফেরু—চিৎকার, শবসংঘাত, রুধিরাক্ত রণভূমি, রোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার ও ধ্বংসের তাণ্ডবে ভবিষ্যদ্দর্শীর আনন্দ—সে সকলকে অনায়াসে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখেতে সুখের ছায়া দেখিতে পায়। এই ভবিষ্যদ্দর্শীই বীরপদবাচ্য কৌল। কারণানন্দে সে কার্য্যকারণাতীত হয়। তার "উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে!" আত্মজ্ঞানে পরাপ্রকৃতি তার বশীভূতা। ভোগত্যাগ লক্ষণাদ্বারা জীব পরমাত্মার সমীকরণবশতঃ মহামৈথুনে তাহার শিবত্ব লাভ হয়। যদৃচ্ছা প্রাপ্ত মৎস্যমাংস আহারে তাহার দেহরক্ষা—সে বিধিনিষেধের অতীত। ইহাই বীরের পঞ্চমকার সাধনা। ইহাই যথার্থ কালী পূজা।

ক্রমাভিব্যক্তিবাদ

উদ্বোধন—৪র্থ বর্ষ, ১৩০৯ সাল

ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে ক্রমাভিব্যক্তিতে (Evolution) জড় ও প্রাণিজগতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে চাহেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানবের মনে সেই ক্রমবিকাশবাদ এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জড় জগতের ক্রমোন্মেষণ যখনি জীবজগতে পর্যাপ্ত হইয়াছে, সে স্থলে আগন্তুক চৈতন্যের কারণানুসন্ধানে অপারগ হইলেও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে সকল যুক্তি কৌশল অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত পোষণ করিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচায়ক। ঐ মতের দোষ গুণ বিচারে আমাদের প্রয়োজনাভাব। এতন্মতে জীবজগতে সুখদুঃখাদ্যনুভব (Feeling), অনুধ্যান (Reflection) এবং জ্ঞান (Knowledge) বিকাশের ক্রমোভেদ বিচার করিয়া দেখিলে ক্রমোন্মেষণবাদী দার্শনিকগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ইঁহারা বলেন, সুখদুঃখাদ্যনুভব মানব জীবনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। যদিও

অন্তর্নিহিত কথঞ্চিৎ জ্ঞানের অভাবে সুখদুঃখাদির অনুভব কল্পনার অযোগ্য হয়, তথাপি অনুভূতির প্রাবল্য দেখিয়া মানব মনের তাদৃশ প্রাথমিক স্ফুরণ অদোষ বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানব শিশুর যুগপৎ হাস্য-ক্রন্দনরূপ বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে ইঁহারা জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আদিম অসভ্য জাতি যাহা মানব সমাজের শৈশবাবস্থা, তাহা আজ সুসভ্য সমাজে পরিণত। ঐ সকল অসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য কারণেই আকস্মিক ভাব-প্রবণতা দৃষ্ট হয়। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম নিবাসীগণ এক পেনির জন্য হয়তো একজনকে হত্যা করিয়া পরমুহূর্তেই অন্যজনকে এক পাউণ্ড দান করিয়া ফেলিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, অসভ্য জাতির অনুভব শক্তি এত প্রবল যে, পদচিহ্ন দেখিয়া ইহারা ব্যক্তিবিশেষকে তখনি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। বালক ও অসভ্য জাতি এ উভয়েই দূরকারণানুমানে নিরতিশয় অপটু। প্রত্যক্ষই ইহাদের লীলাভূমি। কিন্তু বালকের বা অসভ্য জাতির বয়োবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কের ক্রমোন্মেষণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুধ্যানের (Reflection) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুধ্যানের সুশৃঙ্খল প্রবাহ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে (Knowledge) পরিণত হয়। সর্ব্বদেশীয় মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও (Psychologist) বলিয়া থাকেন, অনুভূতি (Feeling) হইতেই অনুধ্যান (Reflection) এবং অনুধ্যান হইতে জ্ঞান (Knowledge) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রমোন্মেষণবাদী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সুখদুঃখাদ্যনুভব মানব জীবনের জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা, ইহার প্রকৃত অর্থ কি? সকলেই বুঝিতে পারেন যে, সুখদুঃখাদ্যনুভব বাহ্যবস্তুসাপেক্ষ। সুখ দুঃখ্যাদি স্বতঃই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই প্রোক্তমতে বাহ্যবস্তুর সত্তা স্বীকার্য্য। জ্ঞাতা যখন জ্ঞেয় পদার্থ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনি সে জ্ঞেয় পদার্থের ভাবে রঞ্জিত হইয়া থাকে। বাহ্য জগৎ বা জ্ঞেয় পদার্থ কর্ত্তৃক অভিভুত হইয়া পড়াই জ্ঞানের অঙ্কুরাবস্থা। এ অবস্থায় মনের

বহির্মুখী বৃত্তি নিরতিশয় প্রকাশ; সুতরাং বহির্জগদনুসন্ধানে সবিশেষ যত্নবতী। দৃশ্য জগৎ দ্রষ্টা কর্তৃক নানাভাবে অনুভূত হইয়াই প্রত্যেক জাতির আদিমবস্থায় বোধ হয় সুখদুঃখাদ্যনুভবদ্যোতক কাব্যযুগের অবতারণা করিয়াছিল। যেন এ যুগে দ্রষ্টা দৃশ্য পদার্থের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহারই স্তবস্তুতিতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাজ্ঞেয় বা দৃশ্য পদার্থকে ক্রমেই অধীন করিয়া ফেলে; এবং অবশেষে বাহ্য দৃশ্যকে দ্রষ্টা স্বীয় অস্তিত্বে লীন করিয়া ফেলে; তখন আর দ্বৈতভাবের সম্ভাবনা কোথায়? ইহার নামই বেদান্তমতে অদ্বৈতজ্ঞান।

প্রোক্তমতের পরিপোষকরূপে প্রবীণ দার্শনিক ভট্ট মোক্ষমূলার আর্যজাতির বেদের ক্রমবিকাশ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদের প্রথম ভাগ সেইজন্য ভাবপ্রবণ স্তবস্তুতি ও বাহ্য পদার্থ বর্ণনে অসাধারণ কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মকাণ্ডে তাহা ক্রমে অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া উপনিষদ ভাগে তাহার প্রবল অন্তর্মুখী গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুখদুঃখাদ্যন্ত ভাবে যাহার প্রাথমিক বিকাশ, কর্ম্মাদিতে যাহার অনুধ্যান, নিরপেক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানেই তাহার পর্য্যাপ্তি; ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমত যুক্তি।

ইহা অবিতথ সত্য যে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই ক্রমোন্মেষিত বুদ্ধি স্বতঃই ঐক্যে (Unity) বা অদ্বৈত তত্ত্বানুসন্ধানে ধাবমান। সেই নিরপেক্ষ ঐক্যতে মিশিবার জন্য যে সকল চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের নামই বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র। ইহাদের মধ্যে যে শাস্ত্রগুলি বাহ্য বা জড় পদার্থ আলোচনায় তৎপর, তাহাদের নাম প্রাকৃত বিজ্ঞান; এবং যাহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনায় তৎপর তাহাদের নাম দর্শন শাস্ত্র। এই উভয় প্রস্থানই ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বে অবগাহনোন্মুখ। তবে যে বিজ্ঞান বা দর্শন সেই ঐক্যতত্ত্বে যত অগ্রসর, সেই বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে তত সমাদৃত হইয়াছে ও হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনগুলির মধ্যে যে দর্শন মানব মনের স্বাভাবিকী জ্ঞান-পিপাসার

নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছে, তাহাই অস্মদ্দেশীয় বেদান্ত শাস্ত্র। অন্যান্য দর্শনগুলি সকলই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞানের অল্পাধিক পরিপোষক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে য়ুরোপীয় দার্শনিক মতগুলি প্রায়ই তর্কপ্রতিষ্ঠিত এবং অস্মদ্দেশীয় মতগুলি সরসতর্ক এবং আপ্তোপদেশ উভয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে ঐক্য তত্ত্বলাভে যেন সমধিক আশ্বস্ত করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুখদুঃখাদ্যনুভব বাহ্য বা জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্বসাপেক্ষী। বস্তুতঃ আপাত প্রতীয়মান বাহ্য পদার্থের কে-ই বা সহসা সন্দিহান হইতে পারে? তাই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, একমাত্র প্রত্যক্ষ জগতকে নিত্যজ্ঞান করিয়া চার্ব্বাকগণ জ্ঞানরাজ্যের নবজাত শিশু। বালকের ন্যায় সামান্য সুখদুঃখাদ্যনুভব ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ অনুষ্ঠানের শক্তি চার্ব্বাক দর্শনে স্ফূরিত হয় নাই। শিশু বা অসভ্য জাতির ন্যায় চার্ব্বাকগণের বর্ত্তমানই বিলাস-ভূমি। প্রত্যক্ষ হইতে সামান্য যুক্তিবলে অনুমানে যাইবারও তাহাদের সামর্থ জন্মে নাই। তাই চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। কিশোর বৌদ্ধগণ চতুর্বিধ কাণ্ডের শাখাভেদ সত্ত্বেও বয়সাধিক্যবশতঃ সমধিক চিন্তাশীল। তাই তাহারা অনুভূতি (Perception) হইতে অনুধ্যানে (Reflection) বা প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে উপস্থিত হইয়াছিল। চতুর্ব্বিধ ভাবনাদ্বারা সমস্তই ক্ষণিক জ্ঞানে বৌদ্ধগণ সর্ব্বশূন্যবাদে উপস্থিত হইয়া ঐক্যানুসন্ধিৎসা পিপাসায় একপ্রকার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিন্তাশীলগণের জ্ঞানতৃষা সেখানেও মিটে নাই। বেদবিরোধী লৌকিক যুক্তিপ্রধান শূন্যবাদ মানবানুধ্যানের পর্য্যাপ্ত পরিসীমা হইতে পারে না। কারণ, ক্ষণিক বিধায় পূর্ব্বাপর বিচার্য্য বিষয়ের অন্যোন্য সম্বন্ধ (Reciprocal association) থাকে না। এতদ্দেশীয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ঐক্যানুসন্ধিৎসার যুবাবস্থা। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রমাণবাদী প্রোক্তদর্শনদ্বয় অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ঐক্যতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যুবক যেমন

স্বতঃই নিজ সামর্থ্যে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পরোপদিষ্ট উপদেশ তেমন গ্রাহ্য করিতে চাহে না, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সেইরূপ প্রায়ই লৌকিক তর্ক দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন! আপ্তবাক্যের প্রমাণপরতা স্বীকার করিয়াও তাহার বেদান্ত বিরোধী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন মানবানুধ্যানেরই প্রৌঢ়াবস্থা। ইহার প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান, বেদান্ত সিদ্ধান্বিত নিরপেক্ষ অদ্বৈত-জ্ঞানেরই ভূমিকাস্বরূপে যেন উপনস্ত হইয়াছে। উপনিষদ বেদ্য অদ্বৈত তত্ত্ব মানবানুধ্যানের বৃদ্ধাবস্থা। যে ঐক্যানুসন্ধিৎসা বহির্মুখী হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণাপেক্ষী হইয়াছিল, তাহাই আবার নানা অনুধ্যান সংযোগে বলবতী হইয়া অবশেষে অদ্বৈত তত্ত্বরূপ মহাসাগরে স্যন্দমান হইয়াছে। অনুভূতিতে যাহার আরম্ভ, অনুধ্যানে যাহার পরিপুষ্টি তাহাই আবার প্রত্যক্ষানুভূত ঐক্যতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে।

সত্যাদিযুগচতুষ্টয়ের ন্যায় দর্শনেও চারটি যুগ কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রথমটি ব্যবহারিক যুগ (Emperical Stage), দ্বিতীয়টি অনুধ্যান যুগ (Reflection Stage), তৃতীয়টি আধ্যাত্মিক যুগ (Spiritual Stage) এবং চতুর্থটি ঐক্যযুগ (Unitarian Stage)। এতদ্দেশীয় ব্যবহার যুগে চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ, অনুধ্যান যুগে নৈয়ায়িক ও কানাদগণ, আধ্যাত্ম যুগে সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ এবং ঐক্য যুগে মীমাংসকগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ষড়্‌দর্শনেও মানবচিন্তার ক্রমোন্মেষণ প্রণালী পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। ষড়্‌দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্যও এই উপায়ে নির্ধারিত হইতে পারে।

যাহারা নিতান্ত শিশু, তাহাদের বুদ্ধিতে সাধারণ জ্ঞান (Generalisation) ঝটিতি উৎপন্ন হয় না। একটি গো দর্শন করিয়া "গোত্বের" জ্ঞান হয় না। তাই শিশু ভূয়ো দর্শন করিতে করিতে পরে "গোত্ব" জ্ঞান লাভ করে। "গোত্বের" জ্ঞান হইতে পরে জীবত্বে, জীবত্ব হইতে বস্তুত্বে, বস্তুত্ব হইতে ভূতত্বে, ভূতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রত্বে এবং

অবশেষে জাতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা একত্বে অবস্থিত হওয়াই জ্ঞানের ক্রমোন্মেষণের পর্য্যাপ্ত পরিসীমা। বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সাধারণ জ্ঞানে বা একত্বে অবস্থিতি হওয়াই ক্রমোন্মেষণের চরম ফল। ভারতীয় দর্শনরাজ্যেও এই ক্রমবিকাশের পরিস্ফুট আভা চিন্তাশীল মাত্রই দেখিতে পাইবেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বৈশেষিক ভাষ্যোপক্রমণিকায় কণাদদর্শনকেই ষড়্‌দর্শনের প্রথম দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্বিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ন্যায় প্রস্থানই যে দার্শনিক রাজের প্রথম সন্তান, সে বিষয়ে সমালোচকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পদার্থাদি বিচার প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনকেই প্রাথমিক দর্শন বলিয়া মনে হয়। শিশু যেমন বহু পদার্থ দেখিয়া পরে জাতি জ্ঞান লাভ করে, সেইরূপ যে যত অধিক পদার্থ স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়, সে দর্শন রাজ্যে তত প্রাথমিক। তাই প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থবাদী গৌতম ন্যায়কেই প্রাচীনতম দর্শন বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সপ্ত পদার্থবাদী কণাদ সেই ষোড়শ পদার্থকেই সপ্ততত্ত্বে পরিণত করিয়া ন্যায়োক্ত সমস্ত তত্ত্বই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করতঃ, জ্ঞানের ক্রমোন্মেষণ দেখাইয়াছেন। যে দর্শনের ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাধারণজ্ঞানে (Generalisation) কণাদের নিকট সপ্ততত্ত্বে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। অথচ ন্যায়োক্ত কোন পদার্থই বৈশেষিক দর্শনে অস্বীকৃত হয় নাই।

বিশেষ নামক (Differentia) কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া ষট্‌-পদার্থবাদী হইলেও কণাদ দর্শন বৈশেষিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মতে সেজন্য বৈশেষিক দর্শন ন্যায়ের পরবর্ত্তী দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্বিত হইতেছে।

ভারতীয় দর্শনের দ্বিতীয় যুগে কপিল ও পতঞ্জলি দুই সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে কপিলকেই অগ্রজ বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি সপ্তপদার্থকে ভাঙ্গিয়া দ্বিতত্ত্বে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। তদুক্ত

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক প্রকৃতির বিভিন্ন পরিণাম। কিন্তু জড়াত্মিকা প্রকৃতির পুরুষসান্নিধ্য ভিন্ন স্বতঃ পরিণমন অসম্ভব বিধায় বিচার ক্রমে তিনি প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বিতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। পাঠকগণ দেখিবেন, যাহার ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্ত্বে পরিনমিত হওয়ায় জাতিজ্ঞান ক্রমেই একাত্মাভিমুখী হইতেছে। পতঞ্জলি দৃষ্টতঃ ত্রিতত্ত্ববাদী হইলেও তিনি কপিলদেবের কনিষ্ঠ। কারণ, নিরীশ্বর সাংখ্যের পরিণামী চিন্তা সাধারণের ধারণার অবিষয় হইয়াছিল। তাঁহারা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" শুনিয়াই কপিলকে বেদ বিরোধী বলিয়া মনে করিল। সেইজন্য ভগবান পতঞ্জলি যোগসূত্রে "ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈর রূপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ" সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও অলক্ষ্যে সাংখ্যতত্ত্বই উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়েই দ্বিতত্ত্ববাদী।

তৃতীয় যুগের দর্শনকার জৈমিনি ও বেদব্যাস সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্ত্বকেই আবার একতত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন। তবে শিষ্য জৈমিনি তাহা কর্ম্ম বা ধর্ম্মরূপ একতত্ত্বে এবং গুরু বেদব্যাস তাহা ব্রহ্ম বা আত্মারূপ একতত্ত্বে পর্যাপ্ত করিয়াছেন। জৈমিনি কেবল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগকেই "বেদ' নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞান শরীর বেদব্যাস উপনিষৎ কাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্মা বা ব্রহ্মরূপ একতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা উভয়েই একতত্ত্ববাদী। শিষ্য হইলেও জৈমিনি দর্শনকেই আবার উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর দর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণ জীবের ধর্ম্মাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাসশিষ্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করিয়াছেন। পরমজ্ঞানীর বিশ্রামস্থল নির্দ্দেশ জন্য বেদব্যাস বেদান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গী বিচার বা অধিকরণ উভয় দর্শনেরই একরূপ। গুরু-শিষ্যের বিরোধ আপাত প্রতীয়মান হইলেও তাহা অধিকারী বিশেষের উপকার নিমিত্ত বা ক্রমোন্নতিকল্পেই রচিত। শ্রীরামানুজ স্বামী তাঁহার শ্রীভাষ্যে এইজন্য উভয় মীমাংসা দর্শনকেই এক পুস্তকের

দুই অধ্যায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জৈমিনির মতে বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ রহিত হওয়ায় একত্বরূপ মুক্তিতত্ত্বে অবস্থান ঘটে। বেদব্যাস তাহা পরম্পরাপক্ষে সহায়ীকারণ স্বীকার করিয়াও একতত্ত্বাবস্থিতিকে নিরপেক্ষ (Absolute) বলিয়া সিদ্ধান্তিত করেন। সে একত্ব কার্য্যকারণরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। একত্বজ্ঞানের পর আর জাতিজ্ঞানের প্রসার নাই। ইহাই দার্শনিক জ্ঞানের চরম উন্নতি। এজন্য ক্রমোন্মেষণ মতে ব্যাসদর্শন এতদ্দেশীয় দর্শন সমূহের শেষ দর্শন বলিয়া নির্ভয়ে সমর্থিত হইতে পারে।

বিবর্ত্তবাদ

উদ্বোধন—৫ম বর্ষ, ১৩১০ সাল

কার্য মাত্রেরই কারণ অনুমেয়; আবার কারণ মাত্রই কার্য্য-প্রসূ। ইহা ভূয়োদর্শনের দ্বারা জানা যায়। স্থূল কার্য হইতে কারণ সূক্ষ্ম অথবা কার্য্যই কারণের স্থূলাবস্থা। কাল (Time) এবং দেশেব কালের জ্ঞান নাই, সেখানে কার্য্যকারণ-প্রবাহের ধারণা হইতে পারে না। কারণ, কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য আছে; সুতরাং কাল জ্ঞান না থাকিলে পৌর্ব্বাপর্য্য বোধ কিরূপে হইতে পারে? আবার যে স্থানে কার্য কারণের ক্রিয়া হইতেছে, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সেখানে স্থান জ্ঞানেরও পূর্ব্বাভাস অবশ্যই আছে। সেইজন্য নিমিত্ততা (Causation) জ্ঞান দেশ-কাল জ্ঞানাপেক্ষী। এই দেশকাল নিমিত্ততা লইয়াই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে—যত কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান সমস্তই এই দেশ কাল নিমিত্ততা অবলম্বনে উদিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যাণ্ট্ এই দেশকাল নিমিত্ততার প্রথম আবিষ্কারক বলিয়া শ্রুত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন অস্মদ্দেশীয়

দর্শনাদি পাঠ করা গেল, তখন জ্ঞাত হইলাম, ক্যান্তের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার পর্য্যাপ্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টি রহস্য প্রসঙ্গে শারীরক ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিতেছেন,—"ন স্বভাবতঃ বিশিষ্ট দেশকাল-নিমিত্তোপাদানাৎ" অর্থাৎ—"কার্য্যোৎপত্তির প্রতি বিশিষ্ট দেশকাল, নিমিত্ত ও উপাদান দ্রব্যাদির বিশিষ্ট নিয়ম নিয়মিত থাকায় স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি হয়, এ কথা বা নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সে যাহা হউক, এই দেশ কাল নিমিত্ততাই কার্য্যকারণ জ্ঞানের মূল কারণ, ইহা এক প্রকার বুঝা গেল। কার্য্য দেখিলেই যে কার্য্য করিয়াছে এবং যে উপাদানে কার্য্য করা হইয়াছে, এই উভয়বিধ কারণ যুগপৎ অনুমিত হয়। ঘট দেখিয়া ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ও ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারকে মনে হয়। এই দৃষ্টান্তে মৃত্তিকা উপাদান ও কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ বলিয়া বেদান্ত শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায় দর্শনে ইহাই আবার ত্রিবিধ অবান্তর ভেদে কথিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক পণ্ডিতগণ সেইজন্য কার্য্যের প্রতি ত্রিধা কারণ সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। যথা, সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। ঘটের সহিত ঘটকপালের বা ঘটাংশের যে সম্বন্ধ, তাহা ঘটের অসমবায়ী এবং কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। বেদান্ত শাস্ত্রমতে ব্যবহারকল্পে উক্ত ত্রিবিধ কারণই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণরূপে দ্বিধা উক্ত হইয়াছে। কারণ, সমবায়ী ও অসমবায়ী উভয় কারণই বেদান্ত মতে উপাদান কারণে নিহিত আছে।

এই উপাদান কারণ আবার ত্রিধা কল্পিত হইয়াছে। যথা, আরম্ভক উপাদান, পরিণামী উপাদান, ও বিবর্ত্ত উপাদান। আরম্ভক-বাদী নৈয়ায়িকের মতে তন্তু হইতে বস্ত্রোৎপত্তি আরম্ভক উপাদানের দৃষ্টান্ত। পরিণামবাদী সাংখ্যের মতে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপত্তি পরিণাম উপাদানের দৃষ্টান্ত। মায়াবাদী বেদান্তীর মতে মন্দান্ধকারে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বিবর্ত্ত উপাদানের দৃষ্টান্ত। পঞ্চদশীকার বলিতেছেন

"অবস্থান্তরভাসস্তু বিবর্ত্তোরজ্জুসর্পবৎ। নিবংশেহপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্য কল্পনাৎ॥" অর্থাৎ স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্তকারণ বলে; যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই প্রকার বিবর্ত্ততা নিরবয়ব পদার্থের কল্পিত হইতে পারে। যেমন আকাশে তলমলিনতাদি কল্পনা অর্থাৎ ইন্দ্রনীল কটাহ তুল্যত্ব ভাবনা। শ্রুতি বলেন, সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মই ব্যাবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রজাল কার্য্য-জগদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে শক্তি এই জগদিন্দ্রজালের প্রকটনকারী, তাহার নাম মায়া। পঞ্চদশী বলিতেছেন, "মায়া শক্তিঃ কল্পিকার্য্যাদিন্দ্রজালিকশক্তিবৎ" অর্থাৎ মায়াই তাঁহাতে (ব্রহ্মে) জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল কল্পনা করে।

বেদান্তবাদী বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনবলে এই অধ্যাস প্রশমিত হয়। যে মায়াশক্তিবশতঃ এই জগদ্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন জগদ্ভ্রম নিঃশেষরূপে বিলুপ্ত হয়, তখন মায়ার অস্তিত্বও থাকে না। সুতরাং মায়াশক্তি সত্যও হইতে পারে না। মায়া একেবারে মিথ্যা না হইলে জগৎও একেবারে মিথ্যা নহে। কারণ, ব্যবহার প্রবর্ত্তক জগৎ আমরা প্রত্যেকে অবলোকন করিয়া থাকি। তবে গুরূপদেশ গম্য সাধন পথে অগ্রসর হইয়া বিচার করিতে করিতে এ জগদ্ভ্রমের নিবৃত্তি পায়। এই জগদ্ভ্রম নিবৃত্তিসূচক আপ্তবাক্য। আমরা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে শতশঃ জ্ঞাত হইয়াছি। মনন ভিন্ন কেবল তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের উচ্চারণেই যে জগদ্ভ্রম অপনীত হয়—তাহা নহে। জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য তাই বলিতেছেন, "অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ। বাহ্যশব্দৈঃ কুতোমুক্তিরুক্তিমাত্র ফলৈণ্ নাম", অর্থাৎ দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিলয় ব্যতিরেকে এবং আত্মতত্ত্বের অনুভবভিন্ন কেবল কথামাত্রফল অথচ অকার্য্যকারী বাহ্য শব্দাড়ম্বর দ্বারা কখনও মানবের মুক্তিলাভ হয় না। আত্মতত্ত্ব অনুভূত হইলেই ব্যাবৃত্ত ব্রহ্মে কল্পিত জগদিন্দ্রজাল বুঝিতে পারা যায়। তখনি জগদলীকত্বে, জীব আর

প্রতারিত হয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় এই প্রত্যক্ষ জগৎকে নিতান্তই ভ্রান্তির আস্পদ মনে হয়। তখনি বিবর্ত্তবাদ সম্যক উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সমগ্র শ্রুতি একবাক্যে বলিতেছেন এক ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। যিনি ব্রহ্ম ভিন্ন ইহাতে নানাত্ব অবলোকন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশ্যতাপন্ন হন। যদি বস্তুত নানাত্ব নাই থাকে, অথচ নানাত্ব আপাত প্রতীয়মান হয়, তবে সেই নানাত্বকে কল্পনাপ্রসূত ভ্রম ভিন্ন আর কি বলিব? অথবা ভাবান্তরে বলিব, কোন অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তিবলে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত হইয়া নানাত্বরূপ ইন্দ্রজালে পরিণতের ন্যায় হইয়াছেন। এই নানাত্বের প্রতিষেধ থাকিলেও পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎজ্ঞান ও অবান্তর নানাত্ব জ্ঞান সাধারণ জীবের কখনও অপনীত হয় না।

বামদেবাদি দুই একজন নিত্যসিদ্ধ ঋষি ব্যতীত এমন লোক জগতে দৃষ্ট হয় নাই, যিনি জগতের ধারণার অবিষয়। তাই প্রথমতঃ শাস্ত্রানুযায়ী পথে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদিরূপ বিচারে জীবকে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। জগৎভ্রমকে সত্য ধরিয়া লইয়া পরিশেষে জগৎ নাই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার প্রণালীকে ব্যতিরেকীন্যায় বলে অর্থাৎ যাহা মিথ্যাকে সত্য মানিয়া লইয়া বিচার ক্রমে মিথ্যাত্বের নিবোধ পরা। এই জন্যই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে সূত্রকার ব্রহ্মকে তটস্থ লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন। "নেতি" "নেতি" রূপ স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম বিচারিত হন নাই। কারণ, বিচার প্রবর্ত্তক শাস্ত্র জীবের জন্য। স্বরূপ ব্রহ্মের বিচার হয় না। সেখানে ভাব নাই, কেবল স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ।

যাহা হউক, ব্যবহারিক জ্ঞানে জগৎ চিরদিন ছিল, আছে ও থাকিবে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানের অপর নাম বন্ধন। তাহাই সুখ, দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপপুণ্যরূপ দ্বন্দ্বাধ্যাসের আবাসভূমি। এই দ্বন্দ্বাধ্যাসের নিরাকরণ করার নামই মুক্তি। বেদান্ত বলেন, সে মুক্তি তোমার পড়িয়াই আছে। মুক্তিই তোমার স্বভাব। তবে ব্যবহারিক

দ্বন্দ্বাধ্যাস তোমাকে বন্দীর ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। কিন্তু এ দ্বন্দ্বাধ্যাস বিদ্যা দ্বারা অপনীত হয়। শাস্ত্রকার বলিতেছেন, "সংসার-পরমার্থোঽয়ম্ সংলগ্ন স্বাত্ম বস্তুনি। ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যাস্যাৎ বিদ্যয়েষা নিবর্ত্ততে।" অর্থাৎ এই সংসার পরম পদার্থ এবং পরমাত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার বিবেচনারূপ যে ভ্রান্তি, তাহারই নাম অবিদ্যা। বিদ্যা বা পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। এই অবিদ্যার আবরণশক্তি ব্রহ্মকে অপ্রকাশিত করে এবং বিক্ষেপ শক্তি বশতঃ ব্রহ্ম জগতরূপে ব্যাবর্ত্তিত বোধ হন। কিন্তু অবিদ্যা জীবের স্বভাব নহে; তাহা হইলে মুক্তিত্বের ব্যাঘাত হয়। এই অবিদ্যা নাশের উপায় শাস্ত্রে দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ, মনের প্রসন্নতা চাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা" অর্থাৎ যাহার রূপ রসাদিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বহির্মুখ হয়, সেই বাহ্য জগতে আসক্তি চলিয়া গেলেই মনঃশুদ্ধি হয়। স্ববর্ণশ্রমধর্ম্মাদির পালন ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে মনের প্রসন্নতা হয়। অপরোক্ষানুভূতি মুখে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেন তপস্যা হরিতোষণাৎ। সাধনং জায়তে পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্॥" অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালন, তপস্যা ও হরিতোষণা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে বিচারাদি সাধন চতুষ্টয় লাভ হয়। এইজন্য "সদা বিচারযেওস্মা-যুগজ্জীব পরাত্মনঃ। জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥" অর্থাৎ মন প্রসন্ন হইলে সর্বদাই জগৎ, জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচার আসে। বিচার করিতে করিতে জীবের ও জগতের নশ্বরত্ব দৃঢ় ধারণা হয়; এবং ঐ ভাব হৃদ্‌গত হইলেই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তখনই ব্যাবর্ত্তিত কারণ লুপ্ত হইয়া স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্ম আপনার প্রভায় আপনি জ্যোতিস্মৎ অনুভূত হয়। যাহাদের আত্মা অনুভূত হয়, অথচ পূর্ব্বাহিত বেগ সংস্কারবশতঃ দেহ পতন হয় না, তাহাদিগকে শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ব কথিত প্রণালীর অনুসরণ ব্যতীত সাধনান্তর দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্র প্রমাণে ইহাও অসকৃৎ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের নিয়ত উচ্চারণ ও তদর্থানুচিন্তা করিতে করিতে মনের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। এবং কালে আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়। অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে বলিতেছিলেন, "মুক্তাভিমানীং মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি। কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভয়েৎ ॥" যাহার সর্ব্বদা মুক্তি অভিমান, সেই মুক্ত, যে, নিজেকে সর্ব্বদা বদ্ধ মনে করে, সেই বদ্ধ। জ্ঞানগুরু বিবেকচূড়ামণিমুখে বলিতেছেন. "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ঃ।" মনই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে নিজেকে যে জীব ভাবে, সে জীব; যে নিজেকে শিব ভাবে, সে শিবই হয়। প্রথম কথিত সাধন বশে চিত্তশুদ্ধি হইলে যেমন তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের ধারণা হইতে থাকে, পক্ষান্তরে সেই সকল মহাবাক্যের প্রতিনিয়ত উচ্চারণ ও তাহাদের অর্থানুচিন্তনে ক্রমে মনের ঐক্যতান বৃত্তি প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে বিচার বশে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভূত হয়। শেষোক্ত সাধনা উচ্চাধিকারীর প্রতি সমধিক প্রযোজ্য হইলেও এ পন্থাও সাধকের পক্ষেও অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

চিত্ত শুদ্ধি জনিত বিচার দ্বারা অভেদে ব্রহ্মোপলব্ধি হইলে তখন বুঝিতে পারা যায়, এ জগৎ পূর্ব্বে যেমন দেখা গিয়াছিল, এখন আর তেমন নাই। "ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্রলীনমিদং জগৎ। অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্ ॥" এই জগৎ মায়া, এইমাত্র দেখা গিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? কি আশ্চর্য্য! এই ছিল. আর এই নাই!!! তখনি সে বুঝিতে পারে যে, একখণ্ড সমরস অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপন প্রভায় আপনি বিরাজ করিতেছেন। তখনি দেশকাল নিমিত্ততার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তখনই নানাত্বের পরপারে অবস্থিত হইয়া জীব বলে "সোঽহংব্রহ্মাস্মি", আমি সেই ব্রহ্ম। ইহাই বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে অননুভূতাত্মতত্ত্ব মাদৃশ জনের বিবর্ত্তবাদ

প্রবন্ধ লিখা ধৃষ্টতা কিনা ? শাস্ত্র বলিতেছেন, "পরোক্ষাচাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা। তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচার হয়ং সমাপ্যতে।" অর্থাৎ বিচার হইতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দ্বিধা জ্ঞান জন্মে। তার মধ্যে পরোক্ষ বা শাস্ত্রজন্য জ্ঞান হইলেও যতদিন না অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, ততকাল পর্য্যন্ত বিচার করিবে, পশ্চাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে বিচার শেষ হইবে। অনুভব না করিয়াও সৎশাস্ত্রের আলোচনা দোষাবহ হয় না। সদ্‌গুরু শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীপাদ তাঁহার জ্ঞানযোগ বক্তৃতায় বলিয়াছেন "There is generally one great Idea in India which militates against it. It is this. It is all very well to say, I am the Pure, the Blessed. But I cannot show it always in my life. That is this, the ideal is all very hard. Every child that is born sees the sky over head very far away ; but is that any reason why we should not strike towards the sky ? Would it mend matters to go towards superstition ? If we cannot get nectar, would it mend matters for us to drink poison ? Would it be any help for us, because we cannot realise truth immediately, to go into darkness, weakness and superstition ?"

"ভারতবর্ষে একথার এরূপ বিরুদ্ধবাদ শ্রুত হওয়া যায়। নিজেকে পবিত্র, মুক্ত বা সোঽহং মুখে বলা সহজ, কিন্তু কার্য্যে আমরা সর্ব্বদা তাহা দেখাইতে পারি না। এই আদর্শ লাভ করা বড়ই কঠিন। বালক জন্মিয়াই বহু দূরে আকাশ দেখিতে পায়। কিন্তু দূরে আছে বলিয়া আমরা কি আকাশের দিকে হাত পা ছুঁড়িব না ? কেবল কুসংস্কারের দিকে অগ্রসর হইলেই কি ভাল হয় ? অমৃত পাই না বলিয়া কি বিষ খাইতে হইবে ? আমরা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছি না বলিয়া দুর্ব্বলতা, মূর্খতা ও কুসংস্কারের দিকে অগ্রসর হইলে কি আমাদের কিছু কল্যাণ হইবে ? কখনই নহে।" কথায় বলে, ভাল কথার ঝুটাও ভাল। এই সকল গভীর তত্ত্বালোচনায় বঞ্চিত হইয়া আমরা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি।

প্রকৃতি

উদ্বোধন—৩য় বর্ষ, ১৩০৮ সাল

প্রকৃতি নিরতই পরিবর্ত্তনশীলা। দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ ও যোগাদি ভেদে একই প্রকৃতি বিভিন্না মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা। আমাদের জন্ম-মরণাদি ভাবপ্রকৃতিতে ন্যস্ত করিয়া আমরা প্রাকৃতিতেও বালা, যুবতী, বৃদ্ধা প্রভৃতি সংজ্ঞা আরোপ করিতেছি। মহামান্য কবিগণ ইহার অনন্তভাব বর্ণনে পরাস্ত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অনন্ত নিয়মানুসন্ধানে, কার্য্য কারণে ভাবের ধারাবাহিক নিয়ম রহস্য ভেদে প্রতিনিয়ত যত্নশীল। ভূতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিদবিদ্, জ্যোতির্ব্বিদ, রসায়নবিদ ও অন্যান্য মনীষীগণ ইহার এক একটি শাখা মাত্র অবলম্বনে অনন্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াও অপরিতৃপ্ত। ভাবুক বা জ্ঞানীগণ কেহই ইহার আত্যন্ত বুঝিতে পারে নাই; কোন কালে পারিবেনও না। অযুতভাব ভাণ্ডার প্রকৃতি অধর্ষণীয়া, অপ্রতিহতা এবং জ্ঞানবুদ্ধির অগম্যা। ঈদৃশী প্রকৃতির আলোচনা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি?

প্রকৃতি (Nature) বলিতে আমরা কি বুঝি? পৃথিবী বলিলে প্রকৃতির অব্যাপ্তি সংজ্ঞা হয়। অযুত অনন্ত গ্রহ তারা বিচিত্রিত ত্রিজগৎ, বলিলেও প্রকৃতির লক্ষণ হয় না। সৃষ্ট বস্তু মাত্রই প্রকৃতির ক্রোড়গত। সুতরাং সৃষ্টিই প্রকৃতির নির্দ্দোষ লক্ষণ হইতে পারে। জন্মের পূর্ব্বে অথবা লয়াবস্থায় যে ভাব, তাহাকে প্রকৃতি বলে না। উৎপত্তি হইতে ধ্বংসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বস্তু বা ভাব মাত্রই প্রকৃতি সংজ্ঞায় উপসংজ্ঞিত। এস্থলে আমরা সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য নেচার (Nature) কথাই সম্প্রতি প্রকৃতি বলিয়া বুঝিয়া লইব। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যাহা কিছু দৃশ্যমান, যাহা কিছু চিন্ত্যমান, যাহা কিছু নামরূপাত্মক, যাহা কিছু দেশকাল নিমিত্তদ্বারা বদ্ধ, সকলি প্রকৃতির লীলাবিলাস মাত্র।

যাহা কিছু সৃষ্ট ও দৃশ্য, তৎ সমস্তই ক্রমে বিপরিণমিত, অবশেষে স্বীয় কারণে লীন দৃষ্ট হয়। কাল বিভাগ, দিনরাত্রির পরিবর্ত্তন, ষড়

ঋতুর ক্রমাবর্ত্তন এবং বর্ষ যুগাদির "দুবাধয্যাতিক্রমেন" প্রকৃতির নিয়ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইতেছে। সুতরাং দুরন্তকালের স্রোতে প্রকৃতি যেন একটি উপলখণ্ডের ন্যায় গড়াইয়া চলিতেছে ; অথবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, প্রকৃতির ক্রোড়গত চন্দ্রসূর্য্যাদির পরিভ্রমণের সহিতই কাল বিভাগাদি কল্পিত হইতেছে। যাহা হোক, প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তিতা ও রূপান্তরিতা হইতেছে, সে বিষয়ে জগতে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীলা বলিয়া প্রকৃতি একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন—পরব্রহ্ম স্বরূপাবস্থিতিতে প্রকৃতি বা অপ্রকৃতি এ সমস্ত ভাবের নিঃশেষ বিলয় হয় ; তখন প্রকৃতি আছে, কি নাই, তাহা বুঝা যায় না। ইহা দ্বারা প্রকৃতির অসত্ত্বা সমর্থিত হয় নাই। পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া বিচিত্রোদ্ভাসিত জগৎ প্রত্যক্ষাবলোকন করিয়া অজ্ঞ ইতর জীব তর্কস্থলে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিলে তাহাকে আমি মাতৃহন্তা অকৃতজ্ঞ তনয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। অষ্টাবক্রবামদেবাদির ন্যায় নির্মায়ী মহাপুরুষগণ জন্মাবধি প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও, শঙ্করাদি জ্ঞানগুরুগণ প্রকৃতি অসত্ত্বা সপ্রমাণ করিলেও, সাধারণ জীব সে ভাব ধারণার যোগ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। হইতে পারে, প্রকৃতি-সত্তা দগ্ধপটবৎ, বা জলভ্রমবৎ জ্ঞানাবস্থায় ; কিন্তু সে জ্ঞান লাভ প্রকৃতির অবলম্বন ভিন্ন হইতেই পারে না। অজ্ঞলোক হয়তো প্রকৃতির স্থূল বস্তুর, তুমি না হয় সূক্ষ্মবস্তু বা ভাবের আশ্রয় লইবে মাত্র। কিন্তু বস্তু বা ভাব সকলি যখন প্রকৃতির বিশাল-কুক্ষিগত, তখন অজ্ঞানাবস্থায় প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও তুমি অবস্থিত হইতে পার না। ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা, আবিষ্কারাদি সকলি প্রকৃতির সাহায্যলব্ধ। সুতরাং এহেন প্রকৃতি আমাদের নমস্যা ও মাতৃস্থানীয়া।

একই প্রকৃতিকে লইয়া কবি হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, বিজ্ঞানবিদ্ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, জ্ঞানী অবাক হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, আত্মজ্ঞানী ইহাতে সর্পভ্রান্তি আখ্যারূপ করিতেছেন। বস্তুতঃ অজ্ঞানাবস্থায়

ইহাকে ছাড়িবার ক্ষমতা কাহারও নাই; ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া যিনি বলিতেছেন,—"আমি প্রকৃতিকে গ্রাহ্য করি না, শাস্ত্রে বলে উহা জগদ্ভ্রম", নিশ্চয় জানিবে তিনি প্রকৃতিকে দেখিয়া সমধিক ভীত হইয়াছেন, তিনি নিজের চক্ষে ধূলি ক্ষেপণ করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছেন। সে আত্ম-বঞ্চকের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে আত্মদর্শনান্তর বলিতে পার, "ক্ব গতং কেনবা নীতং কুত্রলীনমিদং জগৎ", তবেই বুঝিব তুমি প্রকৃতির পারে গিয়াছ; তোমাকে আর প্রকৃতির ত্রিসীমায় আসিতে হইবে না, নতুবা বলিব, তুমি পরশুরামকল্প মাতৃহন্তা।

বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি, পুরাণের অসুরগণ, তন্ত্রের মহাশক্তি, বাইবেলের শয়তান, কোরানের ইব্‌লিস্ সকলি প্রকৃতির (Nature) রূপান্তরিত, চিত্রছায়া মাত্র। হিন্দুমতে চৈতন্যের নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তত্ব বিধায়, প্রকৃতি অপ্রধানা স্ত্রীরূপে পরিকল্পিতা ও চৈতন্যভর্ত্রী। কেবল কেলিকুতূহল কৌশলপরায়ণা স্ত্রী যেমন স্বভর্ত্তাকে সর্বদাই অধীন করিয়া রাখে, নিত্যমুক্ত হইয়াও পরমাত্মা তেমনি যেন প্রকৃতিজিত বলিয়া অনুমিত হন। ফলতঃ প্রকৃতির বীর্য্য যেমন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, পুরুষ বা চৈতন্যের প্রভা তেমন ব্যক্ত হয় না, পরন্তু সে প্রভা তপস্যাজ্ঞেয়। এজন্যই প্রকৃতি-আশ্রিত শাস্ত্রে প্রকৃতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

যে যে-পরিমাণে প্রকৃতির করায়ত্ত, সর্ব্বধর্মমতে সে সেই পরিমাণে তত অজ্ঞ ও ঈশ্বর লাভে তত পশ্চাতে অবস্থিত। ফলতঃ প্রকৃতিবাদী মাত্রেই অসুর, পুরুষবাদী সুর। এজন্য আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মানবমাত্রেই অসুর, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলেই দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। জয় পরাজয় শ্রদ্ধা ও সমাধান সাপেক্ষ। অধিকাংশ স্থলেই অসুর বিজয়ী দেখা যায়; সুরের জয়লাভ প্রথমতঃ হয়ই না; তবে প্রকৃতির ভর্ত্তা অবতীর্ণ বিষ্ণুরূপী আত্মার সহায়তায় অবশেষে কখনো বা সুরগণের জয়লাভ হয়। প্রকৃতি-নিঃসঙ্গতাই মুক্তির অবভাসক।

রূপরসগন্ধাদি গুণাত্মক ভৌতিক জগতের পর্য্যালোচনা হইতেই আমাদের নিত্য নিত্য বস্তু-বিচার বিবেক উৎপন্ন হয়। নিরন্তর

পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য প্রপঞ্চের ওতপ্রোতালোড়নে জীবের শান্তি কোথায় ? পঞ্চভূতাশ্রয় এই জড়মাংসপিণ্ডে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যাহারা সংসারে আবদ্ধ হইয়াছে এ দেহের ধ্বংসভাব চিন্তা করিয়া তাহাদের শান্তি কোথায় ? পুনঃ পুনঃ যোগক্ষেম এবং সংযোগ-বিয়োগাদি দ্বন্দ্বভাবের প্রবল তাড়নায় অজ্ঞ জীবের শান্তি কোথায় ? বিবৃদ্ধ বাসনা. অজিতেন্দ্রিয় প্রকৃতি মুগ্ধ মানবের শান্তি কোথায় ? বিনশ্বর জীবনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ভীষণ মুখ-ব্যাদন স্মরণ করিয়া কান্তালিঙ্গনাদিজনিত শান্তিই বা কোথায় ? জন্ম, মৃত্যু, আধি, ব্যাধি প্রভৃতি প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত দূতগণকে প্রতিনিয়ত অবলোকন করিয়া সংসারের অনিত্যতায় স্বতঃই জীব বদ্ধ সংশয়। এই নিত্যানিত্য বস্তু বিচারবিবেকোৎপন্নে প্রকৃতিই আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

বেদাদি শাস্ত্র, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্র সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দেশকাল নিমিত্ত ব্যাপিয়া প্রকৃতির বিরাট সাম্রাজ্য সংস্থাপিত রহিয়াছে। কোটী কোটী জীবের মধ্যে এক আধ জন অতন্দ্রিত তপস্যালব্ধ জ্ঞানে ইহার অধিকার হইতে পলায়ন করিয়া জগতে মুক্তজীব বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি জড়াত্মিকা হইয়াও চৈতন্যলাভে নিয়তই আমাদের সহায়কারিণী হইতেছেন।

অধুনাতন পাশ্চাত্য জগৎ চাহিতেছেন জড়বিজ্ঞানালোচনায় প্রকৃতিকে করায়ত্ত ও অধীন করিতে ; প্রাচীন আর্যগণ সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া চাহিয়াছিলেন প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে ; কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অবশেষে বুঝিয়াছেন—লৌকিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত করা অসম্ভব। আর্য্য ঋষিও বুঝিয়াছিলেন—প্রকৃতিকে একেবারেই উপেক্ষা করা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য হিন্দু শাস্ত্র কথঞ্চিৎ লৌকিক উপায় সমর্থনকারী হইয়াও জীবকে কিন্তু প্রকৃতির পরপার গমনেই উপদেশ দিয়াছেন। পরন্তু. প্রকৃতির দুর্জ্জেয় শক্তির আবিষ্কারে অনুসন্ধিৎসু করিতেছে। একজন প্রকৃতিকে নগ্না করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া, ভোগ করিয়াও

তুরাধর্ষণীয় বিধায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। অন্ত্যজন দূর হইতেই তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া মুক্তি চাহিতেছেন। ফলতঃ দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতিকে দেখিয়া উভয়ই পরাস্ত মানিয়া বলিতেছেন—"বহুরূপিণী তুমি কে গা ? তোমায় আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" প্রকৃতি জড় বৈজ্ঞানিককে বলিতেছেন, "হে অদূর-দর্শিন্ ! আমার একটি বালুকাকণার রহস্য ভেদে তোমার লক্ষ জন্মও পর্য্যাপ্ত হইবে না।" অধ্যাত্মবাদীকে বলিতেছেন, তুমি স্বর্গ, চন্দ্র, সূর্যলোক, যেখানেই কেন যাও না, আমি সর্ব্বত্রই অধ্রর্ষণীয়া, সর্ব্বত্রই আমার সমপ্রভাব। তবে সেখানে অবশ্যই আমার প্রভাব নাই ;— "ন যত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়-মগ্নিঃ। যমেব ভাগুমনুভাতি সর্ব্বং যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মনস্তত্ত্ব

উদ্বোধন—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

মনের বহির্মুখী বৃত্তি স্বতঃই নিরতিশয় প্রবলা। মানব প্রথমেই বহির্জগতের বৈচিত্র্য ও কার্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মনের এ অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া প্রথমেই কাব্য যুগের অভ্যুদয় করিয়া দেয়। বহির্জগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে অন্তর্মুখী হইতে থাকে। এ অবস্থাতেই অন্তর্জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। তখনই মন কি, বুদ্ধি কি, ঈশ্বর কি ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় জীবের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়। মনের এই অন্তর্মুখী বৃত্তির উপক্রম হইতেই দর্শন যুগের আরম্ভ হয়। মনোবিজ্ঞান (Psychology), দর্শন (Philosophy) ও ধর্ম্ম (Theology) এই দর্শন যুগের প্রধান বিদ্যা। ইংরাজী মতে মনের বহির্দৃষ্টি অব্‌জেক্‌টিভ্ (Objective) ও অন্তর্দৃষ্টি সব্‌জেক্‌টিভ্ (Subjective).

মন যখন বহির্জগত উপেক্ষা করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করে তখন প্রথমতঃই "মন কি ?" এ বিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমরা এ প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এ প্রশ্নের মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্ট (Descartes) বলেন, "Mind is a self-knowing principle।" যে নিজেকে নিজে জানে, তাহার নাম মন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা কিছুই বোধগম্য হইতে পারে না। মন যদি নিজেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন। এক পদার্থ দ্রষ্টা (Subject) ও দৃশ্য (Object) কিরূপে হইতে পারে ? যাহা দ্বারা জানা যায় সেই করণই মন বলিয়া, স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন বলিতেছেন, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়ায় মনই প্রধান সহকারী কারণ। (The mind itself is the universal and principal concurrent cause in every act of knowledge.) মনস্তত্ত্ববিদ্ হ্যামিল্টনের সংজ্ঞা সমধিক পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা কল্পিত হয়। নতুবা অন্য রূপে 'মন কি', তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা হইতে পারে। (Mind can be defined only from its manifestation.) হ্যামিল্টন আরও বলেন, জাগ্রত অবস্থাই মন ; জড়ের সহিত বিস্তৃতি গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত জাগ্রত অবস্থার সেই সম্বন্ধ। (Consciousness is, in fact, to the mind, what extension is to matter or body,) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বলেন, মন দেহাদির গুণ বা ধর্ম স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ; শুক্র শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়োৎপন্ন ; ইহারা প্রায় ভারতীয় চার্ব্বাক-মতবাদীগণের ন্যায়। এরিষ্টটল্ (Aristotle) যাহাকে রাসন্যাল (Rational) বা এ্যানিম্যাল সোল (Animal Soul) বলিতেন তদ্দ্বারা মনকেই উপলক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দর্শন-মতে, অনেক স্থলে Soul-কে (আত্মাকে) Mind (মন) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ, এ উভয়ের এককে অস্বীকার করিয়া একত্ববাদী হইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়া আইডিয়ালিষ্ট (Idealist) নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কেহ জড়বাদী হইয়া রিয়ালিষ্ট (Realist) নাম ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা মন ও দেহকে দুই স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও আবার চারি সম্প্রদায়ে প্রবিভক্ত। ডেকার্ট, ডিলাফোর্জ, ও মেলব্রন্স প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন ও জড় শরীরের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। উহারা উভয়েই নিষ্ক্রিয়। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব অকেশনাল কজেস (Doctrine of occasional Causes) বলে। লেবনিজ ও উলফ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও শরীরের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা অন্যোন্যাশ্রয়ী নহে। কিন্তু দুইটি সমান ঘড়ির মত উভয়ের একরূপ ক্রিয়া হইতেছে। শরীর ও মনের এই অন্যোন্য কার্যকারিতা সৃষ্টিকাল হইতে ঈশ্বরই বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই মতকে ডকট্রিন্ অব্ প্রি-এষ্টাব্লিষড্ হারমনি (Doctrine of Pre-established Harmony) কহে। কাডওয়ার্থ লেকলার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কোন একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ মন ও শরীরের সংযোগ করিয়া দিয়াছে। এই মতকে ডকট্রিন্ অব প্লাষ্টিক মিডিয়ম (Doctrine of Plastic Medium) কহে। ইউলার ও স্কুলমেন মতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাহ্যপদার্থ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের কার্য হয়। মন যেন ঠিক মাকড়শার মত দেহজালের মধ্যদেশে অবস্থান করিতেছেন। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব ফিজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স (Doctrine of Physical Influence) বলে।

জার্মেন দার্শনিক ক্যাণ্ট মনের কার্য্যকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—জ্ঞান (Knowledge), অনুভব (Feeling) ও ইচ্ছা বা ক্রিয়া (Willing)। ইনি বলেন, এই তিনের সমষ্টিই মন। জ্ঞান, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি সকলেই অন্যোন্যাশ্রয়ী। বস্তুতঃ ক্যাণ্ট-উক্ত এই ত্রিবিধ

শক্তির সম্যক আলোচনা, উপরিউক্ত শক্তিত্রয় সংমিশ্রণে নানা জাতীয় মনোভাবের ক্রমবিকাশ প্রতিপাদন এবং অবশেষে এই শক্তিত্রয়ের কারণতা অনুসন্ধান করিয়া শরীরবিদ্যায় পর্য্যাপ্তি করাই অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, এই শক্তিত্রয় বিকাশের ক্রমভেদ আছে। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ (Evolutionists) এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, মানব জীবনের প্রথমেই অনুভব শক্তির (Feeling) প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। হাস্য, ক্রন্দন, প্রফুল্লতা, তৃপ্তি, সহানুভূতি, সরলতা ও নির্ভীকতা শৈশব জীবনের নিত্য সহায়। সে সময় জ্ঞানের বিকাশ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়। যদিও যুক্তিবিচারে আমরা অনুমান করি যে অনুভবের মূলেও অত্যল্প জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, তথাপি সেই জ্ঞান এত অল্প যে, তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ বলেন, মস্তিষ্কই মনের আধার বা মস্তিষ্কই মন। মনের কার্য্য বেশী হইলে প্রস্রাবের সহিত মস্তিষ্কের অংশ বিগলিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বয়সের সঙ্গে যখন মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হয়, তখনই মনের সমধিক ক্রিয়া হয়। তখন ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক স্ফূরণ হইয়া থাকে। পৌনঃপুনিক অনুভবই জ্ঞানের অনন্য কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তবে দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষা এবং পৈত্রিক সংস্কারাদিও মনের গঠনে বিস্তার সাহায্য করে। ইঁহারা বলেন, বহির্জ্জগত ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্র ধমন্যাদির পরিস্পন্দন দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, তৎপরে বস্তু জ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্কই দেহরাজ্যের রাজধানী এবং মস্তিষ্কক্ষয়ে জ্ঞান-ক্ষয়। কিন্তু, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইয়া জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? শৈশব ও অসভ্য জীবন একরূপ। এজন্য শৈশব ও অসভ্য সমাজে ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের মতে অনুভব-শক্তি প্রধান। বেদুইনেরা, এই ঘোর সাহসী, এই আবার কাপুরুষ। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণ আধ পয়সার জন্য এখনি একজনকে

হত্যা করিয়া পরমুহূর্ত্তেই অন্য জনকে দশ টাকা দান করিবে। মনের অনুভব-শক্তি ইন্দ্রিয়াদি পথে পরিচালিত, এজন্য অসভ্য ও শিশুর অনুভব শক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসীগণের ঘ্রাণ-শক্তি এত প্রবল যে, কুক্কুরের ন্যায় তাহারা মৃগানুসরণ করিতে পারে। যুগমান জাতি দূরদর্শনে দূরবীক্ষণ-স্বরূপ। সুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমরা দেখিতে পাইলাম, অনুভব-শক্তিই মনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা, দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও তৃতীয়াবস্থা কর্ম্ম।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই। 'মন কি', যদিও তাঁহারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বস্তু জ্ঞানের ক্রমপদ্ধতি প্রকাশে তাঁহারা সাংখ্যের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের পরীক্ষার ফল (Result) যে একান্ত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভবের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম্ম, একথা উচ্চ-দর্শনানুমোদিত।

কণাদোক্ত নয় দ্রব্যের মধ্যে মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। ইঁহারা আত্মাকে মন হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি যেমন বহিষ্করণ বা বাহ্য কার্য-সহায়, মন তেমনি অন্তঃকার্য-সম্পাদক যন্ত্র বিশেষ, এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই সুখ দুঃখাদি সাক্ষাৎ-কারের হেতু। কণাদ বলেন, মনের আটটি গুণ আছে, যথা—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ। মন নিত্য নহে, তবে প্রলয় বা মোক্ষের পূর্ব্ব পর্যান্ত স্থায়ী বলিয়া মন প্রায় নিত্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। বৈশেষিক মতে মন জড়, কিন্তু আত্মার যোগে সে বুদ্ধিনামক চৈতন্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই আত্মা ও মনের সংযোগ ধ্বংস হইলেই চৈতন্যের লোপ বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনিও মন ও আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়-মতে আত্মা অনাদি-নিধন, কিন্তু মন উৎপন্ন প্রধ্বংসী। গৌতম মানস জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়া

আত্মাকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, কণাদ ও গৌতম উভয়েই মন সম্বন্ধে একমতবাদী।

সাংখ্য-দর্শনই এ জগতে মনস্তত্ত্বের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কপিল বলেন, পুরুষ-সান্নিধ্য-বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশই মহত্তত্ত্ব। "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" কপিল এই সমষ্টি মহৎ-কে মন আখ্যাও দিয়াছেন। সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থা যেমন, প্রকৃতি-ক্ষোভের পর মহত্তত্ত্বও সেইরূপ। হ্যামিলটনোক্ত কন্‌শাস্‌নেশের (Consciousness) সমষ্টি ও মহত্তত্ত্ব এইজন্য একরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাংখ্যমতে ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বই মন বা অন্তঃকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্তত্ত্ব অহংকারে পরিণত হইলে প্রচুর-সত্ত্ব অহংকার হইতে মন, প্রচুর-রজঃ অহংকার হইতে দশেন্দ্রিয় ও প্রচুর-তমঃ অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন হয়। বাহ্যজগত ইন্দ্রিয়-দ্বারে আঘাত করিবামাত্র স্নায়ুর পরিস্পন্দন উপস্থিত হয়। পরে মস্তিষ্কের কোমলাংশে যে ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র আছে, তাহাতে ঐ আঘাত পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয় মনের নিকট তাহা অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অর্পণ করে, বুদ্ধি আত্মার নিকট উপস্থিত করিলে আত্মা তথা হইতে বুদ্ধি পথে আদেশ প্রেরণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত পথে প্রতিক্রিয়ারূপ আদেশ প্রচলিত হইয়া বস্তু জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং মন একটি অন্তর্যন্ত্র, যদ্দ্বারা বস্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্যমতেও মন জড়, কিন্তু আত্মার সন্নিকটস্থ ও প্রচুর সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া চৈতন্যাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্থান মস্তিষ্কে; মনের স্থান সর্ব্বত্র। তবে হৃৎ-পুণ্ডরীক ও দ্বিদলই মনের প্রধান স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পতঞ্জলীও সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। জৈমিনি মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। বেদান্ত-মতে মনের স্বরূপ প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। তবে একটু প্রভেদ এই যে বৈদান্তিকগণ মনকে অধ্যাসিক বলেন। মায়াশক্তি যেমন

পরমাত্মাতে জগদিন্দ্রজাল কল্পনা করে ব্যষ্টি পক্ষে মনরূপ অবিদ্যাও তেমনি জীবাত্মাদি কল্পনা করিয়া বদ্ধ হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, 'নহ্যস্ত্য বিদ্যা মন সোহতিরিক্তা', মন ভিন্ন অবিদ্যা কিছুই নাই। কেবল জাগ্রত অবস্থা (Consciousness)-কেই ইঁহারা মন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। জাগ্রত (Conscious), স্বপ্ন (Semiconscious) ও সুষুপ্তি (Unconscious) অবস্থাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় অবস্থা (Superconscious) মনের বিষয় নয়। সে অবস্থায় মন লুপ্ত হইয়া যায়; তখনই পরমাত্মানুভূতি হয়। বেদান্ত বলেন, মনের প্রথম স্পন্দনাবস্থায় বাসনা জন্মে, তাহা হইতে সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হয়। এই বাসনার লোপ হইলেই মনের স্পন্দন হ্রাস হইয়া আত্মতত্ত্বে মিশিয়া যায়। বহু-জন্মেও মনের এই স্পন্দনাবস্থা লুপ্ত হয় না বলিয়া বাসনা-পূরণে জীব পুনঃ পুনঃ নানা যোনি ভ্রমণ করে। অবশেষে বাসনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ উপাধির লোপ হয়; কাজেই জ্ঞান বা পরমাত্মা প্রকাশিত হন। সমষ্টি-মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইয়া থাকে, ব্যষ্টি অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের তেমনি মন-সংজ্ঞা হয়। এই মনের লোপই মোক্ষ বা তুরীয়াবস্থা। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, হইবে না, কেবল—'মনরূপ মায়া উপাধি লইয়া ভাঙ্গি, গড়ি, ধরা আমরা সবে।' শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম ও গুরুসেবা দ্বারা মনের নিঃশেষ লয় করিলে পরমাত্মা আপনি প্রকাশিত হন। ইহাই মনস্তত্ত্বের এক প্রকার অস্ফুট ইতিহাস।

ক্রমবিকাশবাদ

উদ্বোধন—২২শ বর্ষ

সমাজের গঠন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেশ ভেদে ও কাল ভেদে সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় হইয়াছে। যে ব্যক্তি অতি উন্নত অবস্থা হইতে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দীন দৈন্য দশায় উপস্থিত হয়—আর যে ব্যক্তি অতি দৈন্য দশা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া সমাজে

বরিষ্ঠ হয়, এতদুভয়ের চিন্তা ও অনুভূতি যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কথায় বলে, রাজার ছেলে হাজার দৈন্য দশায় পড়িয়াও নিজের আভিজাত্য, মর্য্যাদা, সহৃদয়তা, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি একেবারে বিস্মৃত হয় না, আর গরীবের ছেলে হাজার বড় হইলেও সহজাত হীন দৃষ্টি, ব্যয়কুণ্ঠতা, হৃদয়হীনতা ও অভিমানের হস্ত হইতে একেবারে অব্যাহতি পায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ক্রমাবনতি (Involution) ও ক্রমোন্নতিবাদ (Evolution) সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তটি সুষ্ঠু প্রযোজ্য হইতে পারে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, অতি হীন, পাশব ও বর্ব্বরোচিত অবস্থা হইতে যৌন নির্ব্বাচনে, জীবন সংগ্রামের এবং সুখান্বেষণে শাখামৃগাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবকুল বর্ত্তমান সভ্য সমাজরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আর প্রাচ্য পণ্ডিতগণ জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "তোমরা অমৃতের অধিকারী—কাল ও কর্ম্ম-বিপর্যয়ে তোমরা হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ—আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দৈন্য দশায় পতিত হইয়াছ।" সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ যুগবিভাগ এই ক্রমাবনতি অবস্থার স্মারক ও জ্ঞাপক বলিয়া নির্ণীত হয়।

যে সকল উৎকট দার্শনিক সৃষ্টির একটা আদি কল্পনা করিতে চাহেন, তাঁহারা যে ক্রমসংকোচের বিষয় চিন্তা না করিয়া ক্রমবিকাশের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। বীজাঙ্কুর ন্যায়ে প্রাচ্য দর্শন কিন্তু ক্রমসংকোচ এবং ক্রমবিকাশ উভয় দিকই দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু জীবহিতকল্পে ক্রমসংকোচবাদের পক্ষপাতী হইয়া সমাজের সম্মুখে আদর্শের উচ্চমহিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা আমরা ক্রমেই দেখাইব। আর পাশ্চাত্য জড়দর্শন একমাত্র ক্রমাভিব্যক্তিবাদের পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আদি সৃষ্টি কল্পনা রূপ—দোষে ও মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে। অলাতচক্রবৎ ঘূর্ণিত এই সৃষ্টি প্রবাহের আদ্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য জড়বাদীগণ একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। "আদিমান্" বলিলেই "আকস্মিক উৎপত্তি" মানিতে হয়।—তা চাই সাংখ্যের

'প্রকৃতি'ই মান অথবা জড়বাদীর 'পরমাণু' বা 'ইলেকট্রন'কেই আদি বলিয়া মান, কিছুতেই আকস্মিক উৎপত্তিরূপ ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। বীজাঙ্কুর ন্যায়ে সংকোচ এবং বিকাশরূপ প্রবাহকারা সৃষ্টি না মানিলে 'আকস্মিক উৎপত্তি'রূপ গ্রহ-কবল হইতে তোমার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য উদ্দেশ্যহীন অন্ধ জড়শক্তির ক্রমবিকাশের কোন অর্থই বুদ্ধিমান অনুমান করিতে পারে না। আত্মজ্ঞ প্রাচীন প্রাচ্য ঋষিগণ চৈতন্য হইতেই জগতের অভিব্যক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। ব্যষ্টি মানবজীবন অথবা সমষ্টি সমাজ-জীবন উভয়কে আত্মার ক্রমাবনতি অবস্থা বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছেন। ইহ-জগত-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আবার অতিহীন পশুপক্ষী সরীসৃপ অবস্থা হইতে যৌন নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন প্রমাণ অবলম্বনে মানবজীবনের ও সঙ্ঘের ক্রমোন্নতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই দ্বন্দ্বমতের কোন্‌টি সত্য—কোন্‌টি প্রমাণের অনুকূল ও গ্রহণীয়, কোন্ মত গ্রহণে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা উপপত্তির গ্রহণ হইতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া অন্তশ্চক্ষুঃ আর্যঋষিগণ তাঁহাকে অদ্বয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সত্যজ্ঞান-অনন্তস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অদ্বয় সচ্চিদানন্দ আত্মাই দেশকাল নিমিত্ত বা নামরূপাবলম্বনে আপনাকে যেন দ্বিধা করিয়া (তদাত্মানং স্বয়ং ব্যকুরুত) দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। আপনাকে বলিদান করিয়া (দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া) ব্রহ্মা এই সৃষ্টি প্রকটন করিয়াছেন, ইহাও বেদে উক্ত হইয়াছে। জীবের যথার্থ স্বরূপ যদি নির্লেপ আত্মাই হন, তবে ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানব জীবন যে অচ্যুত আত্মার স্বরূপ বিচ্যুতি, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া 'আদম-ইভের' যে পতন তাও জীবের স্বরূপ বিচ্যুতির প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আত্মার এই দ্বিধা পরিণতি, যদি সঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়,

তবে বলিতে হইবে যে জীব স্বরূপবিচ্যুত হইয়া হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আত্মার যেন ক্রমসংকোচাবস্থা (Involution) উপস্থিত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে এই আত্মাই যদি জীবের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে ক্রমাবনতি বা ক্রমসংকোচবাদই প্রতিষ্ঠার যোগ্য। স্বরূপ-বিচ্যুতির শতসহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষিগণ প্রমেয় আত্মার যথার্থ যেরূপে দৃঢ়স্থাপন করিয়াছেন শাস্ত্রজ্ঞগণ তা'হা অবশ্যই জানেন। আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, অচ্যুত আত্মা স্বরূপতঃ যদি বিচ্যুতই হইয়া থাকেন তবে ক্রমাবনতিবাদ প্রমাণযোগ্য হইবে। আর জড়ের পরিণমন দ্বারা যদি আত্মার (চৈতন্যের) বিকাশ হইয়া থাকে তবে ক্রমোন্নতিবাদই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছে, একথা কোন জড়বাদী আজ পর্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই। জড় ও চৈতন্য যদি পৃথক সত্বা বলিয়া কথিত হয় (যাহা সাংখ্য শাস্ত্রেরও অভিমত) তবে একে অন্যাশ্রিত ও অন্যাভিভূত হইতে পারে মাত্র ; স্বরূপসত্বা কেহই ছাড়িতে পারে না—উভয়ের অনাদি পৃথক্ত্বই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদান্তমতে আবার "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা প্রমাণ করিতে জড় ও চৈতন্য বলিয়া কোন বিভিন্ন সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। ইঁহারা বলেন, চেতন ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা না থাকায়, ভ্রমবশেই দ্বৈতসত্তা কল্পিত হইয়া থাকে। সাংখ্য মতে জড় (প্রকৃতি) ও চৈতন্য (পুরুষ) অনাদি সত্তাদ্বয় (Eternal entities) স্বীকৃত হওয়ায়, জড় হইতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে (যাহা পাশ্চাত্য জড়বাদীগণের মত) এরূপ অনুমান করা যায় না। বেদান্তমতে ব্যবহার কল্পে একই চেতনাত্মা দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। জড় দৃশ্য—চেতন দ্রষ্টা।

চৈতন্য ভিন্ন জড় স্বয়ং কার্যদক্ষ হয় না—ইহা যদি সত্য হয় তবে জড় হইতে দ্রষ্টা আত্মার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। অনাদি চেতন বা আত্মা অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান আছেন। যদি বল, জড় পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে চেতনের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তবে আমরা বলিব,

জড়কে পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে পারে এমন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। আপন স্বভাবে জড় পরমাণু বা Electrons স্পন্দিত বা চালিত হয়—এরূপ বলিলে বলিব, এ বিষয়ে সমদৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। দ্রষ্টা (চেতন) যদি জড়ের অভিব্যক্তিক্রমে উৎপন্ন সত্তা হয়, তবে দ্রষ্টা জন্মিবার পূর্ব্বের অভিব্যক্তি অনুমানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। উৎপন্ন পদার্থ ধ্বংসশীল হওয়ায় চেতনের নিত্যত্বও অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। জড়োৎপন্ন বলিয়া অন্তে সকলি জড়েতে লয় হইবে, এইরূপ উপপত্তি সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, চেতনবাদ সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, চেতন হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অন্তে চেতনে লয়প্রাপ্ত হয়। উভয় সিদ্ধান্ত সমবল হইলেও শ্রুতি সিদ্ধান্ত চেতনাবাদেরই অনুকূল। জড়বাদের সিদ্ধান্ত স্বাধীন তর্ক প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক, আমরা এপর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, প্রাচ্য সিদ্ধান্ত চেতনবাদের উপর, আর পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত জড়বাদের উপর উপস্থাপিত।

এখন দেখা যাক্, এই জড় ও চেতনবাদ হইতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রমাবনতিবাদ কিরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য দর্শনমতে অনাদিকাল হইতেই জীব, সমাজ, সঙ্ঘ, আচার, নীতি ও ধর্মশাসন সত্যাদর্শে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। প্রাকৃতিক বা যৌননির্বাচন প্রভৃতি কল্পিত নিয়মে তাহা ক্রমে গড়িয়া উঠে নাই। জীব ও সমাজ ক্রমে কর্ম্ম ও উপাসনাভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতে হইতে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। সত্য, ত্রেতাদি যুগবিভাগ এবং তত্তৎযুগের মানব ও সমাজ জীবনের বর্ণনা তাহাই প্রমাণ করে। পুরাণোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে দেখা যায় সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্যানিরত—ক্রমে ব্রহ্মলীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন। পরে প্রবৃত্তি মুখে অবস্থিত মন্বাদি প্রজাপতিগণ জৈব-সৃষ্টি কল্পে দ্বৈতমুখে উপস্থিত হইয়াও তপঃসম্পন্ন প্রজা সকল সৃষ্টি করিলেন; তাহা দ্বারা মানব সমাজ ও সঙ্ঘের অতি উচ্চ অবস্থাই সূচনা করে। মরীচি, কশ্যপ প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট জীবকুল, মৃগ, সর্প, পশু, পক্ষী, মানব, দেবতা প্রভৃতি ক্রমস্তরে সজ্জীভূত পৃথক্ পৃথক্ই দেখিতে চাই। ক্রমোদ্বর্ত্তন

হিসাবে তাহাদের পরিণমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণী মাত্রই "ভোগ-শরীর" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া মনুষ্য ঐ সকল শরীর অবলম্বনে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রলয়াবস্থায় সৃষ্টির বিভিন্ন বীজ ব্রহ্মে কারণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকার কথা শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, শাখামৃগ, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দেবতাদিরূপ প্রকৃষ্ট বিভাগের বীজ ব্রহ্মেই কারণরূপে অবস্থান করে। সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হইবার কালে জীব-জন্তু, স্থাবর-জঙ্গম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়। জীবকুল ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ক্রমোদ্বর্ত্তন দ্বারা এক হইতে অন্যে পরিণত হয় না। হিন্দু শাস্ত্রমতে এইজন্য মানব বা সমাজের অভ্যুদয়ে যৌননির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তনরূপ কাল্পনিক নিয়ম প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। সত্য, জ্ঞান, সংযম, তপস্যা, অহিংসা, দান, তিতিক্ষা যে আদি সৃষ্ট মানবের নিত্য সহচর, সে মানব সমাজে জীবন সংগ্রামের উদ্ভট কল্পনা যে একেবারেই স্থান পাইতে পারে না, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পূর্ব্ব কথিত আর্য-সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য হয়, তবে সৃষ্টির প্রথমে প্রকটিত মনুষ্য সমাজ অত্যুন্নত অবস্থাদ্যোতক হইবে এবং আমরা যে কাল এবং যোগ বিপর্যয়ে ভ্রষ্টমতি হইয়া হীনাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর তখন যে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিবার জন্য সমাজে নীতি, রাজশাসন ও ধর্মশাসনের অভ্যুদয় হয় নাই ইহাও নিশ্চিত। দুর্বল, দুর্নীতিপরায়ণ জনসমাজকে বিভীষিকা প্রদর্শন করাইয়া শাসনে রাখিতে হয়, কিন্তু সবল ও সরলমনা জনগণের জন্য উক্তরূপ কঠোর শাসনের প্রয়োজন নাই। সুতরাং আদি-সৃষ্ট জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত মানব সমাজে জীবনসংগ্রামের কল্পনা হয় না—ব্যক্তিগত ও সমাজগত চরম স্বাধীনতা তখন চির প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যপথে, ধর্মপথে, সত্যপথে অবস্থিত, যে সমাজে প্রথমাবস্থা হইতেই প্রজ্ঞার অক্ষুণ্ণ রাজত্ব, সে সমাজে আত্মজীবন বা জাতীয় জীবন

রক্ষাকল্পে মানবেতর প্রাণীর ন্যায় জীবনসংগ্রামের উদ্যোগ নাই। ইতর-জীবের অভ্রান্ত সংস্কারের ন্যায় অত্যুন্নত অভ্রান্ত আদর্শজ্ঞান প্রাচীন মানবকুলকে সর্বদাই উন্নতির পথে পরিচালিত করে। সেই সমাজের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ—কাহাকে কোথাও ঠেকিয়া শিখিতে হয় না। যৌন-নির্বাচনে অমানুষ কখনও মানুষ হইতে পারে না; বরং উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায়, জঘন্য যৌন-নির্বাচনে মানুষ ক্রমে অমানুষ ও পশুত্বে পরিণত হয়। পাশবাবস্থায় নির্ম্মল নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তি-দ্যোতক হইলেও প্রাচীন আর্যসমাজে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিকাশ দেখা যায় না। বরং দেবাসুরাদির সংগ্রাম ক্রমনিম্ন স্তরেই দৃষ্ট হয়। এইজন্য বলিতে হয় ক্রমাবনতি পথেই ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূচনা হইয়াছে।

হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ জড়বাদী পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা বা বলবানের ভয়ে সমাজের দুর্বল লোকগণ তাহাকে ভয় করে, পূজা করে, দেবতা বলিয়া সম্মান করে। ইহা হইতে কালে ঈশ্বরারাধনার সূত্রপাত হইয়াছে। এ দেশীয় মতে রাজা হইতেছে সমগ্র প্রজাশক্তির সংহত বিগ্রহ—"অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভিঃ নির্ম্মিতো নৃপঃ।" চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, সমস্ত দেবগণের সংহতশক্তি হইতে দেবী উৎপন্না হইয়াছেন; রাজাও তেমনি প্রজাশক্তির স্ফুরদ্‌বিগ্রহরূপে উদিত হন। তিনিও আবার ব্রহ্মণ্যশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজশক্তি সর্বদাই প্রজাগণের অভ্যুদয়ে পরিচালিত। "প্রজানামেব ভূত্যর্থং" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা তাহার প্রমাণ। প্রাচীন হিন্দু সমাজের আদর্শ দেখিয়া মনে হয় না যে, ক্রমবিবর্ত্তন দ্বারা সমাজে রাজাপ্রজারূপী ব্যবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে প্রাচীন আর্যসমাজে চৌর্য্য, দ্যূত, পরপীড়ন, ব্যভিচার প্রভৃতির প্রাবল্য দৃষ্ট হয় না—পক্ষান্তরে যে সমাজে, ধর্ম্ম ও নীতি ভিত্তিস্থানীয়, সেখানে কোনরূপ দৌর্ব্বল্য বা ক্লীবতার প্রভাব কল্পনা করা যায় না। প্রজাকুল ভয়ে ভয়ে রাজাকে মান্য করিতে সমাজ বদ্ধ হয় নাই। বরং সমুন্নত প্রাচীন মানব সমাজ রাজাকে নীতি, ধর্ম্ম ও মর্য্যাদার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমধিক প্রসারই

দিয়াছিলেন। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্ত দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে, পাশ্চাত্য জগতেই ঐরূপ রাজা ও ঈশ্বরভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে কেবল পাশব বলে বলীয়ান রাজার অভ্যুদয় হয় নাই ; কারণ এদেশে রাজা ধর্মের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বলিয়া এখনও পূজিত হন—তাঁহার দর্শন পুণ্যদর্শন বলিয়া কথিত হয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব অনাদিকাল হইতেই সমাজের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে কিন্তু ভারতবর্ষে নিবৃত্তিমূলক ধর্মভাবই ব্যক্তি ও সমাজে প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল। যুগবিপর্যয়ে তপঃপ্রবাহ হীন মানব ক্রমাবনতি পথে ক্রমে প্রবৃত্তির দাস হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বাদীগণ ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

ক্রমোন্নতিমুখে সমাজের গঠন, নীতি ও ধর্ম্মনায়ক কাল্পনিক শাসনের ক্রমাভ্যুদয় প্রভৃতির বর্ণনায় যে জড়বাদী পাশ্চাত্য দর্শন পরিপূর্ণ; ইহা প্রায় সকলেই জানেন। সেই সকল মত বিস্তৃতভাবে এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মারামারি কাটাকাটি করিয়া মনুষ্যেতর প্রাণী যে জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত রহিয়াছে ইহা আংশিক স্বীকার করিলেও মানব সমাজে তাহার সমর্থন দৃষ্ট হয় না। নিরীশ্বর সাংখ্যকারও তাহা স্বীকার করেন না। ঔপপাদিক জন্ম বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সংস্কারে, বিভিন্ন দেহেই সংঘটিত হয়, ইহাই সাংখ্যের অভিমত। জাত্যন্তর পরিণাম যৌন-নির্বাচন দ্বারা অথবা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের দ্বারা সংসাধিত হয় না। সাধনাপ্রসূত ওজঃ শক্তির প্রাবল্যে তাহা সম্পাদিত হয়; ইহাও সাংখ্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দার্শনিক চিন্তার স্মারক হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতের প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ গর্ত্তমধ্যে বাস করিত—বিচিত্র রঙ-বেরঙএ দেহ রঞ্জিত করিত, আমমাংস আহার করিয়া মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় জীবনযাপন করিত—শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিতে যাইয়া ক্ষাত্রতেজ প্রাপ্ত হইত—নৌশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য জলযান নির্ম্মাণে ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিত। ইদানীন্তন সভ্য পাশ্চাত্যসমাজে ঐ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার স্মারক-চিহ্ন অদ্যাপিও বহুধা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। তবে কালক্রমে সর্ববিষয়েই উন্নতির চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের আদিম সভ্য সমাজের আহার, বিহার, সংযম, মিতচারিতা, আত্মতত্ত্বলাভের জন্য তীব্র বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রভৃতি আজিও ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত করে—আজিও হিন্দুসমাজে ঐরূপ আদর্শলাভ করিতে ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়; আর ঐ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষীণালোক এখনও হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশ শারীরিক বলকে জীবনের প্রধান অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সেই শক্তির বহুধা উন্মেষে যে শত শত উদ্যম দেখাইতেছেন—জলস্থলে কত নিধনাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া যে ঐহিক জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতেছেন—তাহা সকলেই জানেন। আধ্যাত্মিক শক্তিমান প্রাচীন ভারতের ঋষীবংশোৎপন্ন মানবকুল এখনও কিরূপ তপোনিষ্ঠ হইয়া জীবন-মরণ সমস্যা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও পাঠকগণ অবশ্য জানেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, পাশ্চাত্যগণ আপনাদিগকে প্রতাপান্বিত বীর্য্যবান্ দেশজয়ী সৈনিক, সেনাপতি বা দস্যুদলপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিলে কৃতার্থ হয়। আর ভারতের অধিবাসীগণ আপনাদিগকে তপসিদ্ধ মনু, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশধর বলিয়া নির্ণয় করিয়া আনন্দ লাভ করেন, ইহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিণাম ফল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

আর একটি কথা এই যে, সকল দেশেই প্রাচীন আচারের কিঞ্চিদাভাস এখনও সমাজে প্রচলিত দৃষ্ট হয়। দেশভেদে ইহা ভিন্নাকারে ব্যাখ্যাত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রথম দর্শনের মিলন-চুম্বন তৎদেশীয় প্রাচীন কালের মাংসলোলুপতার চিহ্ন, অথবা করমর্দ্দন প্রণালী প্রাচীন কালের হাতাহাতি লড়াইয়ের পরিচায়ক, অথবা বিবাহকালে জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি সেকালের বলপূর্বক কন্যা হরণের

তুমুল সংগ্রামের অবশিষ্ট আচার। পাশ্চাত্য জড়বাদীগণ এই সকল আলোচনা করিয়া বলেন যে, প্রাচীন কালের জীবনসংগ্রামের এইগুলি বিশিষ্ট পরিচায়ক। ভারতবর্ষে প্রচলিত ইদানীন্তন অনেক আচার-প্রণালীও তদ্রূপ এতদ্দেশীয় মতবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ভগবচ্চরণে কায়মনোবুদ্ধি অর্পণ বা সর্বভূতে আত্মার অখণ্ড অবস্থান দর্শন হইতে নমস্কার প্রথার প্রচলন—সর্ব্বদা উত্তরীয় বস্ত্র ধারণের অসুবিধা হইতে ত্রিদণ্ড পৈতাধারণ প্রথার প্রচলন—মৃগমাংস, কুশাসন, ঘৃতাদির প্রাচীন যজ্ঞাদিতে প্রচলন থাকা হইতে ইদানীং উহাদিগকে পবিত্র বলিয়া গ্রহণ—জগৎকে আপনার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে নিজকুল বা গোত্রে বিবাহ না করিয়া অতিদূর ভিন্নকুল গোত্রে বিবাহকরণ প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের মূলে জীবনসংগ্রামের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে এই সকল আচারের মূলেও উন্নত সমাজের ধর্ম্মলিঙ্গ অনুমিত হয়। প্রতীচ্য দেশে আচারগুলি সমাজের অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়। এ দেশে কিন্তু সমাজ ও জীবনের উন্নতি-কল্পেই তাহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। কারণ, তাহাদের অবলম্বনে মানুষ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমারূঢ় হইতে পারে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ক্রমসংকোচ ও ক্রমবিকাশবাদ কতদূর সত্য তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন। আমরা উভয় দেশের মতগুলি যথান্যায়ে উপন্যস্ত করিয়াছি মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই মতদ্বয়ের কোন্‌টি প্রচারে এবং কোন্ মত অনুসরণে জীব ও মানব সমাজ উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবার যোগ্য হয়? যাঁহারা Amoeba (কীটাণু) হইতে যৌন-নির্বাচনে বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে ক্রমে আপনা-দিগকে মহাবল-প্রাণী বলিয়া মনে করেন—অথবা যাঁহারা আপনাদিগকে তপঃসিদ্ধ ঋষি ও দেবতার বংশধর বলিয়া জানেন এবং আপনাদের প্রাচীন গৌরবলাভের জন্য ঘোর তপশ্চর্য্যা ও সংযম অভ্যাস করেন—যে আদর্শ জীবকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, সমাজ ও ব্যক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে, আপনার স্বরূপে পুনঃস্থাপন করিতে চায়

তাহাই উত্তম ; অথবা যে আদর্শ সম্মুখে ও পশ্চাতে কেবল জীবন-মরণের সংগ্রাম বিভীষিকা প্রদর্শন করে, এ জীবনের চরমাভিব্যক্তি কোথায় কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না, নীতি এবং ধর্ম্মকে লোক স্থিতির তুচ্ছ কারণ বলিয়া যৌননির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনকে মূল ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে—তাহাই উত্তম ? যে আদর্শে নবীন পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নবশোণিতে ইউরোপ প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, সেই আদর্শ যদি ক্রমোন্নতিমূলক হইয়া থাকে তবে সেই ক্রমোন্নতিবাদকে দূর হইতেই নমস্কার। আর যে আদর্শে ভারতবর্ষ শতশত বৎসরের অত্যাচার ও পরাধীনতা সত্ত্বেও আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া জীব ও সমাজকে উচ্চ আদর্শের দিকে চালিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শ যদি ক্রম-সংকোচবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাই আমাদের গ্রহণযোগ্য হইবে।

সৃষ্টি তত্ত্ব

উদ্বোধন—২য় বর্ষ

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই দার্শনিকগণ সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত। আধুনিক বাহ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যও তাহাই কিনা, স্থির বলা যায় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি বহির্ম্মুখী ; দর্শন অন্তর্ম্মুখ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেক পদার্থের সংশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক চাহেন, ঐহিক সুখ সুবিধার অনন্ত উৎসের আবিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির মূল কারণানুসন্ধান। দার্শনিক চাহেন, মনোবুদ্ধি-অহংকারাদি মানসিক ব্যাপারের সংশ্লেষণ করিয়া দুঃখ ব্যতীত পরম শান্তি লাভ, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ সমাধান। বৈজ্ঞানিক চাহেন, ভূত পঞ্চককে ক্রীড়নক করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের, মনীষার ও দৈবীকল্প

লীলার প্রদর্শন। দার্শনিক চাহেন, অনন্ত-ভাব-ভাণ্ডার মনের উপর নিঃশেষাধিপত্য বিস্তার করিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান রাজ্যের ক্রান্তি-দর্শন। একজন ভৌতিক পদার্থের (matter) দাস; আর একজন মানসিক ব্যাপারের (mind) ক্রীড়া পুত্তলিকা। একজন প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের গূঢ়নিয়মন রহস্যভেদে উদ্যোগশীল; আর একজন মনোব্যাপারের অলৌকিক শক্তি বিকাশে পরিমগ্ন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই দুইয়ের একেতর রাজ্যে অবশ্য বিচরণ করেন।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান হইতে পারে না। যাহা বাহিরে দর্শন করা যায়, তাহার ভাবগুলি (Ideas) মনে সঞ্চিত হয়; এইরূপ ভাব-দর্শনজনিত ভাবের সমষ্টিই মন। সুতরাং এই বিচার প্রণালীতে দেখা যায়, মনের উপর বহির্জগতের প্রাধান্য সম্পূর্ণ ও নিত্যবিদ্যমান। ফরাসী পণ্ডিত কোমৎ ও তন্মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ (Positivists) এজন্য প্রত্যক্ষ বাহ্য বিজ্ঞানবাদী। তাঁহারা বলেন, এই ভূত-ভৌতিক সংমিশ্রণোৎপন্ন বাহ্যজগৎ ভিন্ন, মন আর কিছুই জানিতে পারে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববাদী দার্শনিকগণ বলিতেছেন, বহিঃপ্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের ভাব (Idea) মনে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, তোমার বাহ্য জগৎ আছে। নতুবা কে বুঝিতে পারিত যে বাহ্য জগৎ বর্ত্তমান আছে? ভাব ছাড়া জগৎ নাই; আবার জগৎ ছাড়াও ভাব নাই। এজন্য উভয়ই উভয়ের আপেক্ষিক বা অন্যোন্যাশ্রয়ী। জড় ও মন এ উভয়ের পক্ষ সমর্থন-কারীরা তাই আবহমান কাল হইতেই সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন।

প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবাদী ও মনস্তত্ত্ববাদী উভয়েই নিজ নিজ মতানুকূল সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অগ্রসর। জল, বায়ু, বিদ্যুৎ, অম্লজান সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, আমার একেত্তর উপাদানেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ হইয়াছে। দার্শনিক বলিতেছেন, অহংকারাত্মক বিরাট মন বা অব্যক্ত মহৎ হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং মনই জগতের উৎপত্তি-কারণ। ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি ভারতীয় দর্শন, প্লেটো, হেগেল, কোমৎ, কাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন সকলেই

এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছেন। এমন কি যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, সেই বেদ, বাইবেল ও কোরা াদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অসদ্ভাব নাই। তাহারা সকলেই ভ্রান্ত, এ কথা বলা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক ; তথাপি এ বিষয়ের কিঞ্চিদালোচনা করা যাক।

মনের করণ (Instruments)-গুলি সীমাবদ্ধ। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি নাতিদূরেই প্রতিহত হয়। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি শক্ত্যাদির স্ফুরণ দার্শনিকগণ স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা, করি এই অনন্ত, গ্রহতারকাখচিত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপরসাদি গুণের উপর তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে ইন্দ্রিয়াদি যে দেশকাল নিমিত্তাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মন যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানসমষ্টি মাত্র, তখন মনও অসীম হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং মনোবিম্বিত জগৎও সীমাবদ্ধ। জীবগত মন ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য ব্যক্তিগত জগৎও ভিন্ন ভিন্ন—যেমন দূরত্ব ও নৈকট্যবশতঃ একই পদার্থ বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যাহা লইয়া আমরা জগৎ জগৎ করিতেছি, তাহার মূল স্বরূপ যে কি, তাহা কোন কালে কেহই জানিতে পারে নাই, পারিবেও না। যে জগৎই জানিবার উপায় নাই তাহার আবার কারণানুমান করিতে যাওয়া বাতুলতা ও প্রবল সাহসিকতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অগণ্য গ্রহতারকাখচিত অনন্ত বিমান, অনন্ত-স্থাবর-জঙ্গম-ব্যূহ-বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড ও অদ্ভুত নদ-নদী-পর্ব্বত সাগর পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল দর্শন করিয়া কোন অর্ব্বাচীন বৈজ্ঞানিক ইহার কারণানুসন্ধানে হতাশ না হইয়াছেন? অনন্ত ভাবতরঙ্গের গভীর উৎস মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করিয়াই বা কোন দার্শনিক সৃষ্টিরহস্যের নিঃশেষ মীমাংসায় কৃতকার্য হইয়াছেন? এজন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারপথে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়োজিত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বানুসন্ধানে

অন্বয়ী প্রমাণে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ববাদী গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হইতেই পারিতেছে না।

ক্ষীণ মস্তিষ্ক ভাবপ্রবণ (sentimental) একদল লোক জগতে জন্মিয়াছেন, যাহারা বলেন এই সৃষ্টি দেখিয়াই সৃষ্টি-তত্ত্ব-রহস্য বা জগৎ-কারণ বা ঈশ্বরানুমান হইতে পারে ও তাহাদের মধ্যে কেহ বা ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ .....দর্শন করিয়া কালীলীলা দর্শনে আত্মহারা হন। কেহ বা শ্যামল-শাদ্বল-পূর্ণ শস্যক্ষেত্রে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম দর্শন করেন। কেহ বা সমুদ্র, আকাশ ও পর্ব্বতে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হন। হে ভাবুক! যদি তুমি ঐ সকল রমনীয় বা গভীর দৃশ্যের সৌন্দর্যে বা গভীরতায়, কেবল সৌন্দর্য বা গভীরতার জন্য (Beauty for beauty's sake) অভিভূত বা আত্মহারা হইয়া থাক, তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি। আমিও সে ভাবের জন্য লালায়িত। কিন্তু ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে অথবা কীটভক্ষিত মস্তিকের বৈকল্যবশতঃ যদি তুমি "অবাঙমনসগোচরং" ব্রহ্মের হস্তাক্ষর যথায় তথায় দর্শন কর, তাহা হইলে তোমাকে ভাবপ্রবণ উন্মাদ বলিয়া, দয়ার পাত্র বলিয়া মনে করিব।

পক্ষান্তরে দর্শনবিৎ যুক্তি প্রাণ একদল লোক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা বলেন, এমাত্র শাস্ত্রযুক্তি ও স্বাধীনযুক্তি সহায়তায়ই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা শরীর কৃচ্ছ্রকারী তপস্যাবলম্বনে মনোজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কেহ বা যুক্তি তর্কের ফাঁসে ঈশ্বরের হাত বাঁধিয়া কয়েদীর ন্যায় তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে চাহেন। হে জ্ঞানিন্! যদি অনুরাগের সহিত শুধু ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য, তুমি শাস্ত্র বা যুক্তির আশ্রয় লইয়া থাক, তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি। আমিও যে শ্রুত্যনুকুল যুক্তিপথের পথিক। কিন্তু বিদ্যা ফলাইবার কামনায় যদি তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের সত্তা প্রমাণে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে তোমাকেও দয়ার পাত্র মনে করিব।

যাহা হউক পূর্বোক্ত বিচার প্রণালীতে আমরা দেখিয়াছি, এ সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কারণ এক প্রকার অজ্ঞেয়। সুতরাং স্পেনহারের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) বা কপিলের নিরীশ্বরবাদ আসিয়া পড়িতেছে। আস্তিক! তুমি হতাশ হইও না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি তোমার অনুকুলেই উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৈজ্ঞানিক বাহ্যজড়-শক্তির সমীকরণে অসমর্থ হইয়া, নিজের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা বুঝিয়া বলিতেছে—("I am collecting the pebbles only"), আমি জ্ঞান সমুদ্রের তীরে কতিপয় উপল সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। দার্শনিক অনিমাদি মহাশক্তি লাভ করিয়াও বলিতেছেন, "ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষঃ।" নিজের অজ্ঞতাব দিকে উভয়েরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়াছে। উভয়েই বুঝিয়াছে, "ইহা কারণ নহে", "ইহা কারণ নহে।"—"নেতি," "নেতি।" প্রত্যক্ষ বা অনুমানে যাহা যাহা জগৎ কারণ বলিয়া দৃশ্য বা অনুমিত হইতেছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তখনি বুঝিয়াছেন "নেতি" "নেতি।" এই আত্ম-অজ্ঞতাই আত্মজ্ঞানের উদ্ভাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "যস্যামতং তস্যমতং," "বিজ্ঞাতমবি জাততাম্" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের সাক্ষীরূপে তাহারা দণ্ডায়মান হইতেছেন। উভয়েই সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্বে অবগাহনোন্মুম হইয়াছেন। দেশ কাল নিমিত্তের অলীক পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আর মুখে কেবল "নেতি" "নেতি"। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বুঝিয়াছেন, যে সৃষ্টি-রহস্য ভেদে এত গ্রন্থ লিখিলাম এখন দেখি সে সৃষ্টিই নাই। এক অখণ্ড চৈতন্য আমিই দিক্-দেশ-কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। বেদমুখে তাই ঋষি গাহিতেছেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয়

উদ্বোধন—২১শ বর্ষ, ১৩২৬ সাল

মনুষ্য জীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু নিদ্রাবস্থায় গত হয়—বাল্য ও বার্দ্ধক্য, অজ্ঞতা এবং জরাব্যাধিতে আচ্ছন্ন থাকে—ভোগ লালসায় যৌবন ক্ষয় হইয়া যায়। এই অবস্থাগুলির সমষ্টির নাম "মানব জীবন"। সিদ্ধ বৈষ্ণব কবি তাই বলিয়াছেন :—

আধ জনম হাম নিঁদে গোঙায়নু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রঙ্গ রসে মাতনু,
তোঁহে ভজব কোন বেলা॥

অর্থাৎ জীবনের অর্দ্ধকাল নিদ্রায় গত হইল—বার্দ্ধক্য ও শিশুকাল জরা ও অজ্ঞতায় কাটিল—যৌবন ভোগ লালসায় অতিবাহিত হইল। হে প্রোভো! তোমাকে ভজন করিবার অবসর কোথায় ?

বস্তুতঃ, মানব জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, সাধারণ মানব জীবনই এইরূপ গতিশীল। কদাচিৎ কোন সাবহিত মহামনস্বীর জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় মাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়াই মানবজীবন বহিয়া যাইতেছে। এই অবস্থা ত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত মানব জীবনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাহাকে আমরা জাগ্রৎ অবস্থা বলি, তাহাতেও আবার বহু অজ্ঞতার আবর্ত্ত দৃষ্ট হয়। ভ্রম, প্রমাদ, জাড্য, সংশয়, বিকল্প ও বিপরীত ভাবনা জাগ্রৎ ভূমির নিত্য সহচর। এগুলি যেন জাগ্রৎ সাগরের নিত্য ঘূর্ণিপাক স্বরূপ। এই জাগ্রৎ অবস্থাই (Conscious state) স্থূল ভোগভূমি ব্যবহারিক "আমি আমার রাজ্য।" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগত এই অবস্থায় পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ ও আয়ত্তে অবস্থান করে। যাহাকে শাস্ত্রে স্বপ্নাবস্থা বলে, তাহা ত প্রায় অজ্ঞতারই অনুরূপ। এই স্বপ্নাবস্থা

(Semi conscious state) খানিক জাগ্রৎ, খানিক সুষুপ্তির ছায়াময় ভূমিতে অবস্থিত। যেন জাগ্রৎ রূপ দিবা ও সুষুপ্তিরূপ রাত্রির সন্ধিস্থলে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনের সন্ধিক্ষণ সূচনা করে। নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থা (Unconscious state) ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই অবস্থাত্রয় ভূমিতে প্রবাহিত মানবজীবন প্রায় যেন অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য দিয়াই গতাগতি করিতেছে।

জাগ্রৎভূমে অবস্থানকালে আমরা জড়জগতের কতকগুলি রহস্য ভেদ করিয়া আপনাদিগকে ইদানিং কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। কতকগুলি কল কৌশল, কতকগুলি ব্যবহারিক জ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য, কতকগুলি নিয়ম-নীতি-বন্ধন-সহায়ে দেহের, দেশের, সংঘের ও সমাজের কথঞ্চিৎ শৃঙ্খলা বিধান করিয়া মানব জীবন সুখী করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই সকল জাগ্রদাবিষ্করণে সাময়িক কথঞ্চিৎ সুখসুবিধা লাভ হইলেও ইহা জীবকে শাশ্বত সুখশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যুক্তি তর্কে ইহা বুঝাইতে হয় না। প্রতি জীব নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করে। বহির্জগৎ, যাহা রূপরসগন্ধাদির সমষ্টি বই আর কিছুই নহে—তাহার পশ্চাতেই মানুষ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে। অন্তর্জগতের কোন সন্ধান না পাইয়া "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" পথে চিরকাল গতাগতি করিতেছে।

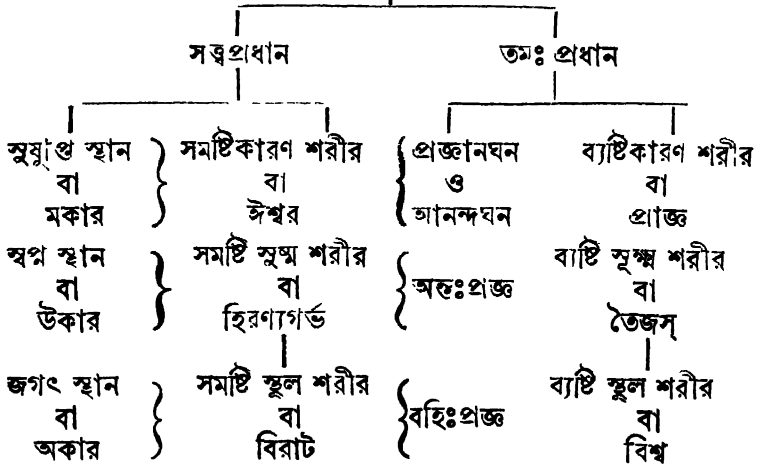
চিন্তাশীল আর্যঋষিগণ অন্তর্জগৎ রহস্য ভেদ করিতে বহির্জগৎ যেন প্রায় উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়াছেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন মানবজীবনের রহস্য ভেদ কল্পে প্রাচীন ঋষিগণ "আবৃত চক্ষুঃ" হইয়াই যেন অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্তরের নিয়মগুলি অন্তশ্চক্ষু না হইলে দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য অধুনা আবিষ্কৃত বাহ্য বিজ্ঞানরহস্য—যাহার বিশ্লেষণে ভূতপঞ্চক যেন ক্রীড়াপুত্তলীবৎ ঐহিক জীবনের সুখসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে—সেইগুলি আর্যঋষিগণ দেখিয়াও যেন দেখেন নাই। তাঁহারা এই জীবন রহস্য ভেদেই জীবনের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন একখণ্ড মৃদ্-জ্ঞানে সমগ্র মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মে,

তেমনি একটি মানব জীবন বিশ্লেষণে, সমগ্র মানবজীবন রহস্য ভেদ হইয়া যায়। অন্তর্মুখে অবস্থিত আর্যঋষিগণ এইজন্য মানবজীবনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি বুঝিতে পারিয়া যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ধর্মপ্রাণ জনগণের তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। ভারতের বিচার প্রণালী অন্তর্মুখ—আধুনিক জগতের, বহির্মুখ। স্বামীজী একদিন লেখককে বলিয়াছিলেন, "তোরা যাকে কালী কালী ব'লে উপাসনা করিস্ ও-দেশে দেখে এলুম, সেই কালীই কামানের মুখে গোলা নিয়ে বসে রয়েছেন।"

আমাদের শরীরটা যেমন নিকটে, আর কোন বস্তুই তেমন নয়। এই শরীরের মধ্যে আবার দশ ইন্দ্রিয়, মন ও চৈতন্য বিরাজ করিতেছে। শরীরের চেয়ে সেগুলি আরও কাছে বা অন্তরে। সকলের চেয়ে কাছে বা অন্তরে হচ্ছেন জীবচৈতন্য—যাহা জীবের যথার্থ স্বরূপ। কাজেই সেই চৈতন্য সত্ত্বার অন্বেষণে অন্তর্মুখী হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। তাই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—"আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" আবৃত চক্ষুর অর্থ হইতেছে মনকে রূপ-রসাদি হইতে তুলিয়া অন্তর্মুখ করা—অর্থাৎ বহির্জগতের বিষয় ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মতত্ত্বাভিমুখ করা। রূপরসাদির প্রলোভন ত্যাগ না না হইলে—মনের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের ত্যাগ না হইলে—"আবৃতচক্ষুঃ" হওয়া যায় না। সুতরাং জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব অবগতহওয়া যায় না।

আত্মদর্শী আর্যঋষিগণ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট মানব জীবনের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া জগতের মূল কারণ বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও এই অবস্থাত্রয় ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা এই অবস্থাত্রয়াতীত এক তুরীয় বা অতিজাগ্রত ভূমির (Super Conscious State) আবিষ্কার করিয়া তাহাকে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বয়ং" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁকার মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে "ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলি এই ওঁকার ; এই ওঁকারই আবার ত্রিকালাতীত ও সর্বজ্ঞ।" ইহা চতুষ্পাৎ—ওঁকারের অকার

জাগরিত স্থান—বহিঃপ্রজ্ঞ—বিশ্ব ; উকার স্বপ্ন স্থান-অন্তঃ প্রজ্ঞ—তৈজস্। মকার সুষুপ্তি স্থান—প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময়-প্রাজ্ঞ। তদতীত তুরীয় স্থান শান্ত-শিব-অদ্বৈত। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে সহজে ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্য লইতেছি।



চিত্রের সমষ্টির দিক দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তুরীয় ব্রহ্মই প্রকৃতির মধ্য দিয়া যেন সমষ্টিকারণ শরীর বা ঈশ্বরতত্ত্বে পরিণত হইয়াছেন। ইহা সুষুপ্তি স্থান হইলেও সত্ত্বগুণ প্রধান বলিয়া জীব সুষুপ্তির ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহে, পরন্তু প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। সত্ত্ব প্রধান ঈশ্বর মায়াধীশ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও নিয়ন্তা। এই ঈশ্বর তত্ত্বই বেদে লয়স্থান ও "অধ্যাত্ম" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেই

সমষ্টিকারণ তত্ত্বই রজোগুণ প্রাধান্যে যেন সূক্ষ্ম শরীরী হিরণ্যগর্ভরূপে পরিণত হইয়াছেন; হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ, ভাবী প্রকটিত জগত যাঁহার গর্ভে অবস্থান করে। শাস্ত্রে এই সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী দেবতাকে স্বপ্নস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, সূক্ষ্মভাবে যেন সকলি ভোগ করেন। অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থে অন্তরেই সঙ্কল্প-সম্পন্ন-বহিরালম্বনশূন্য। এই হিরণ্যগর্ভই গুণবিপাকে সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী বিরাট বা বৈশ্বানর বলিয়া কথিত হন। স্থূলজগৎ ভোগ্যরূপে অবস্থান করাতে ইনি বহির্বিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন—তাই বহিঃপ্রজ্ঞ।

ব্যষ্টি বা জীবপক্ষে (দক্ষিণের চিত্র দেখুন) বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জীব তমঃপ্রধান বলিয়া তাহার সুষুপ্তিভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি কারণশরীর ঈশ্বরের ন্যায় প্রবুদ্ধ নহে। অতি জাগ্রৎ ভূমির অতি নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাতে প্রায় তন্ময় হইয়াও জীব আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বেদ তাই বলিয়াছেন, জীব প্রত্যহই ঘোর সুষুপ্তিতে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে না। এই সুষুপ্তি অবস্থাই জীবের কারণশরীর। শাস্ত্রে ইনি প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। রজঃস্তম প্রধান প্রাজ্ঞই সূক্ষ্ম বা মনোময় শরীরে প্রকটিত হইয়া সংকল্পবান্ হন, তখন ইঁহাকে 'তৈজস্' নামে অভিহিত করা হয়। এই তৈজস্' আবার অধিকতর তমঃপ্রধান হইয়া স্থূল শরীর ধারণ করিয়া থাকে ও স্থূলশরীরাভিমাণী জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে 'বিশ্ব' বলা হয়। এই ত্রিবিধাকারে অবস্থিত হইলেও বুঝিতে হইবে, এক আত্ম'ই এই তিন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। গৌড়পাদীয় কবিতায় উক্ত হইয়াছে—

"বহিঃ প্রাজ্ঞো বিভুর্বিশ্বোহ্যন্তঃ প্রজ্ঞশ তৈজসঃ।
ঘন প্রজ্ঞাস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাস্থিতঃ॥"

জীব ও ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ ভূমিতে আরোহণ ও অবরোহণ চিন্তা করিয়াই গুণত্রয় বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বরেরও ত্রিমূর্ত্তি সিদ্ধ

হইয়াছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ কালত্রয় বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, ভূঃ, ভুব, স্ব, প্রভৃতি লোকের ত্রিত্ব কথিত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক ত্রিলিঙ্গ বিভাগ,—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ ত্রিধা নাড়ীচিন্তা—নাভি, হৃদয় ও মস্তিষ্করূপ ত্রিধা ধ্যান স্থান নির্দেশ—জন্ম, প্রেতত্ব ও মৃত্যুরূপ অবস্থার ত্রিধাভেদ নির্ণয় এই জাগ্রদাদি অবস্থা ত্রয়ের প্রতিবিম্ব কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

জীব বলিতে শাস্ত্রমতে উপাধিভূত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি উপাধি লইয়া অবস্থান করেন, তখন সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে তাঁহার বিরাট ও জীব (বিশ্ব) সংজ্ঞা হয়। উপাধির অপগমে উভয়েই এক অখণ্ড সত্ত্বায় বা তুরীয় ভূমিতে এক হইয়া যায়। এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে পরমার্থ পক্ষে জীব ও শিব এক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেও মধ্যে অজ্ঞানের পর্দা ব্যবধান থাকে, যাহা জীবাত্মার দৃশ্যরূপে প্রকাশ পায়। সাধন বলে এই অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন হইলেই জীবাত্মা শিবত্বে বা তুরীয় ভূমিতে অবস্থান করেন। নীরে ক্ষীরবৎ একাকার হইয়া যায়। সুতরাং জীব ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়।

জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নভূমে গমন করে তখন কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ঘুমাইয়া পড়ে অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হয়।—কিন্তু প্রাণ, মন, বুদ্ধি সত্ত্বাত্তিক থাকে। এই অবস্থায় জীব বাসনাময় শরীরে অবস্থান করে ও জাগ্রৎকালীন ও জন্মান্তরীণ সঞ্চিত বাসনাবশে মনোময় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া বিচরণ করে। মন যেন তখন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে অবস্থান করে। ইহা ভাবী জাগ্রৎভূমির সূক্ষ্ম বীজ স্বরূপ। এই মনোময় বাসনাকৃত শক্তি হইতে স্থূল জগৎ প্রপঞ্চ বিজৃম্ভিত হয়। স্থূলদেহ নিষ্ক্রান্ত মৃত জীব ও এই সূক্ষ্ম শরীরেই স্বর্গ নরকাদিরূপ স্বপ্ন ভোগ করে এবং তৎপর স্থূলদেহ লাভ করিয়া জাগ্রৎভূমে আগমন করে। যেমন নিদ্রা হইতে স্বপ্নভূমি, স্বপ্নভূমি হইতে জাগ্রৎভূমিতে জীবের

আগতি হয়, তেমনি সূক্ষ্ম বাসনাসম্পন্ন মৃত্যুরূপ স্বপ্নভূমি হইতে জীব জননপ্রণালী নিয়মে জাগ্রৎরূপ স্থূলভোগ্য জগতে জন্মলাভ করে। স্বপ্নময় দেহই অতিবাহিক বা সূক্ষ্ম দেহ।

স্বপ্নভূমি হইতে জীব যখন সুষুপ্তিতে গমন করে তখন মন ও বুদ্ধির বৃত্তি (স্পন্দন) নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন জীবাত্মা একমাত্র অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে স্থির হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তাহার 'কারণ-দেহ'। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া নিজের যথার্থ স্বরূপ বা মহাকারণ ব্রহ্মকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। বোধ হয়, শাস্ত্রে এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-শরীর ত্রয়কেই "ত্রিপুরাসুর" বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই ত্রিপুরাসুর জয় করিলেই জীবের শিবত্বে অবস্থান ঘটে। এইজন্যই কি শিব বা তুরীয় ভূমি ত্রিপুরনাশন বলিয়া কথিত হইয়াছেন ? সে যাহা হউক, মোটকথা এই যে, এই তিন অবস্থা বা ত্রিতয় দেহের অধ্যাস নিরাকৃত না হইলে জীব আপনার পারমার্থ স্বরূপ (তুরীয় পদ) অবগত হইতে পারে না। তুরীয়ই জীবের যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু এই জাগ্রদাদি ভূমি ত্রয়ের মধ্য দিয়া গতাগতিবশতঃ জীব যেন আপন স্বরূপ একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের উপাধি লইয়া জীব দৈন্য, দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুরূপ অজস্র স্পন্দনে চঞ্চলবৎ প্রতীত হইতেছেন।

সুষুপ্তিকালে মরণমূর্চ্ছার ন্যায় জীব হৃদয়স্থিত "পুরীতৎ" নাড়ীতে গমন করে। জাগ্রতের অভিব্যক্তি স্থান যেমন চক্ষু, স্বপ্নের অভিব্যক্তি স্থান যেমন, কণ্ঠ, সুষুপ্তির স্থান তেমনি হৃদয় ও তৎস্থানস্থিত পুরীতৎ নাম্নী নাড়ী। এই সুষুপ্তিভূমি পরানন্দ তুরীয় ভূমির অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জীব মনবুদ্ধির বৃত্তিশূন্যতাবশতঃ আপেক্ষিক জগতের সুখদুঃখ কিছুই জানিতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্রে এই সুষুপ্তি অবস্থাকে "আনন্দময় শরীর" বলা হয়। জীব নিদ্রোত্থিত হইয়া বলে "বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম। কোন কিছুই জানিতে পারি নাই।" এই আনন্দ ও অজ্ঞানের সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমানতা প্রতি জীবই প্রত্যহ অনুভব করে। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও তৎপার্শ্বচর ছায়ারূপী অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই

থাকে না। এইজন্যই কি শাস্ত্রে বলা হয়—"অজ্ঞান হইতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হইতেছে ?"

অবস্থাত্রয় বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে. উপাধিমণ্ডিত জীব প্রত্যহ এই অবস্থাত্রয় মধ্যে বিচরণ করিতেছে কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। জাগ্রতকালে স্বপ্নদর্শন অমূলক বলিয়া বোধ হয়। আবার অতিজাগ্রৎভূমে অধিরোহণ করিলে এই গৌরবান্বিত জাগ্রৎ অবস্থাও স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জাগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, অতিজাগ্রৎ অবস্থার তুলনায় জাগ্রদবস্থাও তেমনি মিথ্যা। সেইজন্য সর্বোচ্চস্তর তুরীয় ভূমি হইতে দৃষ্টি করিলে জীব-জগৎ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপ বিভাগ মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"জগন্মিথ্যা"। অথবা গীতায় যেরূপ উক্তি হইয়াছে ঃ—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

যাহারা জ্ঞানের চরমভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, তাহাদের চক্ষে ও বিচারে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্য স্থূলজগতের রূপরসাদির ভোগলালসায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে, আর বলে —"আহা ! আমার ভোগের জন্য ঈশ্বর কি সুন্দর সৃষ্টিই প্রকটন করিয়াছেন !"

মনের এই জাগ্রদাদি অবস্থায় আরোহণ ও অবরোহণ জানিতে ও বুঝিতে হইলে মনের স্বরূপ কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। শাস্ত্র বলে, অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের মিলিত সত্ত্বাংশে "অন্তঃকরণের" সৃষ্টি হয়। ইহাও জড় ভূত সমষ্টি মাত্র। বৃত্তিভেদে এই অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তরূপে কথিত হয়। সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান, ধারণা ইহাদের ক্রমিক বৃত্তি। চন্দ্র. ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু ইহাদের অনুগ্রাহক (চালক) দেবতা বলিয়া উক্ত হন। স্থূলজগতের রূপ-রসাভিঘাত ইন্দ্রিয় গোলকে পতিত হয়, তথা হইতে স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে অবস্থিত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রগুলি সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। সেই

স্পন্দন আবার সূক্ষ্ম বিকল্পবৃত্তিক মনে আঘাত করে ; মন আবার তাহা স্থির সঙ্কল্প বুদ্ধিতে (determinative faculty) অর্পণ করে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলই জড় ; তাহারা কেবল স্পন্দন চালনের যন্ত্রবিশেষ মাত্র। বুদ্ধিকে স্পন্দন জীবাত্মার নিকট উপস্থিত করা মাত্র স্পন্দনের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপরীত গতি ক্রমে বুদ্ধি—মন, ইন্দ্রিয়কেন্দ্র, ইন্দ্রিয় গোলকাদি পথে বাহ্যবস্তুর স্বরূপে গমন করিয়া জীবাত্মার বস্তুবোধ জন্মায়। যাঁহারা তারের খবরের রহস্য জানেন তাঁহারা বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারিবেন। সংবাদ-প্রেরক যন্ত্রটি যেন ইন্দ্রিয় গোলক, তড়িৎ-বাহক তার যেন স্নায়ুসমূহ, তড়িৎশক্তি যেন ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি সেই সংবাদগ্রাহক আর যাহার উদ্দেশে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তিনিই জীবাত্মা স্থানীয়, তিনি সংবাদ পড়িয়া তাহার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতেছেন। অভিমানাত্মক জীবাত্মার বহির্জগতের জ্ঞান হইবামাত্র ভোগের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা একটা স্থির হয়। ভোগের ইচ্ছা হইলেই মনের ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়। ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণের পর কর্মেন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হইয়া ক্রিয়া-শক্তির সূচনা করে। সুতরাং প্রথমেই জ্ঞান, তৎপর ইচ্ছা ও অবশেষে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়। এখন দেখা যাক্ এই মন পূর্ব্বকথিত জাগ্রদাদি ভূমিত্রয়ে কিরূপে অবস্থান করে। তুরীয় ভূমিতে এই মন যাইতেই পারে না। কারণ—তন্নিম্ন প্রজ্ঞাভূমিতেই মন বৃত্তিশূন্য বা নিস্পন্দ ; তদূর্দ্ধভূমিতে যাইবার শক্তি নাই। এইজন্যই চতুর্থ ভূমির বর্ণনায় বলা হয়—"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" প্রাজ্ঞ ও সুষুপ্ত ভূমিতে মন বৃত্তিশূন্য হওয়ায় তাহার শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপতা প্রমাণিত হয় ; এইজন্য মনের বুদ্ধি স্বরূপত্ব বা জ্ঞান স্বরূপত্বই (যাহা হইতে অহম্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়) সুষুপ্ত বা প্রাজ্ঞভূমির উপাধি। স্বপ্নভূমিতে সেই মনই ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন আর জগৎভূমে সেই মনই ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন। সুতরাং জ্ঞান ও ইচ্ছা ও ক্রিয়া উপাধি লইয়া মন ক্রমে সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জগৎভূমিতে অবস্থান করে—ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তি বলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

মনবৃত্তি শূন্য বা স্থির হইলেই (একাগ্র হইলেই) তাহা আত্মার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়। ইহাই বুদ্ধি—যাহা অবিবেকিগণের দৃষ্টিতে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। "চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা"—বলিয়া পঞ্চদশীকারও উল্লেখ করিয়াছেন। সুষুপ্তি-ভূমিতে এই মন বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপে অবস্থান করিলেও অহমিকা বৃত্তির উচ্ছেদ হয় না। সমষ্টিপক্ষে সত্ত্বপ্রবল অহমিকাবৃত্তিই সৃষ্টির আদি কারণ। ব্যষ্টিপক্ষে এই অহমিকা বৃত্তিমান্ জীবাত্মা অজ্ঞানের সাক্ষী হইয়া দ্বৈতমুখেই অবস্থান করে; গাঢ় সুষুপ্তিতে জীবাত্মার ধ্বংস হয় না। কারণ, ব্যুত্থানকালে এই প্রসুপ্ত জীবকে বুদ্ধি, মন, জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় পথে ফিরিয়া পূর্ব্ব সংস্কার বশে সংসার ভোগ করিতে দেখা যায়। এইজন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অহং জ্ঞানে উপলক্ষিত জীবাত্মা তাহার আভিমানিক সত্ত্বা সুষুপ্তি বা মৃত্যুকালেও ত্যাগ করে না। সুষুপ্তি বা মৃত্যুর পর স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া জাগ্রদভূমিতে আগমন করে। এই যুক্তিতে জন্মান্তরবাদও সমর্থিত হয়।

ইদানিং অতিজাগ্রৎ বা তুরীয় ভূমি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, সুষুপ্ত প্রাজ্ঞজীব বা পরমাত্মা ঐ অবস্থায় কেবল অহং-প্রত্যয়-গম্য "আমিত্ব" জ্ঞানে ভাসমান থাকেন, তখন তাহার অপর কোন উপাধি থাকে না। জীবপক্ষে তখন অজ্ঞান মাত্র দ্বৈতদৃষ্টির কারণরূপে অবস্থান করে। সমষ্টিপক্ষেও সত্ত্বপ্রবল মায়ামাত্র উপাধিবশতঃ ঈশ্বর তখন তুরীয় ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। ঈশ্বরের মায়া উপাধি ও জীবের অজ্ঞান উপাধি বিলয় হইয়া গেলে উভয়ই চিরন্তন চৈতন্য সত্ত্বায় এক হইয়া যায়। জীবের এই অজ্ঞান দূর করিতে শাস্ত্র নানা সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞান-পথের উপদেশ এই যে তুমি সদা সর্ব্বদা তোমার নির্বিকার তুরীয় স্বরূপের চিন্তা কর। তোমার জীবত্ব, তুরীয় স্বরূপেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে এই তত্ত্বই অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। অহং-প্রত্যয় গম্য জীবাত্মা তুরীয় ব্রহ্মই বটেন। কিন্তু মায়ার আবরণ ও

বিক্ষেপ শক্তি জীবকে ব্রহ্ম হইতে যেন বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। সদা সর্ব্বদা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ধ্যান প্রবাহ উত্থাপিত করিতে পারিলে এই জীবাভাসরূপ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ভক্তিপথে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সাধন সহায়ে অনিত্য বহির্জ্জগত উপেক্ষা করিয়া জীব যখন ইষ্টে তন্ময় হইয়া আসে জীবের উপাধিগুলিও তেমনি ক্ষয় হইয়া পড়ে। তখন "জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতঃ" হইয়া জীব একত্বের চরমভূমিতে আরোহণ করে। যোগীও ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ চক্রে আরোহণজনিত উপাধি-বিগত হইয়া সহস্রাররূপী তুরীয় ভূমিতে চিরস্থিতি লাভ করে। নিষ্কামকর্ম্মীও পরার্থে কর্মপর হইয়া উপাধিভূত জীবত্ব ক্রমশঃ বর্জ্জন করে। সমস্ত উপাধিবিগমে যে তাহার অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান ঘটিবে তাহা বিচিত্র কি? এইজন্য যে কোন পথে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেই জীবের শাশ্বত শান্তিভূমি তুরীয় পদে বিশ্রান্তি লাভ ঘটে। কোন পথই এই জন্য হেয় হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে এই অতিজাগ্রদবস্থা হইতে কেহ অবরোহণ করিয়া তাহার খবর দিতে পারে কিনা? শাস্ত্রাদি কি সে অবস্থার আভাস, না সম্পূর্ণ সত্য উক্তি? উপাধি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া জীব আবার "আমি আমার রাজ্যে" আগমন করিবে? শঙ্কর প্রমুখ আত্মজ্ঞপুরুষগণ কেনই-বা শাস্ত্রাদিকে "অবিদ্যাবিষয়বৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন? এই সকল সন্দেহ নিরাকরণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের অসাধারণ অনুভূতিই এই সংশয় অপনোদনে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। চরমানুভূতি দ্যোতক শ্রুতিপ্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হইবার অযোগ্য। সাধারণজীব চরমজ্ঞানভূমি হইতে ফিরিবার শক্তি রাখে না। 'নুনের পুতুলের' মতন সমুদ্রজলে লীন হইয়া যায়। কিন্তু পরমার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ ও দেবমানব মহাপুরুষগণ এই অতীত জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায়

জীবহিতকল্পে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের বাক্যই বেদ, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "অবিদ্যাবিষবৎ" হইলেও জ্ঞানাতীত ভূমির আভাস তাহাতেই লিপিবদ্ধ আছে। আর যাঁহারা সেই জ্ঞানাতীত ভূমির অনুভূতিসম্পন্ন হইয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া জীবনধারণ করেন তাঁহারা যে বেদ বেদান্ত কথিত তত্ত্বজ্ঞান হইতেও সমধিক গৌরবান্বিত ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্বলন্তজাগ্রৎ বিগ্রহ, একথা সহজেই বোধগম্য হয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ যিশু, মহম্মদ, চৈতন্যাদি অমানব মহাপুরুষগণ এইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত ও পূজিত হন। পুনরাবর্ত্তন সংসারের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। ইদানীন্তন জগতেও এইরূপ এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল - যিনি সর্বদা জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থান করিয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি বলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের নির্মলাকাশে নবোদিত ভাস্করতুল্য তাঁহার উজ্জ্বলকিরণে দিক্‌দেশ আলোকিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে তো পাঠক তাঁহার অমল ধবল মূর্ত্তি অনুধ্যান করিয়া জন্মজরামৃত্যু সংকুল অবস্থাত্রয় অতিক্রমকরতঃ নিত্যানন্দ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণের চেষ্টা কর। তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সেই জ্ঞানাতীত ভূমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে প্রদর্শন করাইয়া সংসারের ঘোর অন্ধকারে তুঙ্গ আলোকস্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়্যছেন।

পূর্ব্বস্মৃতি (ডায়রী)

উদ্বোধন —২৯শ বর্ষ

আজ ত্রিশ বছরের কথা। ঐ সবেমাত্র বরাহনগরে ভাঙ্গা বাড়ী থেকে মঠ আলমবাজার "ভুতের বাড়ীতে" উঠে এসেছে। স্বর্গীয় নাগ মহাশয় লেখককে শশী মহারাজ ও যোগীন মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দেশে চলে গেছেন। তখনকার মঠের একটু হালচাল বললে, অত্যুক্তি হবে না। অন্ততঃ আমি প্রথমটা যেমন দেখেছিলুম তাই কিঞ্চিৎ এখানে লিপিবদ্ধ করছি। মঠে তখন চাকর বা বামুন কেউ

ছিল না। শশী মহারাজ ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন, কানাই মহারাজ হাটবাজার ও বাসন মাজা, যোগীন মহারাজ, হরি মহারাজ, সুশীল মহারাজ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও আরো দু-একজন সাধু ব্রহ্মচারী ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা-কুটা, মশলাবাটা প্রভৃতি কাজ করতেন। লেখক যখন মঠে যেতো ও থাকতো, তখন শশী মহারাজের আদেশে সে হেঁসেলে গিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতো। শশী মহারাজ প্রাত্যহিক রান্নার কাজ থেকে একটু অব্যাহতি পেতেন।

লেখক মধ্যে মধ্যে কানাই মহারাজের সঙ্গে হাটবাজার করতো এবং কখনো বা তাঁর সঙ্গে সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে নিজেকে ধন্য মনে করতো। তখনো লেখক স্বামীজীকে দেখেনি বা তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন তাও জানতো না। তখন স্বামীজী ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তার কিছুদিন পরে আমেরিকা যান—একথা লেখক পরে মঠধারী সাধুদের প্রমুখাৎ শুনেছিল।

একদিন মঠে কানাই মহারাজ শিবমহিম্নস্তব পাঠ করলেন। লেখক একমনে শুনে বুঝতে পারলো, পাঠকের সংস্কৃত-জ্ঞান তত নেই। কিন্তু তাঁর পঠনের একাগ্রতা দর্শনে লেখক বিস্মিত হয়ে গেল। শশী মহারাজ বলেছিলেন, ভাষা জ্ঞান না থাকলেও ভক্তের একাগ্র হৃদয়ই ভগবান গ্রহণ করেন। এই বলে, "অমিত গিরিসমং স্যাৎ" শ্লোকটি পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপে সমাধিমগ্ন হ'য়েছিলেন সেই গল্পটি বললেন। শশী মহারাজই তখন মঠকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সেবা দর্শনে লেখক কখনো বিস্মিত হোত, কখনো-বা মনে করতো, তাঁর মাথায় একটু ছিট আছে। কারণ, এক ছিলিম তামাক সেজে ভোগান্তে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ঠাকুরের ছবির কাছে ধরে থাকা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে লেখকের মনে হোত। ক্রমে আসা-যাওয়া করতে করতে লেখকের সেই ভাব পরিবর্তিত হয় এবং সে বুঝতে পারে, সেবা ও নিষ্ঠা এরূপ ঐকান্তিকতাতেই পূর্ণতা লাভ করে। তখনকার ঠাকুরঘরে আরত্রিক দর্শনও উপভোগের জিনিস ছিল।

কয়েকজন বাল সন্ন্যাসী, যাঁদের সম্বল বলতে কিছুই ছিল না, যাঁরা অন্নবস্ত্রাভাবে অর্ধাশন ও প্রায় কৌপীন মাত্র সম্বল করেছিলেন, তাঁরা যখন—"জয় জয় জয় গুরুদেব" রবে মঠ ও পল্লী মুখরিত করতেন তখন লেখকের মনে হতো, এঁরা দেবতা,—মানবাকারে। এঁদের সঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনে সত্য সত্যই মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সত্য সত্যই ঈশ্বরানুরাগে হৃদয় উদ্বেলিত হয়। এমন সুখের দিন মঠে কত যে অতিবাহিত করা গেছে, তার স্মরণেও হৃদয় পবিত্র হয়। মনে হয়, পূর্বে এই সব সাধুদের সঙ্গ ও কৃপালাভ করাতেই, পরে সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বামীজীকে মন্ত্রগুরুরূপে পাওয়া গিয়েছিল। ঠাকুরের গৃহীভক্ত স্বর্গীয় সুরেশ দত্ত ও হরমোহন মিত্রের সঙ্গে লেখক অনেক সময় আলমবাজার মঠে যেতো। আবার যখন নাগমহাশয় কলকাতায় থাকতেন তখন লেখক তাঁর সঙ্গেই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর ও আলমবাজার মঠে যেতো। নাগ-মহাশয়ের সঙ্গে মঠে যাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। ভাবাবেশে তিনি এখানে সেখানে পড়ে যেতেন, মঠের সাধুরা তাঁকে অতি সন্তর্পণে ধরে বসাতেন। নাগমহাশয়কে দেখে কি আনন্দের উৎসই যে শশী মহারাজের হৃদয়ে বয়ে যেতে দেখেছি, তা বলতে পারি না। উভয়ে মুখোমুখি বসে "জয়গুরু জয়গুরু" বলতে বলতে সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধ কণ্ঠে অবস্থান করতেন। ভাব ও ভাষা উভয়ের রুদ্ধ হ'য়ে যেতো। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় উভয়ে যেন উন্মাদ হয়ে উঠতেন। আমি তখন সব ভাল বুঝতে পারতুম না। ক্রমে কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলুম।

মঠে তখন বিবেকচূড়ামণি পাঠ হতো। কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দ) পাঠ করতে শুনেছি। তাঁর বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। বিকালে শাস্ত্র পাঠ, আলোচনা হোত। দুপুরে আহারের পর সকলে একটু বিশ্রাম করতেন। সকাল সন্ধ্যায় খুব জপ-ধ্যানাদি চলতো। উপস্থিত সকলকেই তাতে যোগ দিতে হতো। গৃহীভক্তদের মধ্যে গিরীশবাবু, অতুলবাবু, নবগোপাল বাবু, ছুট্‌কো গোপাল, নিতাই ডাক্তার, হরমোহন ও সুরেশ বাবুকে মঠে মধ্যে মধ্যে দেখতে পেতুম।

এঁরা মঠে কেউ রিক্ত হস্তে যেতেন না। মঠে তখন সামান্য ডাল-ভাত, রুটির ব্যবস্থা ছিল। জুটলে মৎস্যও ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হতো, নতুবা যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা। তখন এটি লক্ষ্য করতুম যে, ঠাকুরের ভোগরাগ যাই হোক না কেন, সাধুদের ভক্তিরসে মিশ্রিত হয়ে তা অমৃত রসে পরিণত হোত। একদিন আমি না জেনে একটা পচা রুই মাছ শেয়ালদা থেকে কিনে মঠে নিয়ে যাই। শশী মহারাজ ও আমি একত্রে তার ঝুরিভাজা করে ঠাকুরকে ভোগ চড়াই। সাধুরা তা খেয়ে মহাতৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তি ও ভালবাসার এমন মহিমা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

মঠের সাধুরা তখন সকলেই গঙ্গাতে স্নান করতেন, কারণ তখন স্নানের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষতঃ যুবক সন্ন্যাসীগণ তখন ভক্তিবশতঃই হোক্ বা শারীরিক সুস্থতা সাধনেই হোক্, গঙ্গাস্নান সকলেই ভালবাসতেন। স্নানের ঘাটে বসে কত শাস্ত্রচর্চ্চা ও ঠাকুরের কত প্রসঙ্গই যে হোত তা বলবার নয়। কখনও স্নান করতে গিয়ে দু'ঘণ্টাই হয়তো কেটে যেত। সকলেই যেন তন্ময়, আহার নিদ্রা ভুল হয়ে যেতো। আলমবাজারের বাড়ীতে হরি মহারাজ একদিন একটি ভূত দেখতে পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফেরবার কালে তিনি দেখেছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার পাশের নীচের ঘরে সে ঢুকে পড়লো। তাঁর নিজ মুখে লেখকের ইহা শোনা। আর একদিন নাগমহাশয়ও মঠে ভূত দেখেন, দেখবার পরে আমাকে ঐ বিষয় বলেন। কিন্তু মঠের সাধুদের ঐ বিষয়ে দৃক্‌পাত ছিল না। তাঁরা বলতেন, "আমরা শিবের দাস,—ভূত, প্রেত আমাদের আর কি করতে পারে?"



পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দর পত্রাবলী—দ্বিতীয় ভাগ।

পত্র নং—৭৮ (প্রথম পত্র)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

দার্জিলিং

১৯শে মার্চ, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

শুভমস্তু। আশীর্ব্বাদ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচলগুরোর্হিম-নিমণ্ডিত শিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বম্। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রী ১০৮ রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতুং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বং আবিষ্কৃতমহাশৌর্য্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্ত্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যগ্ যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেবকরতলগতা মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নম্। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদম্। অগ্রগাঃ ভবত, অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থিনাং সর্ব্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি।

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ।

প্রথম পত্র (বঙ্গানুবাদ)

শুভ হউক। আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, যতদিন না সমুদয় কর্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগদার্ঢ্য দ্বারা জানা যাইতেছে তোমার পরম কল্যাণ সাধিকা সেই জীবন্মুক্তি-অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রী ১০৮ রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌর্য্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগেরও উদ্ধারের জন্য সম্যক্ যত্ন করিতে পার। চির তেজস্বী হও। বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে; ইহা নিশ্চিত হইলেও, তজ্জন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ দেখ, জীবগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে! আহা! তাহাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—ঐ শুন, বেদান্ত দুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে—"ভয় নাই", "ভয় নাই"। সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিল জগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থি ভেদে সমর্থ হউক।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী—

বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী—দ্বিতীয় ভাগ

পত্র নং ৯৭ (দ্বিতীয় পত্র)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

আলমোড়া

৩রা জুলাই, ১৮৯৭

যস্য বীর্য্যেণ কৃতিনোবয়ং চ ভুবনানি চ
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্ ॥

"প্রভবতি ভগবান্ বিধি"—রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয় প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র অাক্রমিতুম্ জ্ঞান গিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদপি শতশঃ "তৎ ত্বমসি" তত্ত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দ্দিশামি পদং প্রাচীনং—"কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্" ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণঃশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্ব্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং,—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" "ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীট ভক্ষিত মস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নাহতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ম্। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে পরন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বান্তর্য্যামি সর্ব্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেন সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং মতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎতয়োঃ সেবা প্রেমরূপকর্ম্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ—

জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষ-প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্ যুক্তমেব যদ্‌বাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদ-বিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্দনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্ব্বাস্মিন্।

সৈব সর্ব্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চাবশ্যম্ভাব্য-ত্রিতাপহরণকরী সর্ব্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্ম্মণে শর্ম্মণ্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি ধ্রুতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ।

দ্বিতীয় পত্র (বঙ্গানুবাদ)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল শাস্ত্রকার উদ্যোগশীল নহেন, তাঁহারা বলেন ভগবৎ-বিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়; আর যাঁহারা উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞান জনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন করো।

"বিপদই তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ", নীতিশাস্ত্রে এই যে বাক্য কথিত হইয়াছে, 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা যাইতে পারে। ইহাই, (অর্থাৎ, বিপদে অবিচলিত ভাবই) বৈরাগ্য-রূপ রোগের নিদান, অর্থাৎ লক্ষণ-স্বরূপ।

ধন্য তিনি, যাঁহার জীবনে ইহার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, "কিছু সময় অপেক্ষা কর!" দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে উহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "যোগে সিদ্ধ হইলে, কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।" আর এই যে কথিত হইয়াছে, "ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়।" এখানে 'ত্যাগ' শব্দ দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে, হয় বস্তুশূন্য বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন, কেহই তল্লাভে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে এই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে, অন্য বস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংগৃহীত বা সংলগ্ন করা। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না; তিনি সকলের সমষ্টি-স্বরূপ। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবে সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান চৈতন্য

যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন; অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত—যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সুচনা করে—তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত 'দয়া' শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়া বলামাত্র। আমরা দয়া করিনা, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি এ অনুভব আমাদের নাই; তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্ম্মন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহাদ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহাদ্বারা—এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই—সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহাদ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহাদ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহাদ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।
